রোগটা যখন টি.বি.

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা লিখেছেন :

পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বি.এ., এম.ডি., ডি.এস্-সি.,

এম.আর.সি.পি., এফ.আর.সি.এস., এফ.এন.আই।

দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫৭

প্রকাশ করেছেন :
সুকান্তকুমার হালদার
নরনারী পাবলিসিং কনসার্ন
২৬-১, শশীভূষণ দে স্ট্রীট্
কলিকাতা—১২

ছেপেছেন :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১৬০, মসজিদ বাড়ী
কলিকাতা—৬

ভেতরের ছবি ছেপেছেন :
সমবায় প্রেস
৩৩/২, শশীভূষণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মলাট ছেপেছেন :
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস
৩৮-এ, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট্
কলিকাতা—৬

ফটোগ্রাফ :
যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল থেকে—২ খানা
টিউবারকিউলোসিস্ রিলিফ এসোসিয়েশান থেকে —১ খানা
গণেশ সিংহ – ১ খানা

মলাটের ছবি এঁকেছেন :
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দাম : সাড়ে তিন টাকা

রোগটা যখন টি. বি.

"...কেবল রোগী ও জনসাধারণ নয়, আমাদের দেশের সর্বশ্রেণীর স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধায়ক এবং চিকিৎসক সমাজও এই পুস্তকখানি পাঠে প্রচুর শিক্ষা এবং উপকার লাভ করিবেন..." (যুগান্তর)

"...ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভূমিকায় গ্রন্থখানির যে প্রশংসা করিয়াছেন, অমিয়জীবন সে প্রশংসালাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বহু তথ্য এবং বহু চিত্তাকর্ষক আলোচনায় সমৃদ্ধ এই পুস্তকখানি প্রত্যেক শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান যক্ষ্মা-রোগীরই পড়া উচিত..." (আনন্দবাজার পত্রিকা)

[illegible] জীবন মুখোপাধ্যায় এই বইখানিতে টি. বি. রোগ সম্বন্ধে অতি [illegible] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ক'রে বাংলাদেশের মহৎ উপকার [illegible]" (মন্দিরা)

[illegible] রোগের সমুদয় আবশ্যক বিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য তাহা লিপিবদ্ধ [illegible] কটির বিশেষ মূল্য আছে..." (প্রবাসী)

এখানেও ফোটে ফুল। এখানেও ফুলেদের গায়ে
অনেক রঙের মেলা। এখানেও ফুলেদের বুকে
সৌরভ লুকায়ে আছে. আর আছে নিষ্কলঙ্ক হাসি—
আর আছে ভীরু প্রাণে স্বপ্ন-ধোয়া অজস্র প্রত্যাশা,
অব্যক্ত রহস্যঘন সুদূরের পথের সংকেতে
অনেক প্রতীক্ষা আর অন্বেষণ।

এখানেও আলো আছে, সে আলোক আরও প্রাণ-ভরা :
এখানের বাতাসেতে দক্ষিণের দাক্ষিণ্য অনেক,
প্রসন্ন আকাশ ভরা অফুরন্ত কল্যাণ কামনা—
বসন্ত-দিনের গীতে নবতর-অর্থভরা বাণী.
অনেক পাখির সুরে পৃথিবীর নূতন সূচনা।

হৃদয় এখানে প্রিয় :
এখানে ক'রেছে ভীড় পশ্চাতের পলাতক স্মৃতি,
এখানে আবার খোঁজা জনতায় হারানো নিজেরে—
ছায়ামুক্ত-অবসরে নিজেরে আবার ফিরে দেখা।
এখানে ঐশ্বর্য আসে গোধূলির ক্লান্ত রঙে রেঙে :
এখানে জীবনে আসে ঘুম-ভাঙা, ভুল-ভাঙা রাত :
অনেক মায়ায় আসে সে রাত্রির প্রশান্ত স্তব্ধতা।

বিস্মৃতির ব্যথা আছে, হারানোর কতো ইতিহাস—
এখানেও কতো ফুল ঝরে :
কতো আছে বিদ্রোহীর অবসন্ন আত্ম-সমর্পণ—
কতো না নির্মম শর অতর্কিতে বক্ষে এসে লাগে।
এখানের সূর্যমুখী ফুলেরা তবুও হাসি-ভরা—
তাদের নিভৃত ঘরে সুন্দরের নিত্য-মহোৎসব।
এখানে অনেক প্রাণ দিনে দিনে রিক্ত হ'য়ে কাঁদে :
এখানে অনেক প্রাণ পূর্ণতার লভে অধিকার!

যক্ষ্মাব্যাধির সহিত আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্যাগুলি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এই ব্যাধির নিবারণকল্পে কার্যাবলী এবং এই ব্যাধি সম্বন্ধে নানাদিক হইতে আলোচনার প্রসারের প্রয়োজন আজ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের সংস্কার-মুক্ত মনে এই ব্যাধিসংক্রান্ত আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভাবধারা অতিশয় স্বচ্ছরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। একদিকে বৈজ্ঞানিকের মনোবৃত্তি এবং অপরদিকে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও লিপিকৌশল লইয়া অমিয়জীবন এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা একটি সুস্পষ্ট আন্তরিকতার ছাপে সর্বত্র সমুজ্জ্বল, এবং এই কারণেই ইংরাজী ও বাংলায় তাঁহার রচিত যক্ষ্মাবিষয়ক বহু প্রবন্ধ জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। অমিয়জীবনের এই সুন্দর পুস্তকখানি যে এই দেশের যক্ষ্মারোগী ও জনসাধারণের বহু প্রকার জড়তা ও অজ্ঞতা অপনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিশেষভাবে উপকৃত ও সচেষ্ট হইতে সাহায্য করিবে ইহা সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায়। ভাবে, ভাষায় এবং রচনাপদ্ধতিতে গতানুগতিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এই পুস্তকখানি সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট সুখপাঠ্য এবং আদরণীয় হইবে বলিয়াই আমি মনে করি।

বিধানচন্দ্র রায়

এই বইটির বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করবার ব্যাপারে যাঁদের সহানুভূতি, সাহায্য এবং আগ্রহ আমার কাজকে এগিয়ে দিয়েছে, তাঁদের কয়েকজন :

শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায়—("মীনা"—পানিহাটি)

ডাঃ সুবলচরণ লাহা—এম. বি., এফ. সি. সি. পি. (ইউ. এস. এ.), টি. ডি. ডি. (ওয়েল্‌স্‌), (ল' চেস্ট্‌ ক্লিনিক)

অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী—এম.এ., বি.এল., পি.আর.এস্‌., ডি. লিট, শাস্ত্রী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

কুমারী মিলি বসু—("বসুশ্রী")

শ্রীযুক্ত হেরম্ব ভট্টাচার্য— (এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং)

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র দাস—(ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং)

ডাঃ পি. কে. সেন—এম. ডি. (বার্লিন), পি এইচ্‌. ডি., টি. ডি. ডি. (ওয়েল্‌স্‌), (কলিকাতা মেডিকাল কলেজ)

শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী

মেজর ডি. সি. লাহিড়ী - এম. বি., আই. এম. এস. (আর), (নিউমোন হেল্‌থ্‌ সোসাইটি)

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশান ফর্‌ দি প্রিভেন্সান অব্‌ টি. বি. (ইংল্যাণ্ড), যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল, বেংগল টি. বি. অ্যাসোসিয়েশান, টিউবারকিউলোসিস রিলিফ অ্যাসোসিয়েশান—প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট যক্ষ্মাবিদ্‌ ও সমাজসেবীদের কাছ থেকে এবং অন্যান্য আরও অনেক বন্ধুদের কাছ থেকে যে শুভাকাঙ্ক্ষা, সহৃদয়তা ও সহযোগিতা নানা সূত্রে পেয়েছি, এবং টি বি. সম্বন্ধে যে সব স্বনামধন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান রচনা থেকে নানা জ্ঞানলাভের সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁদের নামের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ এখানে সম্ভবপর নয়, কিন্তু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে তাঁদের সবাইকে স্মরণ করছি এই বইখানি দেশবাসীর হাতে, বিশেষ ক'রে যক্ষ্মা-রোগক্লিষ্ট ভাই-বোনের হাতে তুলে দেবার সার্থক মুহূর্তে।

বুলবুলকে দিলাম

জীবনের যাত্রা-পথে মানুষকে যে অসংখ্য প্রকার সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়, ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম তার মধ্যে অন্যতম। সহস্র সহস্র ব্যাধির তাড়নায় মানুষের স্বাস্থ্য উঠছে জর্জরিত হয়ে; তার ভিতরকার যে বিশিষ্ট ব্যাধিটি আমার আলোচনার বিষয়, ইংরাজীতে সেটির নাম হচ্ছে—টিউবারকিউলোসিস। টিউবারকিউলোসিস্ কথাটাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে (যদিও একটু ভুল ভাবে) বলা হয়—টি. বি। বুকের টি. বি.কে "কন্‌সাম্প্‌শান্", "থাইসিস্"—ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং এ নামগুলিও সাধারণের অজ্ঞাত নয়। টি. বি. গ্রস্তকে "টিউবার-কিউলাস্" বা "কন্‌সাম্প্‌টিভ্" বলা হয়। এই ব্যাধিটিকেই "যক্ষ্মা" বা "ক্ষয়" ব্যাধি ব'লে এদেশের লোকে জানে।

এই ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কারুরই উপায় নাই—তা তিনি ধনী হোন, শিক্ষিত হোন, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ হোন, রোগা বা বলবান হোন, পুরুষ বা স্ত্রী হোন, বা যে কোনও জাতি, দেশ, সম্প্রদায় বা ধর্মের হোন। সমাজের কোনও স্তরই যক্ষ্মার আক্রমণের হাত এড়াতে পারেনি। কিন্তু এই ব্যাধিটি সব চেয়ে সাংঘাতিকভাবে বিস্তার লাভ করেছে যুবাবয়স্কদের ভিতরে।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাধিটি নিতান্ত আধুনিক নয়। আমরা সন্ধান নিলে দেখতে পাব প্রাচীন কালেও এই ব্যাধির অস্তিত্ব ছিল। খৃষ্ট জন্মাবার চার পাঁচশো বছর আগে ছিল ইয়োরোপে গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রাটিশ-এর কাল। ওদেশে হিপোক্রাটিশকে বলা হয়ে থাকে ঔষধের জন্মদাতা। হিপোক্রাটিশের আগে ব্যাধিকে ভাবা হত দেবতার অসন্তোষ বা দৈত্য-দানার "নজর" ব'লে। কিন্তু মানুষের মন থেকে হিপোক্রাটিশ এই ধারণা উৎপাটন করতে প্রয়াস পান। ওদেশে সর্বপ্রথম হিপোক্রাটিশই অনেকটা যথাযথভাবে যক্ষ্মা ব্যাধির বিবরণ দিতে সক্ষম হন এবং আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদেরাও বহুকাল পূর্বেকার ওই চিকিৎসকের এই ব্যাধি সম্বন্ধে

অনেক বর্ণনা সমর্থনই ক'রে থাকেন। তবে হিপোক্রাটিশ এই ব্যাধির কারণ সম্বন্ধে অথবা এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হলে ফুসফুসের কি কি অবস্থান্তর ঘটে, সে সব বিশেষ কিছু জানতেন না। এবং এর চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও খুব সুস্পষ্ট ও যথাযথ ছিল না। তবে তাঁর সম-সাময়িক এবং পরবর্তী অনেকে এই ব্যাধি সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে আলোকপাত ক'রে এসেছেন। ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক চরক এবং সুশ্রুতের আবির্ভাব হয়েছিল হিপোক্রাটিশেরও একশো দেড়শো বছর আগে। তাঁরা এই ব্যাধি নিয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে তাঁরা এই ব্যাধিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ ক'রে এই ব্যাধির কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বিষয়ের অবতারণা ক'রে গেছেন। কতকগুলি মিশরদেশীয় "মামী"কে পরীক্ষা ক'রে তাদের ভিতর এই ব্যাধির চিহ্ন দেখা গিয়েছে। এগুলি হাজার তিনেক বছরের পুরানো। "নিওলিথিক" বা "নিউ-স্টোন এজ" যেটাকে বলা হয়ে থাকে—যখন মানুষের ভিতরে প্রচলিত ছিল পালিশ-করা পাথুরে অস্ত্রাদির ব্যবহার—সেই সময়েও মানুষ এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে—এটা তখনকার একটা কঙ্কাল থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এই কঙ্কাল দশ হাজার বছর আগেকার এবং ব্যাধির চিহ্ন মেরুদণ্ডের অস্থিতে পাওয়া গিয়েছিল। সুপ্রাচীন ঋগ্‌বেদ এবং অথর্ব বেদের বহু-স্থানে দেখতে পাওয়া যায় যক্ষ্মার উল্লেখ। এবং এই সব গ্রন্থের কোনও কোনও শ্লোকে এই ব্যাধির উল্লেখ এমন ভাবে রয়েছে যে, এই ব্যাধি যে মানব দেহের প্রত্যেকটি স্থান আক্রমণ করতে পারে সেটা তখন অজানা ছিল না। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এমন কি চর্মের কথা পর্যন্ত উল্লেখ ক'রে দেহ থেকে যক্ষ্মাকে বিতাড়িত করবার জন্তে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়েছে। এই ব্যাধির উল্লেখ রয়েছে রামায়ণ এবং মহাভারতেও।

অন্যান্য বহু ব্যাধির তুলনায় এই ব্যাধির গুরুত্ব যে অধিক তার কারণ অনেক। প্রথমতঃ এই ব্যাধি সারতে এত দীর্ঘ সময় নেয় যে একজন রোগীর মন তিক্ত, বিষাক্ত হয়ে ওঠে—নানাভাবে। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাধির চিকিৎসা বহু ব্যয়সাধ্য ; এবং এত দীর্ঘ সময় নেওয়াতে অনেকের পক্ষেই শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা চালানো প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভবই হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়তঃ চিকিৎসার গুণে ব্যাধির শান্তি হলেও এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও সম্পূর্ণ একজন সুস্থ দেহীর মতন জীবন যাপন এই ব্যাধি-গ্রস্তের পক্ষে অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ যাঁদের এই ব্যাধি হয়েছে, তাঁরা যদি হন অতিরিক্ত অজ্ঞ, অসতর্ক, বা অপরের শুভাশুভ সম্বন্ধে উদাসীন, তবে তাঁরা হয়ে দাঁড়ান আরও অসংখ্য লোকের অসুস্থতার কারণ—এই জন্যে যে, যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি। পঞ্চমতঃ রোগী একবার সুস্থ হ'য়ে গেলেও সুযোগ পেলে এই ব্যাধি অনেকদিন পরেও পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

কিন্তু এই ক'টি কথা পড়েই কারুর হতাশ হবার প্রয়োজন নাই। সুদৃঢ়, সমবেত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা থাকলে এমন ব্যাধির কাছেও মানুষের হার মানবার কথা নয়।

এবারে যক্ষ্মা রোগের কারণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য দু' একটা বিষয় বলব।

আজকে লুই পাস্তুরের নাম কারুর অজানা থাকবার কথা নয়। একশো বছরের মত হ'ল, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, চর্মচক্ষুর অগোচর "কীটাণু" বা "জীবাণু"র দলই যে মানুষের বহু ব্যাধির কারণ, এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এনে দিলেন এক নতুন যুগ, এবং জীবাণুতত্ত্বের—ব্যাকটিরিয়লজীর ভিত্তি স্থাপন করলেন। তাঁর আবিষ্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে জার্মান বৈজ্ঞানিক রবার্ট কখ্ তাঁর গবেষণাগারে ব'সে কিছুদিনের

এবং সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন এগুলোও সহজভাবে ওঠানামা করতে পারে। পাঁজরা, স্টার্নাম, মেরুদণ্ড ইত্যাদি দ্বারা তৈরী বুকের খাঁচাটির ভিতরে বক্ষগহ্বর একেবারে আবৃত ক'রে থাকে হার্ট, ফুস্‌ফুস্‌, রক্ত-নালিকা, অন্ন-নালিকা—ইত্যাদি। কিন্তু ফুস্‌ফুস্‌ই হচ্ছে এদের ভিতরে সর্ববৃহদাকৃতি এবং অন্যান্য যন্ত্রগুলোকে প্রায় ঢেকে থাকে। তার ফলে, যদি পাঁজরাগুলোকে কাটা যায় তাহলে প্রথমেই নজরে পড়বে ফুস্‌ফুস্‌ এবং তাদের আড়ালে আংশিকভাবে নজরে পড়বে হৃৎপিণ্ড বা হার্টকে। তাহলে বোঝা গেল যে ফুস্‌ফুস্‌ থাকে ঠিক পাঁজরার নীচেই—অর্থাৎ প্রথমে পাঁজরা তারপরেই ফুস্‌ফুস্‌। কিন্তু "প্লুরা" ব'লে একটা পাতলা, পরিষ্কার পর্দা তার এক অংশ দিয়ে আবরণের মত লেগে থাকে পাঁজরাগুলোর নীচেকার গা দিয়ে এবং অন্য অংশ দিয়ে একেবারে লেগে থাকে ফুস্‌ফুসের গায়ে। এই পর্দাটা অনেকটা চকচকে' পালিশ করা পাতলা কাগজের মত, কিন্তু শুক্‌নো নয়। শরীরের এক রকম তরল স্রাব দ্বারা সব সময়ই প্লুরা থাকে সিক্ত, তার ফলে পাঁজরা এবং ফুস্‌ফুস্‌ যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আন্দোলিত হতে থাকে তখন বহিঃপ্লুরার এবং অন্তঃপ্লুরার সংস্পর্শ হয় মসৃণভাবে এবং অনুভূতির অগোচরে। সুস্থ অবস্থায় প্লুরার এই দুটি অংশের মাঝখানে জায়গা সামান্যই থেকে থাকে, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় যে তরল নিস্রাব প্লুরাকে সিক্ত রাখে তা অতিরিক্ত পরিমাণে হতে থাকে এবং জমতে থাকে দুই প্লুরার ভিতরে। এমন কি কখনও কখনও এই রস পুঁজে পর্যন্ত পরিণত হয়। এই অবস্থাগুলোর নাম হচ্ছে "প্লুরিসি" এবং "এম্‌পাইমা"। এই অবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌ স্বভাবতই খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে পাঁজরার দিক থেকে সরে আসে।

ফুস্‌ফুস্‌ সংখ্যায় হচ্ছে দুটি—বুকের এক একদিকে এক একটি ক'রে। প্রত্যেক ফুস্‌ফুস্‌ বুকের উপরের অংশ থেকে একেবারে ডায়াফ্রাম পর্যন্ত—

তলার দিকে বিস্তৃত থাকে। ডায়াফ্রাম অবস্থান করে একটি দেয়ালের মতো—থোরাক্স এবং এবডোমেন (পেট)-এর মাঝে। ডান দিকের ফুস্‌ফুস্‌টি তিন ভাগে বিভক্ত—উপরের ভাগ, মধ্যের ভাগ এবং নীচের ভাগ; আর বাঁ দিকের ফুস্‌ফুস্ দুই ভাগে বিভক্ত—উপরের ভাগ এবং নীচের ভাগ। এই ভাগগুলোর এক একটিকে বলা হয় ফুস্‌ফুসের এক একটি লোব্। একেবারে উপরের লোব্-এর চূড়াটাকে বলা হয়ে থাকে "অ্যাপেক্স" এবং এই অ্যাপেক্স অধিকার ক'রে থাকে কণ্ঠাস্থির অর্থাৎ কলার বোন-এর (যার নাম হল ক্ল্যাভিক্‌ল্) ইঞ্চিখানেক উপর পর্যন্ত—বুকের উপর অংশে একেবারে ঘাড়ের গোড়া অবধি। মাঝের এবং নীচের লোব্‌গুলি বুক এবং পিঠের বাকি অংশ থাকে জুড়ে। ফুস্‌ফুস্ নরম জিনিস, এবং ভিতরে বায়ু বহন করবার দরুন স্পঞ্জের মতন দেখতে। শ্বাস-প্রশ্বাস চলবার সময়ে বাতাস ঢুকবার এবং বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস্ প্রসারিত এবং আকুঞ্চিত হতে থাকে।

ফুস্‌ফুস্, হার্ট, শোণিত-নালী ইত্যাদি ছাড়া অন্ননালী এবং শ্বাস-নালীর খানিকটা অংশ বক্ষ-গহ্বরের অভ্যন্তরে থাকে। শ্বাস-নালী অথবা ট্র্যাকিয়া বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এখন একে বলা হয় ব্রংকাস্। ব্রংকাস্ আবার ফুস্‌ফুসের ভিতর গিয়ে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সেগুলি আবার ক্রমে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে করতে আরও অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হতে থাকে। অবশেষে এমন হয় যে একটা গাছের পাতার ভিতরে শিরাগুলো যেমন দেখা যায়—ওগুলিও ওরকম হ'য়ে যায়—স্থূল থেকে ক্রমাগত সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত হতে হতে।

বহু সুস্থ ব্যক্তিই জেনে একটু আশ্চর্য বোধ করবেন যে তাঁদের অনেকের দেহেই তাঁদের জীবনের কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনও

ভাবে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবেশ লাভ ক'রেছে। যতদিন পর্যন্ত এই জীবাণুগুলি একটি স্থানে বন্দী অবস্থায় থাকে এবং ক্রমবর্ধমান অসুখের সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থাটাকে ইনফেকশান (সংক্রমণ)-এর অবস্থা বলা হয়। "টিউবারকিউলিন্ টেস্ট্" দ্বারা ইন্‌ফেকশান ধরা যায়।

যক্ষ্মা জীবাণু শরীরে ঢুকেছে বা না ঢুকেছে এটা "টিউবারকুলিন" পরীক্ষা দ্বারা বোঝা গেলেও, শরীরের ঠিক কোনখানে তাদের অবস্থিতি, তা বোঝা যায় না।

দেহে টিউবারকুলোসিস্ ব্যাধিটি পরিস্ফুট হয়ে তখনই ওঠে যখন নাকি কোনও না কোনও সময়ে বাইরে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় অথবা আক্রান্ত স্থানে কতকগুলি অস্বাভাবিক পরিবর্তনের চিহ্ন ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে 'ইনফেকশান'টাও একটা স্বাভাবিক বা সুস্থ অবস্থা নয় এবং এটাকেও অসুস্থ অবস্থা বলেই ধরা যেতে পারে। কিন্তু মাত্র "ইনফেক-শান" যখন ঘটে, তখন সেটা অতি সামান্য জায়গার ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং দেহী কিছুমাত্র অসুস্থতাও কখনো বোধ করে না। এই "ইনফেকশান" ক্রমে পরিণত হতে পারে সত্যিকারের ব্যাধি—অর্থাৎ "ডিজিজ্"-এ।

যদিও মানব-সমাজের বহুজনেই যক্ষ্মা-জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে, তাহলেও সবাই-ই যে একেবারে রীতিমত "রোগী"তে পরিণত হয়েছে তা নয়। সংক্রমণটা অসুখের অবস্থাতে পরিণত হয় তখনই—যে অবস্থায় নাকি জীবাণুগুলির পক্ষে মানুষের দেহ একটি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। মানুষের শরীরে একেবারে সর্বপ্রথম যে সংক্রমণ ঘটে থাকে তাকে বলা হয় প্রাইমারি ইন্‌ফেক্‌শান বা প্রাথমিক সংক্রমণ, এবং তার পরে যে সংক্রমণ হয়ে থাকে তাকে বলা হয় সুপার ইন্‌ফেক্‌শান বা রি-ইন্‌ফেক্‌শান অর্থাৎ পুনঃ-সংক্রমণ। একেবারে প্রথম সংক্রমণটা সব সময়েই ঘটে

বাইরে থেকে, কিন্তু পুনঃ-সংক্রমণটা ঘটতে পারে বাহির বা ভেতর—দু দিক থেকেই। প্রাথমিক সংক্রমণের ফলে শরীরের কোনও স্থানে অবস্থান্তর ঘটতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে বলা হয়েছে যে এই ঈষৎ অস্বাভাবিক অবস্থা ভয়ের কোনও কারণ নয়—যদি নাকি এটা বাড়বার সুযোগ না পায় এবং যক্ষ্মা-জীবাণুগুলি বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে নিজেদিগকে সংখ্যায় বাড়াতে এবং ক্রমে বিস্তার লাভ করতে না পারে। আমি বলেছি যে পুনঃ-সংক্রমণ "বাহির" বা "ভিতর" দু দিক থেকেই ঘটতে পারে। "ভিতর" বলতে আমি শরীরের এই প্রাথমিক অস্বাভাবিক অবস্থার কথাই বুঝিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ঠিক "প্রাথমিক" সংক্রমণ অনেক সময়ই ব্যাধির কারণ হয় না, বিশেষ করে জীবাণুর সংখ্যা যদি খুব কম হয় তবে ফুস্‌ফুসে কোনও ক্ষত আদৌ না হতে পারে। কিন্তু পুনঃ-সংক্রমণই হচ্ছে বিপজ্জনক। "পুনঃ-সংক্রমণ" যত বারে বারে ঘটবে এবং যক্ষ্মা-জীবাণুর মাত্রা যত বেশী হবে, ততই মানুষটির ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। বাইরের কোনও সূত্র থেকে ইন্‌ফেক্‌সান বা রি-ইনফেক্‌সানকে বলা হয় এক্সোজেনাস ইনফেক্‌সান বা রি-ইনফেক্‌শান এবং যক্ষ্মা-জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন শরীরেরই ভিতরকার আগেকার কোনও ক্ষত থেকে যে নতুন সংক্রমণ হয় তাকে বলা হয় এনডোজেনাস্‌ ইনফেকসান বা রি-ইনফেকশান। অধুনা এক্সোজেনাস এবং এনডোজেনাস্‌ ইনফেকসান সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা এই ব্যাধি সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্যের উদ্‌ঘাটন করেছে, যদিও এই দুটো ব্যাপার সম্বন্ধে জ্ঞানের কিছুটা অস্পষ্টতা এখনও সম্পূর্ণ ঘোচেনি। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে বয়স্কদের চাইতে শিশুদের দেহে এই রোগপ্রবণতা অনেক বেশী এবং মানুষের বয়স ক্রমে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ সম্বন্ধে তাদের অবস্থা খানিকটা নিরাপদ হয়। কিন্তু অনেক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ এটা মানতে রাজি নন। তাঁরা বলেন, শিশুদের এবং

'রোগটা যখন টি. বি.—

বয়স্কদের ভিতর যক্ষ্মা-রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে এই যে একটা তফাৎ করা এর পিছনে কোনও যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা বলেন যে শিশুদের যে এই রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি বয়স্কদের চাইতে কম এ বিষয়ে কোনই সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। প্রকৃতপক্ষে এইটেই দেখা যায় যে শিশুদের চাইতে বয়স্কদের ভিতরেই এই ব্যাধির আধিক্য এবং আধিপত্য অনেক বেশী। এবং যে ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই ব্যাধি সৃষ্টি করার পক্ষে অনুকূল সেগুলোকে ধরে নিয়েও বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বয়স্কদের ভিতর প্রতিরোধ-শক্তি বেশী এটা প্রমাণ করা শক্ত। এই রোগ-প্রতিরোধ-শক্তির ভিতর এমন সব ব্যাপার আছে যে দেখা গিয়েছে কোনও ক্ষেত্রে শিশুই অধিক প্রতিরোধ-শক্তি-সম্পন্ন, আবার কোনও ক্ষেত্রে বা বয়স্কেরাই অধিক প্রতিরোধ-শক্তি-সম্পন্ন। এই বিষয়ে দাঁড়িপাল্লা যে ঠিক কোন জায়গায় ওঠা-নামা করে তা বোঝা কঠিন। প্রতিরোধ-শক্তি খুব সম্ভবতঃ অনেক ক্ষেত্রেই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এ সম্বন্ধে কোনও সাধারণ মত টেনে আনতে গেলে ভুলই করা হবে। এই সব বিশেষজ্ঞগণ এই কথা বলছেন যে প্রতিরোধ-শক্তি বা এই রোগ সম্বন্ধে নিরাপত্তাটাকে ওভাবে ধরে না নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে—ক্ষেত্রবিশেষেই ওগুলোর করতে হবে বিচার এবং স্বরূপ নির্ধারণ। যক্ষ্মা রোগ শিশু এবং বয়স্ক উভয়কেই সমানভাবে অভিভূত করে এটা স্বীকার করলে বৃহত্তর বিজ্ঞান-নীতিরই অনুসরণ করা হবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অধিকতর সুফল পাওয়া যাবে। সব চাইতে যুক্তিযুক্ত কাজ হচ্ছে—যে কোনও বয়সেরই হোক না কেন, প্রত্যেককে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা। এই সব বিশেষজ্ঞগণ এই মত প্রকাশ করছেন যে, বয়স্কগণ একটা মন্ত্রপূত নিরাপদ গণ্ডির মধ্যে বাস করে এবং বয়োবৃদ্ধির অবস্থাটা একটা সুবিধা-জনক অবস্থা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকাটা একটা ক্ষতিরই কারণ

হতে পারে এবং এই মত গ্রহণ ক'রে সেই অনুযায়ী কাজ করাটা মন্দের দিকেই চালনা করবে। তা ছাড়া এই মত যে যথেষ্ট ভ্রমাত্মক সে সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে। (ইউনাইটেড্ স্টেট্স্ অব্ অ্যামেরিকায় ১৯৪৪ সালের একটি হিসাবে দেখা গিয়েছে যে সেই বছরে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের টি. বি. রোগে মৃত্যুর হার সব চাইতে বেশী ছিল ৫০ থেকে ৫৪ বছর বয়স্কদের ভিতর এবং নিগ্রো পুরুষদের ছিল ৪০ থেকে ৪৪ বছর বয়স্কদের ভিতর। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের এই রোগে মৃত্যুর হার সব চাইতে বেশি ছিল ২০ থেকে ২৯ বছর বয়স্কাদের ভিতর।)

বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, শরীরাবস্থিত অল্প পরিমাণ যক্ষ্মা-বিষ ঐ রোগ থেকে শরীরকে কিছুটা নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। এই রোগের বিষ একটুখানি শরীরে থাকলে তা খানিকটা এই রোগ-প্রতিষেধকের কাজই ক'রে থাকে এবং যে দেহে জীবাণুসংক্রমণ একেবারেই হয় নাই সেই দেহ অপেক্ষা যে দেহ সংক্রামিত হয়েছে সেই দেহ রোগকে বেশী সফলতার সঙ্গে বাধা দিতে পারে। তবে বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের ভিতর বহু রকম মতামত বর্তমান এবং বিষয়টিকে উপলক্ষ্য করে এমন সব জটিল আলোচনা চলতে পারে যার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে সম্ভবপর নয়। শরীরে অল্প পরিমাণ যক্ষ্মাজীবাণু থাকাটাকে আবার একপক্ষে বিপজ্জনকও বলা হয়েছে এই জন্যে যে সুবিধা পেলে এরাই আবার শরীরের গুরুতর ক্ষতি আরম্ভ করতে পারে। প্রথম সংক্রমণের অবস্থার পক্ষে পুনঃ-সংক্রমণকে বাধা দেবার শক্তি অত্যন্তই সীমাবদ্ধ ব'লে দেখা গিয়েছে।

কৃত্রিম উপায়ে শরীরকে যক্ষ্মার হাত থেকে খানিকটা নিরাপদ করবার জন্যে "বি·সি-জি" (ব্যাসিলাস ক্যালমেট গোয়েরিন—আবিষ্কর্তাদেরই নামানুসারে)—নামে একটি টিকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বি-সি-জি টিকা সম্বন্ধে এই বইএর শেষ অধ্যায়ে আবার বলব।

রোগটা যখন টি. বি.—

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল। অনেক সময়ে অনেকে সাধারণ স্বাস্থ্য এবং দেহের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতার একটা খিচুড়ী ক'রে ফেলেন। এবং এই ভেবে আশ্চর্য বোধ করেন যে একজন পালোয়ানের মতন লোকেরও কি ক'রে টি. বি. হয়। সাধারণ-স্বাস্থ্য-ভালো-থাকাটা রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতার উপর খানিকটা প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করে বটে কিন্তু দেহকে এই রোগ থেকে রক্ষা করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা "সাধারণ-ভালো-স্বাস্থ্যে"র নাই। আর, এই প্রতিরোধ শক্তিও মানুষের দেহের সব স্থানে সমান নয়। অন্য সব স্থানে এটি খুব বেশী থাকলেও একজন লোকের ফুসফুসে হয়ত সেটি অত্যন্ত কম থাকতে পারে। আবার পরীক্ষা দ্বারা এ-ও প্রমাণিত হয়েছে একজন ব্যক্তির ফুসফুসও হয়ত সর্বত্র সমান প্রতিরোধ-শক্তিসম্পন্ন নয়। এক স্থানে শক্তিটি হয়ত বেশী, অপর অংশে খুব কম। তবে নানা রকম ব্যাধি বা অপর নানা কারণে যাদের সাধারণ স্বাস্থ্য দুর্বল, প্রতিরোধ শক্তিও তাদের দরিদ্র হওয়া স্বাভাবিক এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা তাদের অবশ্যই করতে হবে।

সাধারণতঃ প্রথমে যক্ষ্মাজীবাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করে নাকের ভিতর দিয়ে অথবা মুখের ভিতর দিয়ে। (গায়ের চামড়ার কোনও স্থানে ক্ষত থাকলে, বা কোথাও কেটে গেলে সেখান দিয়েও যক্ষ্মাজীবাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করতে পারে রক্তের সঙ্গে মিশে।) তার পরে ক্রমে ক্রমে রক্তস্রোত এবং রসবাহী গ্রন্থিগুলোর ভিতর দিয়ে পথ ক'রে ক'রে চলতে চলতে অবশেষে স্থান নেয় এসে ফুসফুসে। কিন্তু তাদের এই চলার পথ নিতান্ত সহজ নয়। প্রত্যেক জায়গাতেই এরা বাধা পেতে পেতে আসে। গলার পশ্চাদ্দেশে এক রকম চট্‌চটে শ্লেষ্মা উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "গ্ল্যাণ্ডের" অবস্থান। তারপরে জিভের পিছনে দুদিকে দুটো টন্‌সিল্‌। ক্রমান্বয়ে ঘাড়ের ভিতর এবং ফুসফুসাভিগামী পথে আরও গভীরতর

স্থানেও রয়েছে গ্ল্যাণ্ডরূপী প্রহরীর দল। এরা সকলেই জীবাণুগুলিকে দিতে থাকে বাধা। এতগুলি বাধা অতিক্রম ক'রে তবে এদের পক্ষে ফুসফুসে আগমন অথবা ক্রমান্বয়ে দেহের অপরাপর স্থানে নীত হওয়া সম্ভব হয়। অনেক জীবাণুকেই এই সব গ্ল্যাণ্ডের দল (যারা নাকি "ছাঁকনী"র মত কাজ করে) হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়; কিন্তু নিজেরা যখন হয়ে পড়ে দুর্বল বা ব্যাধিগ্রস্ত তখন আর পেরে ওঠেনা ওদের সঙ্গে।

মানুষের দেহে প্রহরীরূপে আছে যে শ্বেতকণিকার দল, তারা এই জীবাণুর বিরুদ্ধে ঘোষণা করে বিপুল সংগ্রাম। মানুষের পরম বন্ধু চির-জাগ্রত সেনানী এই যে শ্বেতকণিকার দল, এরা আপ্রাণ চেষ্টায় শুরু করে যক্ষ্মা জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করতে। এই সংগ্রামে কখনো জয়ী হয় এপক্ষ, কখনো ওপক্ষ। শ্বেতকণিকাগুলিকে যদি যক্ষ্মা-জীবাণুর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়, তবে ক্রমে ঘটে গেল সমস্ত মানুষটিরই পরাজয়; আনন্দের সঙ্গে ধ্বংসলীলা চালানোর পক্ষে যক্ষ্মাজীবাণুর রইল না কোনও বাধা। তবে একটা কথা। অনেক সময়ে সর্বপ্রথম সংক্রমণের সময়ে শরীরের সিপাইরা তাড়াতাড়ি সাড়া দিতে চায়না, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাড়া দিতে বড়ই দেরি করে। কিন্তু প্রথম সংক্রমণ ঘটে যাবার পরে গ'ড়ে ওঠে যেন একটি নতুন সাময়িক শক্তি এবং সিপাইরা হয়ে ওঠে চটপটে। ফলে পরবর্তী কালে যদি নতুন প্রবেশকারী জীবাণুর দল অতিরিক্ত শক্তিশালী না হয় তবে শরীরের ক্ষতি করবার আগেই এই সিপাইরা ওদের পারে কাবু ক'রে দিতে। যক্ষ্মা-জীবাণুর প্রথম দেহ-প্রবেশ থেকে শুরু ক'রে কেমন ক'রে তারা আপনাদের সংখ্যা বিস্তার করে, কোথা দিয়ে কি ভাবে চ'লে, কোথায় কোথায় কি ভাবে আশ্রয় লাভ ক'রে ফুসফুসের কি কি পরিবর্তন তারা পর পর সাধন ক'রে চলে, তাদের

সঙ্গে শ্বেতকণিকার যুদ্ধপ্রণালী, তাদের অবরোধ প্রক্রিয়া, অথবা তাদের ধ্বংস-সাধন—ইত্যাদি বিষয়গুলি এত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর যে তা বলবার নয়।

বাইরের কোনও সূত্র থেকে যে সংক্রমণ ঘটে থাকে, তাকে "এক্সোজেনাস ইনফেক্‌শান" বলা হয় তা আমি বলেছি। এবারে এই এক্সোজেনাস ইনফেক্‌শান সাধারণতঃ কোন্ কোন্ উপায়ে সুস্থ দেহে ঘ'টে একজন লোককে টি. বি.-গ্রস্ত ক'রে তোলে, আমি তার আলোচনা করব।

বলেছি, এক রকম জীবাণুই মানুষের দেহে এই রোগোৎপত্তির কারণ। এই জীবাণুকে টিউবার্ক্‌ল্‌ ব্যাসিলাস নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই জীবাণু অতি সূক্ষ্ম দণ্ডের আকৃতি-বিশিষ্ট এবং এর দেহ মোমজাতীয় এক রকম জিনিসের বর্ম দ্বারা আবৃত। নিজেদের চলবার শক্তি এদের নাই, অন্য বাহন আশ্রয় ক'রে হ'তে থাকে এরা অগ্রসর। যে আবরণের আড়ালে এর দেহখানি থাকে তা অতি দুর্ভেদ্য—রাসায়নিক দ্রব্যাদি দ্বারাই হোক বা অন্য প্রকারেই হোক—এদের ধ্বংসসাধন সহজ ব্যাপার নয়। আর এই জীবাণু এত ক্ষুদ্রাকৃতি যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচের তিন-চারশো গুণ বাড়িয়ে তবে একে চোখে দেখা সম্ভব হয়। একটি পিনের ছিদ্র-পথ হাজার জীবাণু অনায়াসে পাশাপাশি এক সঙ্গে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানের মাত্র একটি স্তরে যদি যক্ষ্মা জীবাণু পাশাশাশি করে সাজানো যায় তবে পঞ্চাশ ষাট কোটিরও উপর যক্ষ্মাজীবাণুর দরকার হবে। এই জীবাণু উপযুক্ত আশ্রয় পেলে নিজেদের ভাঙতে ভাঙতে অতি দ্রুতগতিতে সংখ্যায় বেড়ে চলে। পণ্ডিতেরা যক্ষ্মাজীবাণুকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। প্রধানতঃ গরুর দেহে যে জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায় এবং মানুষের দেহে অপর যে জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায় —এই দুই প্রকারের জীবাণু নিয়েই বেশী আলোচনা হয়েছে। যে শ্রেণীর

জীবাণু গাভীর দেহে এই রোগ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয়েছে বোভাইন টাইপ এবং যে শ্রেণীর জীবাণু মানুষের দেহে এই রোগ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয়েছে হিউম্যান টাইপ। যক্ষ্মাজীবাণুর আরেক শ্রেণীর নাম হচ্ছে "অ্যাভিয়ান টাইপ"। কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী, শূকর ইত্যাদির ভিতরে পাওয়া যায় এদের সন্ধান। বোভাইন টাইপের জীবাণু দ্বারা মানুষের দেহও আক্রান্ত হয়, কিন্তু এই (অ্যাভিয়ান) জাতীয় জীবাণু মানুষের দেহকে আক্রমণ করে না ব'লেই পণ্ডিতেরা বলছেন। মাছ, সরীসৃপ ইত্যাদির ভিতরে যে যক্ষ্মাজীবাণুর সন্ধান মিলেছে তাকে ফেলা হয়েছে আরেকটি শ্রেণীতে।

যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তির কাসির সঙ্গে যে গয়ের ওঠে, সেই গয়েরের ভিতর লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মা-জীবাণু থাকতে পারে। একজন অজ্ঞ বা অপরিচ্ছন্ন রোগী যখন কেশে ইতস্তত: গয়ের নিক্ষেপ করেন, অন্যের সর্বনাশ ঘটবার পথ তখনই তিনি করেন পরিষ্কার। এই গয়ের শুকিয়ে মেশে ধূলির সঙ্গে, হাওয়ায় ওড়ে সে ধূলি ; ধূলি-বাহিত জীবাণু নিঃশ্বাসের সঙ্গে করে অপরের দেহে প্রবেশ। অথবা সেই গয়েরের উপরে এসে বসে মাছি, সেই মাছি গিয়ে বসে আবার খাদ্য-দ্রব্যের উপর ; খাদ্যের সঙ্গে জীবাণু গিয়ে আশ্রয় লাভ করে মানুষের দেহে। পরিবারের একটি লোকের যখন হয় এই ব্যাধি, যত্রতত্র সে গয়ের ফেলে—উঠানে, ঘরের মেঝেতে— আর শিশুরা ঘরময়, বাড়ীময় করে ছুটোছুটি, খেলাধুলো। হাত দিয়ে তারা কত সময়ে স্পর্শ করে সেই গয়ের, কতভাবে তারা সেই বিষাক্ত গয়েরের সংস্পর্শে আসে। টিনের সৈন্য আর সেলুলয়েডের হাতী থেকে শুরু ক'রে কত জিনিস দেয় তারা মুখে পুরে, সে জিনিসগুলোর গায়ে আগেই হয়ত কত-ভাবে যক্ষ্মা-জীবাণু লেগে থাকবার সুযোগ পেয়েছে। অনেক বাড়ীতে আছেন বুড়ো দিদিমা—অনেক কাল ধরেই হয়ত তিনি কেশে আসছেন,

যেখানে-সেখানে গয়েরও ফেলে থাকেন—কেউ তা গ্রাহ্যি করে না। কিন্তু কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়, দিদিমার বুকে হয়ত বহুদিনকার একটি যক্ষ্মার স্থায়ী ক্ষত আছে—এবং তিনি হয়ত অবিরতই বাড়ীর শিশুদের সংক্রামিত করে আসছেন। বাড়ীর বুড়ো চাকর আহাম্মদ দাদা বা প্রসন্নকাকা সম্বন্ধেও ওকথা বলা যেতে পারে। জুতোর সঙ্গেও বাড়ীতে যক্ষ্মা জীবাণু প্রবেশ লাভ করবার পায় সুযোগ। তাই বলে বাড়ীর অভ্যন্তরই যক্ষ্মার একমাত্র লীলাক্ষেত্র নয়। পথ-ঘাট, অপিশ, দোকান, স্কুল, কলেজ, যান, প্রমোদ-ভবন, যে কোনও লোক-সমাগম, হোটেল, রেস্তোরাঁ—ইত্যাদির সর্বত্রই রয়েছে যক্ষ্মা জীবাণুর মেলা ; কোনও না কোনও স্থানে কোনও না কোনও সূত্র থেকে সংক্রমণ ঘটলেই হল!

অনেক টি. বি. রোগীর বদ অভ্যাস আছে, অন্যের মুখের উপর তাঁরা কাশেন। অতি ভয়ানক এই অভ্যাস—কারণ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ক্ষয়রোগী যখন জোরে জোরে কাশেন,তাঁদের কাসির সঙ্গে থুতুর কণা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই কণাগুলি জীবাণু-পূর্ণ। অনেক সময়ে যক্ষ্মা রোগীর পোষাক-পরিচ্ছদ, তোয়ালে, গামছা, বিছানা-পত্র ব্যবহার করার ফলে (সেগুলিকে উত্তমরূপে সংশোধিত না ক'রে নিয়ে) এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। অনেক রোগী নিজের মুখের কাছে হাত নিয়ে কাশেন, কিন্তু সেই হাত আর বেশ ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলবার প্রয়োজন বোধ করেন না। সেই হাত দিয়ে তিনি যখন অন্যকে স্পর্শ করেন অথবা অন্যের জিনিস-পত্র, খাদ্যদ্রব্য ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তখন তিনি ডেকে আনেন অনেক সময়ে সেই লোকটির বিপদ। চুম্বন দ্বারা অনায়াসে তিনি এই ব্যাধি সংক্রামিত ক'রে দিতে পারেন অপরের দেহে। যে পাত্রে একজন রোগী খেয়েছেন উপযুক্ত ভাবে তা বিশুদ্ধ না ক'রে যদি সেই পাত্রে অথবা সেই পাত্রের খাদ্যাবশিষ্ট কেউ ভক্ষণ করেন তবে বিপদের বোঝা ঘাড়ে তুলে

নেন তিনি। তারপরে, এক হুঁকোয় তামাক খাওয়া, কলম বা পেন্সিলের ডগা চোষা, অথবা জিব থেকে আঙুলে থুতু নিয়ে বইয়ের পাতা উন্টান, এ দ্বারাও দেহে জীবাণু সংক্রমণের সুবিধা হয়। যেখানে যেখানে যক্ষ্মারোগী গয়ের ফেলেছে সেখানকার মাটি নিয়ে খাওয়ার বাসনপত্র মাজার ভিতরেও সংক্রমণের বিপদ বর্তমান। এবারে দুধ। যক্ষ্মাগ্রস্ত গাভীর দুধে প্রচুর পরিমাণে যক্ষ্মাজীবাণু থাকতে পারে। অভিজ্ঞদের মতে এই দুধ বিশুদ্ধ এবং জীবাণু-মুক্ত না ক'রে পান করবার দরুন মানুষ—বিশেষ ক'রে শিশুরা পড়ে এই ব্যাধির কবলে। দুধটা পনের কুড়ি মিনিট ভালো ক'রে ফুটিয়ে তার পরেই সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা করে পান করলে দুধের গুণ ততটা নষ্ট হয় না এবং সংক্রমণের ভয় অনেকটা কমে যায়। কেউ কেউ এমন কথা বলেন যে ভারতবর্ষীয় গাভীদের ভিতর যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ সচরাচর তেমন দেখাও যায় না। তবে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে। ইয়োরোপ বা আমেরিকায় গৃহপালিত পশুর ভিতর যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ এবং দুধের ভিতর দিয়ে সংক্রমণ নিয়ে বিশেষ রকম আলোচনা এবং গবেষণা হয়ে থাকে। শিশুদের শরীরে যক্ষ্মাজীবাণু প্রবেশের জন্যে যক্ষ্মাজীবাণুযুক্ত দুধ প্রচুর পরিমাণে দায়ী, একথা অভিজ্ঞেরা বলেছেন।

অনেক দরিদ্র পরিবারেই ছোট একটি ঘরকে পরিবারের কয়েকজনে মিলে অধিকার ক'রে থাকতে হয়। এখন হঠাৎ এর ভিতর কারুর দেহে যদি ক্ষয় ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে দরিদ্রতা নিবন্ধন একলা রোগীকে আলাদা ঘর ছেড়ে দেওয়া পরিবারটির পক্ষে হয়ত একেবারে অসম্ভব হয় এবং রোগীকে নিয়ে এক সঙ্গে থাকতে গিয়ে সবাই হয়ত এক এক ক'রে শোচনীয়ভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

বলেছি, বুকে ছাড়াও অন্য জায়গায় টি. বি. হয়ে থাকে। দেহের অন্য কোথাও টি. বি. হলে টি. বি.র ক্ষত থেকে উৎপন্ন পুঁজ বা স্রাব বিপজ্জনক

হয়ে থাকে, কারণ তার ভিতরে যক্ষ্মাজীবাণু পাওয়া যায়। অন্ত্রাদি অথবা মূত্র যন্ত্রাদি আক্রান্ত হলে রোগীর মল, মূত্র এই জীবাণুর বাহন হয়ে থাকে। যে কোনও রকম টি. বি. রোগীর ঘামে জীবাণু থাকে না তাই ব'লে।

"টিউবার্ক্ল্ ব্যাসিলাস"-ই যদিও মানুষের দেহে টি. বি. উৎপাদন করবার মুখ্য কারণ, তা হলেও আরও কতকগুলি ব্যাপার আছে যেগুলি এই রোগ উৎপাদনের ব্যাপারে গৌণভাবে সাহায্য করে থাকে। ফসল ফলাতে হলে যেমন বীজের দরকার তেমন আবার ক্ষেত্রকেও উপযুক্ত ভাবে তৈরী হতে হয়। অসুখের বেলাতেও এ নিয়ম খাটে। টিউবার্ক্ল্ ব্যাসিলাস —এই অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ জাতীয় জীবাণুকে যদি "বীজ" ধরা যায়, তবে কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ভিতরে মানুষের দেহ তৈরী হয়ে ওঠে উপযুক্ত "ক্ষেত্র" রূপে। দেশবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যের হানি যতই ঘটে চলবে ততই যে যক্ষ্মাব্যাধির দুরন্ত আস্ফালন বেড়ে চলবে এটা স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য-হানি কেমন করে ঘটে সে কথা বলতে প্রথমেই আসে খাদ্যের কথা। এমন সহস্র সহস্র হতভাগ্য পরিবার এদেশে আছে—ভালভাবে উদর পূরণ করবার জন্যে দুটি বেলার অন্নসংস্থান হয় না। ক্ষুধার জ্বালায় জীর্ণ, জর্জরিত। যারা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান, যারা দুটি মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করবার ক্ষমতা রাখে, তাদেরও অনেকে জানেনা খাওয়ার পদ্ধতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি সহজ নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করার ফলে দেহ হয়ে পড়ে পীড়িত। তারপরে অনেক খাদ্যদ্রব্য সব সময়ে বিশুদ্ধভাবে পাওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর এবং বিশুদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করবার মত আর্থিক অবস্থা এদেশে মুষ্টিমেয় লোকেরও আছে কিনা সন্দেহ। যা খেয়ে জীবন ধারণ করবার চেষ্টা করতে হবে তা যদি প্রথমে হয় অপর্যাপ্ত, তারপরে অনেক সময়ে অখাদ্য, তা হলে দেহ যে অবিলম্বে ব্যাধির আকর হয়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কি! এদেশে এমন পিতামাতার অভাব নাই

যারা তাদের শিশুকে এক বিন্দু দুধ দিতেই অক্ষম—যক্ষ্মাজীবাণুযুক্ত দুধ খেলে শিশুর শরীরে যক্ষ্মা প্রবিষ্ট হবে এতো অনেক দূরেরই কথা!

তারপরে আলো-বাতাস। অনেক সময়েই একটি মহানগরীর বুকে সাধারণ মানুষকে যেভাবে জীবন যাপন করতে হয়—সে চিত্র মনে একটি বিভীষিকারই সৃষ্টি করে। ধূলো, কল-কারখানার ধোঁয়া সারা আকাশকে গ্রাস ক'রে বিরাজ করে রাহুর মত—আকাশের অজস্র, অনন্ত আশীর্বাদ আলো, বাতাস ওঠে বিক্ষুব্ধ, বিষাক্ত হয়ে। এমন অনেক কক্ষে মানুষের বাস করতে হয়—যেখানে তারা প্রবেশ করতে পারে না, তাদের কল্যাণ-স্পর্শে সে সব স্থানকে পারে না নির্দোষ, সুন্দর ক'রে তুলতে। একটু আগে যা বলেছি—অসীম দারিদ্র্যের তাড়নায় কত সময় একটি ক্ষুদ্র কক্ষকে অধিকার করতে হয় একটি সমগ্র পরিবারের ; পরস্পরের বিষাক্ত, দূষিত প্রশ্বাস পরস্পরকে করতে হয় গ্রহণ।

এর পরে আছে সহস্র দুশ্চিন্তা। অর্থের নিদারুণ অসচ্ছলতা—অথচ প্রয়োজন একান্ত। প্রতিদিনের অভাবের তাড়না, প্রতিমুহূর্তের সহস্র ব্যর্থতার নিদারুণ হাহাকার, প্রতি পদে পদে মানসিক শান্তির বিপুল বিপর্যয়—এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাধির প্রশস্ত পথের দ্বারোন্মোচন! বস্তুতঃ কোনও সুপ্রসিদ্ধ যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ ঠিক কথাই বলেছেন যে, টিউবারকিউলোসিস্ প্রধানতঃ মানুষের বুভুক্ষার প্রকাশ—বিশুদ্ধ বাতাসের, বিশুদ্ধ ও পর্যাপ্ত খাদ্যের, বিশুদ্ধ পরিবেশের এবং বিশুদ্ধ মনের। এবং এই চারিটির উপর ভিত্তি করেই পীড়িত মানবজাতির জন্য স্বাস্থ্য-মন্দির নির্মিত হতে পারে—টিউবারকিউলোসিস্, তথা সমস্ত ব্যাধির আরোগ্য এবং প্রতিষেধকল্পে!

প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেহ নানাভাবে এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবার উপযুক্ত হতে পারে। অনিয়মিত পানাহার, অনিদ্রা, কঠিন পরিশ্রম, বুকের

অংগঠন, অতিরিক্ত মদ্যপানাদি দোষ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা, পুনঃ পুনঃ গর্ভ ধারণ, কুঁজো হয়ে বসা বা শোয়ার কদভ্যাস, এ সবই শরীরের করে অপকার এবং যক্ষ্মাজীবাণুর পক্ষে এনে দেয় সুবিধা ও সুযোগ। দেহে সংক্রমণ ঘটে থাকলে গুরুতর কোনও ভয়, গভীর কোনও শোক বা দুঃখ অথবা অন্য কোনও কঠিন রকমের স্নায়বিক বিপর্যয়ের পরিণতি স্বরূপও এই ব্যাধি করতে পারে একটি মানুষের ভিতরে সহসা আত্মপ্রকাশ।

এক এক রকমের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপরেও যক্ষ্মাব্যাধির প্রসার অনেক সময় নির্ভর করে ব'লে কেউ কেউ বলেছেন। অতিরিক্ত স্যাঁত্‌সেঁতে ভাব—তার ভিতরে আবার মিশে থাকে প্রচণ্ড গরম—এ রকম স্থানের অধিবাসীদের জীবনীশক্তি সাধারণতঃ দুর্বল হওয়া আশ্চর্য নয়। জীবনীশক্তি যেখানে ক্ষীণ, যক্ষ্মার প্রতাপ সেখানে প্রবলতর। জীবিকা নির্বাহের জন্যে মানুষকে অনেক সময় এমন সব কাজ বেছে নিতে হয় যা নাকি তার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচুর ক্ষতিকর। এবং সঙ্গে সঙ্গে আছে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং উপযুক্ত বিশ্রামের অভাব। এগুলি ক্ষয়ব্যাধির পথ করে পরিষ্কার। প্লুরিসি, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ধরনের ব্যাধির আক্রমণের পরে আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করবার সময়ে কিছুদিন যদি শরীরের বিশেষ যত্ন না নেওয়া যায় এবং যথেষ্ট সতর্কভাবে না থাকা যায় তবে অনেক সময় টিউবারকিউলোসিসের মাথা তুলে দাঁড়ান বিচিত্র নয়। কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ, আমাশয়, ইত্যাদি ধরনের দীর্ঘকালস্থায়ী অসুখে ভুগে ভুগে জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে যাবার পরে যক্ষ্মাক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। দেশের গুরুতর অর্থনৈতিক অবনতি, সহস্র অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্যপূর্ণ সামাজিক আবহাওয়া, অতি-অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের ভেতর বাসস্থান—ইত্যাদির ভিতরে যক্ষ্মা চালিয়ে থাকে আপন আস্ফালন।

তাহলে দেখা গেল যক্ষ্মারোগের উৎপত্তির বিষয় বলতে গিয়ে দেহে জীবাণু-প্রবেশের অবস্থা স্বীকার করে নিয়েও আরও কিছু বলবার থাকে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যক্ষ্মাজীবাণু যদিও প্রথম কারণ—লোকের নিদারুণ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, তাদের শোচনীয় স্বাস্থ্যহীনতা, অনাহার, পুষ্টিকর এবং বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাব, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কুৎসিৎ ব্যাধির নিত্য তাড়না, আলো-হাওয়া-শূন্য এবং জনাকীর্ণ স্থানে বাস, ধূলি-ধোঁয়া দ্বারা দূষিত হাওয়া নিশ্বাসরূপে গ্রহণ, অতিরিক্ত মানসিক অশান্তি, অনিয়মিত স্নানাহার, অতিরিক্ত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, অল্প পরিসরে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ, ভীতি, গভীর দুঃখ অথবা শোক, গুরুতর রকমের স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা, অনুপযুক্ত জীবিকোপায়, নিত্যকার জীবনে আরও কতকগুলি স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন, শরীরের অবনতিকারী প্রাকৃতিক আব-হাওয়া, বিশেষ কতকগুলি শারীরিক বিকৃতি—টিউবারকিউলোসিসের এত বেশী প্রসার লাভ করবার মূলে আনুষঙ্গিক কারণ রূপে এগুলিরও নির্দেশ করা হয়েছে।

একটি ধারণা এতকাল ধরে চলে আসছিল যে, যক্ষ্মা বংশানুক্রমিক ব্যাধি এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান-সন্ততিও যক্ষ্মাগ্রস্ত হবে। কিন্তু এটা ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে তারা যে সন্তান উৎপাদন করবে তারাও হয়ত সাধারণ ভাবে খারাপ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হতে পারে—যদিও যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল শিশু অনেকই দেখা গেছে। কিন্তু শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ থাকবার মূলে বাপ মায়ের খারাপ স্বাস্থ্য অনেক সময়েই থাকলেও বাপ মায়ের সেই স্বাস্থ্যহীনতা যে কেবল যক্ষ্মা দ্বারাই ঘটে থাকবে তা নাও হতে পারে—হার্টের অসুখ, ডিস্‌পেপসিয়া, ম্যালেরিয়া—ইত্যাদি যে কোনও

ব্যাধি দ্বারাই ঘটতে পারে। শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যদি পিতামাতা যথেষ্ট সতর্ক হন এবং তার পরিপুষ্টির দিকে সব রকম নজর দেন, তবে শিশু সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং পরিণত হবে সবল বালক বা বালিকায়।

ব্যাপারটা আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে এই: পিতা বা মাতার ব্যাধি যদি সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং গয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে অজ্ঞতার জন্যেই হোক বা দারিদ্র্যের জন্যেই হোক যদি অত্যন্ত অসাবধানতা এবং অমনোযোগের সঙ্গে শিশুর লালন পালন তাঁরা করতে থাকেন তবে সেই শিশু অচিরাৎ হয়ে পড়ে আক্রান্ত। যক্ষ্মাক্রান্ত পিতার চেয়ে যক্ষ্মাক্রান্ত মাতার পক্ষেই শিশুকে সংক্রামিত করবার সুবিধা এই জন্যে সাধারণতঃ বেশী যে পিতার চেয়ে মাতাই শিশুর সঙ্গে মেলামেশা বেশী ক'রে থাকেন। শিশুকে খাওয়ানর ভার এবং স্তন্যদানের ভার (বেশী আদরের ভারও ?) মায়েরই উপর। বেশীর ভাগ সময়ে মাকেই শিশুকে বুকে নিয়ে শুতে হয়, তাকে ধোয়াতে মোছাতে হয়, তাকে জামা কাপড় পরাতে হয়। রান্নাঘরের সমস্ত ভারও মায়েরই উপর। কাজেই পিতার চেয়ে মাতাই অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর বিপদের উৎস-রূপিনী। তবে যক্ষ্মাক্রান্ত পিতা বা মাতার সন্তান বাইরের কোনও সূত্র থেকেও যে আক্রান্ত না হতে পারে তার কোনও মানে নাই—যদি নাকি তার চলা-ফেরা-খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করা হয়। এই সব ব্যাপারগুলিকে সাধারণতঃ উপেক্ষা করা হয়ে থাকে এবং ব্যাধিটিকে ভাবা হয় "হেরিডিটারি" ব'লে।

যাই হোক, অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়েছে যে যক্ষ্মাক্রান্ত পিতা থেকে বংশানুক্রমিকভাবে সন্তানের দেহে রোগ প্রবেশের সম্ভাবনা থাকবার সোজাসুজি কোনও উপায় নাই; তবে যক্ষ্মাক্রান্ত মাতা থেকে কদাচিৎ সে

সম্ভাবনা থাকে বটে। কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে মায়ের জরায়ুর অভ্যন্তরে থাকাকালীন যদি আদৌ কখনও শিশু আক্রান্ত হয়—তবে তা হয়ে থাকে কেবল যখন "প্ল্যাসেণ্টা" যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত থাকে। প্ল্যাসেণ্টা হচ্ছে চ্যাপ্টা, গোলাকৃতি, স্পঞ্জের মত আধার জাতীয় যন্ত্র—যার কাজ হচ্ছে ভ্রূণের পরিপুষ্টি সাধন এবং যা প্রসবের পরে দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়। বাংলায় চলিত ভাষায় একে বলা হয়ে থাকে "ফুল"। "প্ল্যাসেণ্টা" থেকে যক্ষ্মাজীবাণু নাভিরজ্জুর ভিতর দিয়ে এসে ভ্রূণকে আক্রান্ত করতে পারে। কিন্তু "প্ল্যাসেণ্টা"র যক্ষ্মারোগের সম্ভাবনা এতই অল্প যে এ সম্বন্ধে আলোচনা বা গবেষণা কেবল বিশেষজ্ঞদের ভিতরেই নিবদ্ধ থাকবার মত। কল্পনায় যক্ষ্মারোগের বংশানুক্রমিকতাটা ভাবা অসম্ভব বা অসঙ্গত না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এটা কদাচিৎই ঘটে থাকে এবং নিরাপদে এই কথাই মেনে নেওয়া যায় যে যক্ষ্মা বংশগত নয়। মায়ের গর্ভ থেকে এই ব্যাধি শিশু অর্জন কখনও করে না বল্লেই চলে ; যখন করে—তা ভূমিষ্ঠ হবার পরে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে, যখন রুগ্ন পিতা বা মাতার অসতর্ক-প্রক্ষিপ্ত যক্ষ্মাজীবাণু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের সুযোগে অতি সহজেই শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। টিউবারকুলোসিস্ যে "হেরিডিটারি" এ কথা এখন মিউজিয়ামেই তুলে রাখবার মত ; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটা মানতে যাওয়া অন্যায় এবং অসুবিধাজনকই সকলের পক্ষে হবে।

প্রাচীনকালে যক্ষ্মাব্যাধির অস্তিত্ব থাকলেও তার ব্যাপকতা বর্তমান কালের মত অধিক ছিল না এবং বর্তমান কালের মত তা খুব সম্ভবতঃ এত বড় সমস্যার সৃষ্টি করেনি। যখন কোনও জাতি গ্রাম থেকে শহরে এবং শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ক্রমে ক্রমে এসে বাস করবার অবস্থার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে তখন তাদের ভিতর যে এই ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এটা সভ্য জগতের সমস্ত অংশেই পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশ যখন কৃষিপ্রধানের

অবস্থা থেকে শিল্প এবং বাণিজ্যপ্রধানের অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকে, যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হারও তখন বেড়ে ওঠে। ইয়োরোপ এবং অ্যামেরিকায় দেড়শো বছর আগে এ ঘটনা ঘটেছে এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে এটা হয়েছে শুরু। বর্তমান যুগে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াতের হয়ে গিয়েছে প্রচুর সুবিধা—বহু রকমের যান-বাহনের ভিতর দিয়ে। পূর্বকালে এ অসুখটা অনেক সময়েই থাকত স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ; কিন্তু আধুনিক সময়ে সহস্র সহস্র লোক অবিরত গ্রাম থেকে আসছে শহরে, শহর থেকে যাচ্ছে গ্রামে। অনেক যক্ষ্মা-মুক্ত পল্লীস্থান থেকে সহস্র সহস্র লোক প্রতিরোধশক্তিহীন দেহ নিয়ে শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র মহানগরীগুলিতে এসে পড়ছে এই ব্যাধির কবলে এবং পুনরায় তারা স্বস্থানে গতায়াত ক'রে সে সব স্থানে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই ব্যাধির বিষ। অধুনাতন সময়ে শহরে, গ্রামে, দিকে দিকে সর্বত্র যক্ষ্মাব্যাধির প্রলয় তাণ্ডব শুরু হবার মূলে যে কারণ-তত্ত্ব রয়েছে তার আলোচনায় বর্তমানে এ প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুশ্চিন্তা এমন একটি ক্ষতিকর বিলাসিতা যা নিয়ে তোমার বেশীক্ষণ কাটানো উচিত নয়। মনকে হালকাভাবে ভাসিয়ে দাও; কি ক'রলে যে দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এটা বলা ভারি শক্ত। কেউ এটাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়, কেউ বা নিজের অবস্থাকে দার্শনিকের মত গ্রহণ ক'রে সব ঘটনাকে নিজের স্রোতেই ব'য়ে যেতে দেয়। খুব বেশী দূর ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে বর্তমানের ভেতরেই বেঁচে থেকে কাছাকাছি-কার ভয়গুলির সঙ্গে একবার বোঝাপড়া ক'রে নিতে পারলে তোমার আরোগ্যলাভ দ্রুত এবং সহজ হবে। রাগ এবং হতাশা শরীরের শক্তিকে পুড়িয়ে ফেলে, কিন্তু রোগকে জয় করবার জন্যে তোমার পক্ষে এই শক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। (এন, এ, পি, টি.)

টিউবারকুলোসিস্ ব্যাধিটির কারণ জানবার পরেই আমাদের জানবার দরকার হয়—এই ব্যাধি দ্বারা যে দেহ আক্রান্ত হয়েছে কি কি লক্ষণ তা সূচনা করে এবং কি কি পথে এই অসুখের গতি। কখনও কখনও এই ব্যাধির আবির্ভাব এত ধীর এবং নিঃশব্দ যে প্রথম অবস্থায় অনেক সময় একজন লোকের পক্ষে উপলব্ধি করাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, সে এমন নিষ্ঠুর, এমন কুটিল, এমন হিংস্র একটি ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এমন কি এমনও ঘটে থাকে—হয়ত খুব বেশী ক্ষত নিয়েও একজন লোক বছরের পর বছর কাটিয়ে যেতে পারে—সে যে প্রকৃতপক্ষে পীড়িত এটা উপলব্ধি না ক'রে, অথবা ছোট-খাট লক্ষণগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে।

তবে যথাযথভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই ব্যাধি কখনও অতি দ্রুতগতিতেও অগ্রসর হয়ে থাকে, কখনও বা অতি ধীর গতিতে। কখনও কখনও কিছুদিন থেমে থাকে এবং আবার বাড়তে থাকে, কখনও বা একই অবস্থায় থেকে যায়, কখনও আবার কমের দিকেও যেতে থাকে। এ সবই নির্ভর করে কি শ্রেণীর এবং কি পরিমাণ যক্ষ্মাজীবাণু শরীরে প্রবেশ করেছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা, বয়স, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি কি রকম—এ সবের উপর।

রোগীর "পারিপার্শ্বিক অবস্থা"টা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন নাকি এই অসুখ কমাতে প্রকৃতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক তেমনি আগুনে আরও বেশী করে ইন্ধন যোগায়। মানুষের জীবনের মতনই এটা পরিবর্তনশীল। পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত আহার, নিয়মিত নিদ্রা এবং বিশ্রাম,

রোগটা যখন টি. বি.—

অল্প পরিশ্রমের অল্পক্ষণব্যাপী হাল্‌কা কাজ—যা নাকি বেশী মানসিক শ্রম বা দুশ্চিন্তার কারণস্বরূপ না হয়—এগুলো অনেক সময়ে রোগীর বিশেষ কোনও ক্ষতি করে নাই এ রকম দেখা গেছে এবং কোনও রকম নিয়মিত চিকিৎসা ছাড়াই অসুখ নিয়েই তারা অনেক দিন কাটিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে, এসব রোগীর অনেকগুলি আপনা থেকেই ভালও হয়ে যায় এবং অন্য কোনও অসুখে তাদের মৃত্যুর পরে তাদের বুকের সেরে যাওয়া ক্ষত চিহ্ন থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু কঠিন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, গুরুতর কোনও শোক বা ক্ষতি, অপর কোনও বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া বা বিশেষ কোনও দুর্ঘটনা দ্বারা যক্ষ্মারোগীর চাপা ব্যাধি আগুনের মতনই দপ করে জ্বলে উঠতে পারে এবং রোগের গতি বন্ধ করবার জন্যে বিশেষ কোনও চিকিৎসা শুরু করবার অবিলম্বে প্রয়োজন হতে পারে।

আদিম জাতির উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক পণ্ডিত এই কথা বলেছেন যে সর্বপ্রথম যক্ষ্মাজীবাণুর সম্মুখীন হবার অবস্থায় মানুষের যে কোনও জাতিই একে অপরটির মত উক্ত জীবাণু দ্বারা অভিভূত হবার অবস্থায় থাকে। মানুষের ভিতরে যারা "সভ্যতা"র আলোক প্রাপ্ত হয়েছে তাদের দেহ যে এই রোগ থেকে কিছুটা নিরাপদ থাকবার খানিকটা শক্তি অর্জন করেছে বা তাদের দেহে যে এই রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা জন্মেছে তার কারণ হচ্ছে এই যে, অনেক বছর ধরে পুরুষানুক্রমে তারা যক্ষ্মাজীবাণুর সম্মুখীন হয়ে এসেছে। প্রথম সংক্রমণের অবস্থাই এক পক্ষে তাদের আংশিকভাবে নিরাপদ করেছে। কিন্তু পৃথিবীর আদিম অধিবাসী বা যারা আমাদের মতে "অসভ্য"—তাদের দেহ কতকটা একেবারে নতুন মাটির মত, তাদের শরীরে যক্ষ্মাজীবাণু গিয়ে বাসা বাঁধলে তারা তাদের দ্বারা সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে। "সভ্য" মানুষের শরীরে রোগ উৎপন্ন

হলেও চট ক'রে মারাত্মক হয়ে ওঠে না, সারবারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু "অসভ্য" জাতীয় মনুষ্য একবার আক্রান্ত হলে অতি অল্প সময়ের ভিতর এই ব্যাধি গুরুতর আকার ধারণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পণ্ডিতদের মতে রোগকে বাধা দেবার এবং রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি যে সমাজে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, সেই সমাজের লোকেই অর্জন করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের গানের দু একটি শব্দ একটু বদলে বলছি: "বক্ষের দরজায় যক্ষার রথ যেই থামলো", প্রায়ই এমন হতে দেখা গেল যে, সামান্য পরিশ্রমের পরেই কেমন যেন বোধ হয় একটা হাঁফ ধরা বা দুর্বলতার ভাব—বুকটার ভিতর কেমন যেন ধড়ফড় করে। নিজেকে কেমন যেন নিস্তেজ লাগে। পড়াশোনা, কাজকর্মে মন লাগতে চায় না, একাগ্রতা বার বার নষ্ট হয়ে যায়, কেমন যেন "কিছু ভাল লাগে না"। যখন-তখন সারা দেহে আসে একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদের ভাব, কেমন একটা শূন্য ভাবনায় ইচ্ছে করে সময় কাটাতে। ভাল ক'রে খেতে ইচ্ছে হয় না, খিদে বোধ হয় না। মাঝে মাঝে পেটের গোলমাল লেগেই থাকে—পেটটা কিছুতেই চায় না ভাল থাকতে। সন্ধ্যা বেলার দিকে চোখ-মুখটা একটু জ্বালা করে, হাত-পায়ের তেলোগুলোও একটু জ্বালা করে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হতে চায়না, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবার সময় নিজেকে ভারি অবসন্ন বোধ হয়। কখনও কখনও রাত্তিরে কপাল-টা অথবা গা-টা একটু ঘামে।

হঠাৎ একদিন একটু সর্দি করে বসে। এক দাগ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-মিক্‌শ্চার অথবা এক ফোঁটা অ্যাকোনাইট্ অথবা তুলসী পাতার রস দিয়ে এক পুরিয়া মকরধ্বজ খেয়ে সে সর্দির কোনই উপকার হতে চায় না। একটু হয়ত সর্দিটা কমছে, কিন্তু শুরু হয়ে যায় খুশ্‌খুশে কাসি। কখনও কখনও কাসিটা খুশ্‌খুশে-ভাবেই চলতে থাকে, কখনও কখনও বা ওঠে জোরে মাথা চাড়া দিয়ে। ফুটপাথের ওপারেই যে বিজ্ঞাপনওয়ালা কবরেজ

আপনার নজরে পড়ে, আপনি তাঁর কাছ থেকে আনেন একটা পাঁচন লিখিয়ে; অথবা আপনার যে মামা অথবা পিসেমশাই ডাক্তার—তাঁর ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে বিনি পয়সায় নিয়ে আসেন একটা লালচে রঙের থ্রোট-পেন্ট, এবং তুলি ক'রে মহা উৎসাহে লাগাতে শুরু করেন গলায়। কিন্তু সে কাসির উপশম আর কিছুতেই হয় না। কাসির সঙ্গে সঙ্গে গয়েরও উঠতে আরম্ভ করে দেয়। প্রথম প্রথম হয়ত গলা টানলে আসতে থাকে ফেনা-যুক্ত, পরিষ্কার, পাতলা থুতু। কিন্তু অসুখ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে থুতু দাঁড়ায় ঘন, হল্‌দে বা ধূসর বা সবুজ আভাযুক্ত গয়েরে, এবং পরিমাণেও বৃদ্ধি পায় খুব। একদিন আপনি কেসে থুতু ফেলেন, হঠাৎ খেয়াল করে দেখতে পান, তাতে পরিষ্কার রক্তের ছিটে অথবা সবটুকুই রক্ত। কখনও কখনও বেশ কয়েক ঝলকই হয়তো উঠে এল! বস্তুতঃ ঘন ঘন সর্দি লাগা, দীর্ঘকালস্থায়ী কাসি, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা—এ সব এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণগুলির অন্যতম। এ ছাড়া অন্য প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—জ্বর। ম্যালেরিয়া জ্বরের মত সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে সাধারণতঃ এ জ্বর আসে না, আমাদের পিতামহীদের ভাষায় "ঘুশ্‌ঘুশে" জ্বর ব'লে এর প্রকৃতি বর্ণন করতে পারি। সাধারণতঃ বিকেল বা সন্ধ্যার দিকেই জ্বরটা বোধ হয়—থার্মোমিটার লাগালে হয়ত নিরেনব্বই অথবা সাড়ে নিরেনব্বই অথবা একশ'-খানেক ওঠে। আবার তার চেয়ে অনেক সময় বেশীও যে না হয় তা নয়। কখনও কখনও বা সব সময়েই অল্প জ্বর গায়ে লেগেই থাকে। গাল দুটি হয় একটু অ-স্বাভাবিকভাবে রক্তিম আভাযুক্ত। নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে।

যক্ষ্মাগ্রস্তের পক্ষে এই নাড়ির বেগটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। ঘুশঘুশে জ্বর এই রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নাড়ির বেগের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আরও আছে—অনেক সময় গলার স্বর হয়ে যায় ভাঙা-ভাঙা, ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ হওয়াও আশ্চর্য নয়। বুকে মাঝে মাঝে বেদনা হতে পারে। বুকের এই বেদনার ঠিক কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই। বুকে-পিঠে—বিশেষ ক'রে কাঁধের উপর দিয়ে কখনও একটা অস্বস্তিকর চাপ-চাপ বোধ হয়, কখনও বা নিশ্বাস একটু জোরে টানতে গেলেই কেমন পিন ফোটানর মত বা ছুরি চালানর মত বোধ হয়। তবে বেদনাটির তীক্ষ্ণতা এবং তীব্রতা তখনই সাধারণতঃ বেশী থাকে যখন ব্যাধিটি "প্লুরিসি"যুক্ত হয়। নতুবা অধিকাংশ সময়ে বুকের তেমন কিছু ব্যথা থাকে না।

কখনও কখনও দেখা গিয়েছে যে যক্ষ্মাটা প্রথমে আদৌ যক্ষ্মার মত দেখা না দিয়ে অন্যভাবে দেখা দিয়েছে। একটি লোক হঠাৎ হয়ত ব্রংকাইটিস্ বা নিউমোনিয়া বা টাইফয়েড্ বা প্লুরিসিগ্রস্ত হল। চিকিৎসক তাকে সেই অনুযায়ীই চিকিৎসা করতে থাকলেন—মনে অন্য কোনও সন্দেহের অবকাশ না রেখে। কিন্তু রোগের বিশেষ উপশম না হয়ে কিছুদিন বাদেই যক্ষ্মার লক্ষণ হয়ে উঠতে লাগল সুস্পষ্ট—একে একে। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষে এ অসুখকে ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের সঙ্গেও খিচুড়ি করে ফেলা অনেক সময়ে সম্ভব। মেনিঞ্জাইটিসের আকারেও হতে পারে এ ব্যাধির আবির্ভাব।

শিশুদের দেহ যখন এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাদের ভিতরেও এই সব লক্ষণই প্রকাশ পায়। তারা উৎসাহহীন এবং অপটু হয়ে যায়। তাদের যে রকম বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, সে রকম হয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একেবারে শুকিয়ে যায়। ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব হয়। বুকের আকার হয় চ্যাপ্টা, গলায় এবং ঘাড়ে জাগে গ্রন্থি-স্ফীতি। এই গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডগুলি মাঝে মাঝে পেকেও উঠতে

পারে, এবং ফাটবার পরে সহজে কিছুতেই শুকুতে চায় না অনেক সময়ে।

ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় মলদ্বারে স্ফোটকোৎপত্তি, ভগন্দর, স্ত্রীলোকের পক্ষে ঋতুর গোলযোগ বা সম্পূর্ণ ঋতুবন্ধ হওয়া—ইত্যাদি লক্ষণও প্রকাশ পেতে পারে।

টিউবারকুলোসিস্‌-এর আরেকটি প্রধান লক্ষণ—ক্রমান্বয়ে দেহের ওজনের হ্রাস। আপনার শরীর কিছুতেই ভাল থাকছেনা, গলাটা একটু খুশ-খুশ করে, বিকেলের দিকে বেশ জ্বর-জ্বর লাগে। একদিন হয়ত শিয়ালদা ইস্‌টিসানে আপনার মাসমাকে দার্জিলিঙ মেইলে তুলে দিতে গিয়ে শুধুই একটু মজা দেখবার জন্যে মাল ওজন করবার স্কেলের উপর একটু উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দেখলেন, অনেকদিন আগে আপনি একবার আপনার যে ওজন নিয়েছিলেন, তার চাইতে বেশ অনেকখানি কমে গেছেন। অল্প একটু চিন্তান্বিত হয়ে পনের বিশ দিন অথবা মাস খানেক পরে আবার নিজের ওজনটা নিলেন; আরও কয়েক পাউণ্ড কম।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের বহু লোকেরই দেহের ওজন অনেক কম—স্বাভাবিকভাবে যতটা থাকা উচিত তার চাইতে। তবে কারুর কারুর গড়ন হালকা ধরনের এমনিই থেকে থাকে। ওজন কম থাকাটাই যক্ষ্মারোগের পরিচায়ক নয়। যে ওজনটা একভাবেই চিরদিন রয়েছে, অকারণে যদি সহসা ক্রমান্বয়ে তার চাইতে কমতে শুরু হয়, তবেই সন্দেহের নজরে তাকে দেখতে হবে।

ওজনের কথায় প্রথমেই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে, যে, একজন লোকের দেহের স্বাভাবিক ওজন কত হওয়া উচিত। আমি একটি তালিকা দিলাম—(বাঙ্গালী বয়স্কের পক্ষে) কত বয়সের কত ফিট কত ইঞ্চি লম্বা

বাঙ্গালীর দৈহিক মাপ ও ওজন

(কলিকাতা কর্পোরেশন—প্রচার বিভাগের সৌজন্যে)

বয়স	দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)	ওজন (পাউণ্ড)	বয়স	দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)	ওজন (পাউণ্ড)
৫ বৎসর	৪১'৬	৪১'১	১১ বৎসর	৫৩'৩	৭০'২
৬ "	৪৩'৮	৪৫'২	১২ "	৫৫'১	৭৬'৯
৭ "	৪৫'৭	৪৯'১	১৩ "	৫৭'২	৮৪'৮
৮ "	৪৭'৮	৫৩'৯	১৪ "	৫৯'৯	৯৪'৯
৯ "	৪৯'৭	৫৯'২	১৫ "	৬২'৩	১০৭'১
১০ "	৫১'৭	৬৫'৩			

বয়স	দৈর্ঘ্য	৪'-১০"	৪-১১"	৫'-০"	৫'-১"	৫'-২"	৫'-৩	৫'-৪"	৫'-৫"	৫'-৬"	৫'-৭"	৫'-৮"	৫'-৯"	৫'-১০"	৫'-১১"	৬'-০"
২০ বৎসর	ওজন	১০০	১০৩	১০৬	১০৮	১১১	১১৪	১১৭	১২০	১২৪	১২৮	১৩২	১৩৬	১৪০	১৪৪	১৪৮
২৫ "		১০৫	১০৭	১০৯	১১১	১১৩	১১৬	১১৯	১২২	১২৫	১২৯	১৩৫	১৩৭	১৪২	১৪৭	১৫২
৩০ "		১০৮	১১১	১১৩	১১৬	১১৯	১২২	১২৫	১২৮	১৩১	১৩৫	১৩৯	১৪৪	১৪৮	১৫৩	১৫৮
৩৫ "		১১১	১১৫	১১৬	১১৯	১২১	১২৫	১২৮	১৩১	১৩৪	১৩৮	১৪২	১৪৬	১৫০	১৫৫	১৬০
৪০ "		১১৫	১১৭	১২০	১২৩	১২৬	১২৯	১৩৩	১৩৭	১৪১	১৪৫	১৪৯	১৫৪	১৫৯	১৬৪	১৬৯
৪৫ "		১১৮	১২১	১২৪	১২৭	১৩০	১৩৩	১৩৭	১৪০	১৪৩	১৪৭	১৫১	১৫৫	১৬০	১৬৫	১৭১
৫০ "		১২০	১২২	১২৫	১২৭	১৩০	১৩৪	১৩৮	১৪১	১৪৫	১৫০	১৫৪	১৫৯	১৬৪	১৬৯	১৭৪

লোকের কত স্টোন কত পাউণ্ড ওজন এবং (বাঙ্গালী বালক-বালিকার পক্ষে) গড়ে কতটুকু দৈর্ঘ্যের কত বছর বয়সের বালক-বালিকার কত স্টোন কত পাউণ্ড ওজন হওয়া উচিত, এই তালিকা থেকে জানা যাবে। এই তালিকায় একটি বিষয় দ্রষ্টব্য যে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের ওজন ভিন্ন করে দেখান হয় নাই। তবে স্ত্রীলোকদের ওজন পুরুষদের চাইতে স্বভাবতঃ কিছু কম হয়ে থাকে।

যদিও ক্রমান্বয়ে দেহের ওজনের হ্রাস টি.বির অন্যতম প্রধান লক্ষণ, তবুও একথা যেন কখনই ভাবা না হয় যে মোটা মানুষের দেহে এই ব্যাধি থাকতে পারে না। ওজনে মোটে না কমেও এই ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া এবং গয়েরের সঙ্গে যক্ষ্মাজীবাণুকে উৎক্ষেপন ক'রে চারিদিকে ছড়ান একজনের পক্ষে খুবই সম্ভব, এবং এ রকম লোক থেকেও থাকে অনেক। ওজনে কমাটা সব ক্ষেত্রেই যে একেবারে দৃষ্ট হবে, তা নয়।

যক্ষ্মারোগে আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক লক্ষণের কথা কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ বলেছেন। এটা হচ্ছে—একটি বিষয়ের প্রতি ঝোঁক থেকে সহসা আরেকটি বিষয়ের প্রতি ঝোঁক বা মেজাজের পরিবর্তন। রোগীর হয়ত ফুটবল খেলার দিকে বিশেষ আকর্ষণ ছিল, হঠাৎ সে সব ছেড়ে দিয়ে সে বসল একেবারে বইএর পোকা হয়ে। একটি মেয়ে—সহসা হয়ত অতিরিক্ত রকম উচ্ছ্বাস-প্রবণ হয়ে উঠল। একটি পরিচারিকা—সামান্য সামান্য গৃহ-কাজ নিয়ে বিশ্রী রকম খিট্‌খিটে হয়ে উঠল। কারুর বা ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা বেশী রকম বেড়ে পড়লো। জনৈক বিশেষজ্ঞ এই মন্তব্য করেছেন যে অতিরিক্ত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার ফলেই এই অসুখের অনেক ক্ষেত্রে হয় আবির্ভাব, এটা সচরাচরই ভাবা হয়ে থাকে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, আসলে রোগী অতিরিক্ত কামুক হয়ে উঠবার আগেই যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সব ক্ষেত্রে

যক্ষ্মা-বিষের ক্রিয়াই তাকে মাত্রা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হবার পথে চালনা করেছে!

দেহ যক্ষ্মাক্রান্ত হলে প্রথমেই যে সব ক'টি লক্ষণ একসঙ্গে আবির্ভূত হবে তার কোনও মানে নাই এবং সব ক'টি লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করবার চেষ্টা না করা কিছুমাত্র নিরাপদ এবং বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেকের এটা বিশেষভাবে সমঝে রাখা উচিত যে, বুকের ক্ষত অধিক দূর অগ্রসর হলে এ রোগ থেকে সারবার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়ে পড়া আশ্চর্য নয়। এতগুলির ভিতর যে কোনও একটি লক্ষণও যদি আপনার দেহে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, অবিলম্বে আপনাকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। কোথাও কিছু নাই, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, বেশ স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ একদিন খক করে একটা কাসি মতন হল—মাটিতে ফেললেন, খানিকটা রক্ত! আপনার মাসিমা বললেন—ও কিছু নয়, দাঁত থেকে বেরিয়েছে ; তাঁরও একদিন ওই রকম বেরিয়েছিল। আপনার পিসিমা বললেন—কিছু নয়, কিছু নয়, গলাটা একটু চিরে বেরিয়েছে ; ওই রকমটি তাঁরও একদিন হয়েছিল।

আপনার মাসিমা বা পিসিমা বা মেসোমশাই বা পিসেমশাই আপনাকে পিঠ চাপড়ে অনেক কিছু অভয় দিতে পারেন, এবং আপনিও খুশি মনে আপনার কাজে লেগে যেতে পারেন, কিন্তু এইখানেই হল আপনার মারাত্মক ভুল এবং অসুখকে করে দিলেন প্রচুর সুবিধা।

ব্যাধির সামান্য চিহ্নও প্রকাশ পাওয়া মাত্র উচিত হচ্ছে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে বুকটিকে ভাল করে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা। রক্ত হয়ত আপনার একটুও না উঠতে পারে ; শুধুই হয়ত একটা দীর্ঘদিনকার কাসির উৎপাতে কষ্ট পেতে হয় আপনার। অথবা আর কিছুই নাই, শুধু বিকেলের দিকে কেমন একটু জ্বর-জ্বর লাগে ; আর সেই জ্বরটুকুর

তুলনায় নাড়ির বেগটা যেন অত্যন্ত বেশী। এ সবের যে উপদ্রবই আসুক না কেন আপনাকে সাবধান হতে হবে। আদৌ কোনও লক্ষণ প্রকাশ না পেতেই যদি আপনার পক্ষে সাবধান হওয়া সম্ভব হত, তবে বোধ হয় আরও ভাল হত! বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এক সঙ্গে একাধিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে: জ্বর, কাসি, রক্তহীনতা (অথবা বিবর্ণতা—যা নাকি "এনিমিয়া" নয়, এবং যা নাকি যক্ষ্মাবিষের ক্রিয়ার ফলেই হয়ে থাকে) আর বুকে একটু বেদনা। অথবা জ্বর, ওজনে কমে যাওয়া, রাত্তিরে ঘামা। অথবা জ্বর, থুতুর সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্তের ছিটে, পেটের গোলমাল, অল্পেতে হাঁপ ধরা···ইত্যাদি। মনে রাখবেন, শরীরের এ সব অবস্থান্তর ঘটবার পরে নিজের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে যত করবেন আপনি বিলম্ব, আপনার অলক্ষ্যে, অদৃশ্যভাবে—ততই ঘনিয়ে আসতে থাকবে আপনার কাল। শেষে আপনার অনুতাপের পরিসীমা থাকবে না—যখন আপনার চিকিৎসক আপনাকে নিষ্করুণভাবে শুনিয়ে দেবেন যে, এখন তাঁর প্রায় সাধ্যের অতীত হ'য়ে গিয়েছে এবং আগে এলে আপনাকে সুস্থ করে তোলা তাঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব ছিল না।

যাই হোক, এসব উপদ্রবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে বুদ্ধিমান রোগী নিজের সম্বন্ধে চট করে হুঁশিয়ার হয়ে উঠতে পারেনও, অনেক সময় তাঁর একটি সমস্যা এসে উপস্থিত হয়—ডাক্তার নিয়ে। কোন্ ডাক্তারের পরামর্শ নিলে ভাল হবে, কোন্ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকা নিরাপদ—এটা অধিকাংশ সময়ে অনেকের পক্ষেই হয়ে পড়ে চিন্তার বিষয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, কোনও রকম বাছ-বিচার না ক'রে যে কোনও ডাক্তারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবার কোনও মানেই হবে না। যাঁরা এই ব্যাধি নিয়ে বিশেষভাবে নাড়া-চাড়া না করছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে এই ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে কোনও ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই

নয়। ঠিক সেই ডাক্তারকেই খুঁজে বের করতে হবে—"যিনি টিউবারকুলোসিস্ সম্বন্ধে বোঝেন।" "যিনি টিউবারকিউলোসিস্ সম্বন্ধে বোঝেন" —এই কথাটাকে হালকাভাবে নেবার জিনিস নয়। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়ে সংখ্যাতীত টি. বি. রোগীর অক্লেশে বৈকুণ্ঠ লাভ যে কত হয়ে গেছে তা বলা যায় না। রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে এই সব চিকিৎসকেরা হয়ত একটি রোগীর সম্বন্ধে "নার্ভাস্ ডেবিলিটি" বা "হাইপোকণ্ড্রিয়া" থেকে শুরু ক'রে ম্যালেরিয়া বা যকৃতের বিকার অবধি সবই বলেন—কেবল "টিউবারকুলোসিস্" বাদে। একজন ডাক্তার একটি অতি খারাপ টাইফয়েড্ অথবা নিউমোনিয়ার রোগীকে চক্ষের নিমেষে সুস্থ করে দিয়েছেন, কিম্বা একজন সার্জেন দারুণ রকমের একটি "অ্যাপেন্ডিসাইটিস্" অথবা "গল্-স্টোনে"র উপর অস্ত্রোপচার করবার ব্যাপারে অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছেন—এ সব দ্বারা এ' বোঝা যায় না যে তিনি একটি টিউবারকিউলোসিস্ রোগীকেও কৃতকার্যতার সঙ্গে চিকিৎসা করবার ক্ষমতা রাখেন। হয়ত প্রকাণ্ড একজন এম. ডি. (সঙ্গে হয়ত আরও কতকগুলো অক্ষরও আছে)—যাঁর নাকি বাজারে ভীষণ নাম এবং উপার্জন ততোধিক ভীষণ—শোচনীয়ভাবে টিউবারকুলোসিস্ সম্বন্ধে অজ্ঞ হতে পারেন এবং কোনও টি. বি. রোগী গুরুতর রকম ভুল করবেন যদি নাকি ঐ ডাক্তারটি সম্বন্ধে নানান্ বড় বড় গল্প শুনে তিনি যান তাঁর কাছে নিজের ব্যবস্থা নিতে বা নিজের চিকিৎসার জন্যে। যেতে হবে শুধু তাঁরই কাছে—"যিনি টিউবারকুলোসিস্ সম্বন্ধে বোঝেন"—আর কারও কাছে নয়। এবং এ কথাও বলে রাখতে পারি যে এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা খুব অধিক নয় আমাদের দেশে এবং নিরর্থক বাজে ডাক্তারের কাছে গিয়ে অর্থে, দেহে, মনে সর্বস্বান্ত হবার আগে সেই সব বিশেষজ্ঞদের সন্ধান নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হবার চেষ্টা সর্বতোভাবে করতে হবে। কতজনে

যে কত ডাক্তারের নাম করবেন তার অন্ত নাই, কতজনে যে কত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বলবেন তারও অন্ত নাই। কিন্তু রোগীর এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনের মস্তিষ্ক রাখতে হবে স্থির। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বেছে নিতে হবে নিজেদের পথ—এই ব্যাধির সর্বপ্রকার গুরুত্ব এবং দায়িত্ব আগে থাকতে উত্তমরূপে উপলব্ধি ক'রে।

এমন অনেক চিকিৎসকের সংস্পর্শে রোগী হয়ত আসতে পারেন, যে চিকিৎসক রোগীকে তাঁর থুতুটা পরীক্ষা করিয়ে আনবার জন্যে বলবেন। থুতুটা পরীক্ষিত হয়ে আসবার পরে রিপোর্টে হয়ত দেখা গেল যে থুতুতে টিউবার্ক্‌ল ব্যাসিলাই অর্থাৎ যক্ষ্মা জীবাণু পাওয়া যায় নাই। অমনি হয়ত ডাক্তার বলে বসবেন—স্পিউটাম্ যখন নেগেটিভ্ তখন তিনি নিশ্চয় করে কিছুতেই বলতে পারেন না যে, এই ব্যাধি হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেলেও তাঁরা এই একটি মাত্র অজুহাত দেখিয়ে এই ব্যাধিকে অস্বীকার করতে প্রয়াস পান। কিন্তু উপযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ এই মত প্রকাশ করছেন, যে সব চিকিৎসক নাকি সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করবার আগে কেবলই থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণুর আবির্ভাবের অপেক্ষা রাখেন, তিনি ধরে রাখতে পারেন যে, তাহলে খুব কম যক্ষ্মারোগীরই সারবার সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ অনেক সময়ে রোগের প্রথম অবস্থায়, অনেক সময়ে বা রোগ যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে গেলেও থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু আবির্ভূত হয় না, অবশ্য যদিও অধিকাংশ সময়েই সাধারণতঃ হয়ে থাকে। কিন্তু থুতুতে যক্ষ্মা জীবাণু না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকাটা মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে এটাও দেখতে হবে যে আধুনিক নানাবিধ উন্নত উপায়ে (কনসেন্‌ট্রেশান্ মেথড্, কালচার, ইনঅকুলেশান মেথড্—ইত্যাদি) পুনঃ পুনঃ থুতুটা পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং জীবাণু-সংক্রমণ দেহে ঘটেছে কিনা সুসম্বদ্ধভাবে তার অন্যান্য পরীক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে

হয়েছে কিনা। যাদের থুতুতে জীবাণু পাওয়া যায় এবং যাদের পাওয়া যায় না—বিশেষজ্ঞেরা 'ওপ্‌ন্‌ কেস্‌' এবং 'ক্লোজড্‌ কেস্‌'—এই দুই ভাগে তাদের দু' দলকে ভাগ করেছেন।

রোগীর শেষ অবস্থা সম্বন্ধেও নানা কথা বলবার আছে। শেষ অবস্থায় রোগী কখনও বা এতদূর দুর্বল হয়ে পড়েন যে তখন তাঁর উত্থান শক্তি একেবারেই তিরোহিত হয়ে যায়। চেহারা হয়ে যায় একেবার কঙ্কালসার। দেহে শয্যাক্ষতাদির উৎপত্তি হয়ে তা আর সারে না। পা গুলি যায় ফুলে। ভীষণ ঘর্ম হয় শুরু, শরীরের উত্তাপেরও হয় অদ্ভুত সব পরিবর্তন। শ্বাস কষ্ট বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কখনও বা হঠাৎ খুব রক্ত বমি হতে থাকে। এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কোনও ক্রমেই তাঁকে আর রক্ষা করা সম্ভব হয় না। কিম্বা অনেক সময় আবার এর অনেকগুলিই হয়তো মোটেই না হ'তে পারে। বাইরের চেহারাও হয়তো অনেক সময় তেমন কিছু খারাপ না-ও হ'তে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যক্ষ্মারোগীর মৃত্যু এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটতে পারে যে চিকিৎসক পর্যন্ত বিব্রত বোধ করেন। যক্ষ্মার সঙ্গে নতুন কোনও কঠিন উপসর্গের সৃষ্টি হয়েও রোগীর মৃত্যু ঘট্‌তে পারে।

যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কোনও সন্দেহের কারণ দেখলেই কেবল "স্টেথোস্কোপে"র পরীক্ষার উপর নির্ভর না ক'রে বুকের একখানা "এক্স-রে" ফটো নেবার জন্যে রোগীকে নিশ্চয়ই বলবেন। বুকের অবস্থা যথাযথভাবে নির্ণয় করবার জন্যে "এক্স-রে" আজকাল অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু স্টেথোস্কোপের পরীক্ষায় বুকের সব দোষ, অথবা রোগ সারবার সময়ে ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থাগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে কিছুই ধরা পড়ে না; এক্স-রে দ্বারা সেগুলি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। সুতরাং রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশের জন্যে যোগ্য

চিকিৎসকের পক্ষে রোগীর এক্স-রে ফটোর অতীব প্রয়োজন। বাস্তবিক, এমনও দেখা গিয়েছে যে বাইরে কোনও রকম লক্ষণ বা শারীরিক বিকৃতি প্রকাশ পাবার দু তিন বছর আগে এক্স-রে দ্বারা বুকে টি. বি.র ক্ষত পরিষ্কারভাবে ধরা গেছে। কাজেই বিচক্ষণ রঞ্জনচিত্রবিদের দ্বারা বুকের এক্স-রে ফটো তুলতে রোগীর কিছুমাত্র অন্যথা করা উচিত নয়। সাধারণভাবে ফুসফুসের যে এক্স-রে ছবি তোলা হয় তাতে অসুখের সব অবস্থা যদি ধরা না পড়ে তবে "টমোগ্রাফি" বলে আরেক নিয়মে এই ছবি তোলা হয়। এতে এক সঙ্গে কয়েকখানা ছবি তুলতে হয় এবং ফুসফুসের বিভিন্ন ভাগে ও বিভিন্ন গভীরতার অসুখকে – বিশেষ ক'রে "ক্যাভিটি"কে খুঁজে বার করবার সুবিধা হয়।

"ব্রংকিয়েক্‌টেসিস্" নামক শ্বাসনালী সংক্রান্ত অসুখ, ফুসফুসের যক্ষ্মাক্রান্ত স্থানের বাইরেকার কতকগুলি অবস্থা, 'এম্‌পাইমা' নামক উপসর্গের বিস্তৃতি—ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্যে শ্বাসনালীর ভিতর তেল প্রবেশ করিয়ে আরেকভাবে এক্স-রে ছবি তোলা হয়ে থাকে—যাকে বলা হয় "ব্রংকোগ্রাফি"।

সাধারণ এক্স-রে পরীক্ষার ভেতরে বর্তমানে নানা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিচ্ছেন এবং উন্নততর উপায়ে এক্সরে-পরীক্ষা সম্ভবপর করে তুলতে সচেষ্ট হচ্ছেন।

রোগীর রক্ত পরীক্ষা করারও বিশেষ প্রয়োজন। "সেডিমেণ্টেশান রেট" নামক বিশেষ নিয়মে রক্ত পরীক্ষা দ্বারা রোগের গতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ করা যায়। রক্তের অন্যান্য প্রকার পরীক্ষাও হ'য়ে থাকে। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষমতার পরিমাপ করা হয় "ভাইটাল ক্যাপাসিটি" নামক পরীক্ষা দ্বারা। ফুস্‌ফুসের ভিতর যে সব টি. বি. গ্ল্যাণ্ড বিদীর্ণ হয়েছে বা শ্বাসনালীতে যদি টি. বি.র ক্ষত থেকে থাকে (ট্রাকিয়ো-

ব্রংকিয়াল টি. বি.) সেগুলি বা টি. বি. জনিত প্রদাহের ফলে কতকগুলি অবরোধের অবস্থা পরীক্ষা হয় "ব্রংকোস্কোপি" দ্বারা।

উপযুক্ত অর্থব্যয় করে বাড়ীতে ডাক্তার দেখান এবং বাইরে এক্স রে, রক্ত পরীক্ষা, থুতু পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা রোগীর পক্ষে যদি সম্ভব না হয় তবে কোনও যক্ষা-ডিস্পেন্সারিতে যাওয়াই রোগীর পক্ষে উচিত।

এখানে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই। অনেক ডাক্তার এবং অনেক রোগীর আত্মীয় স্বজনের ধারণা যে, এই রোগীর কাছে তার অসুস্থতার বিষয় গোপন রাখা উচিত। কিন্তু এর চেয়ে অন্যায় এবং নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না—এই রোগের বহুদূরব্যাপী ফলাফলের বিষয় বিবেচনা ক'রে। হতে পারে এই অসুখের বিভিন্ন দিকের সমস্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলা সব রকম রোগীর কাছে সঙ্গত নয়, বিশেষ ক'রে কোনও ভীতু রোগীর পক্ষে যখন অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাই বলে এই রোগ নিয়ে সর্বপ্রকার চাপা-চাপি অতিরিক্ত মাত্রায় অসঙ্গত। রোগীকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে তাঁর কি ব্যাধি হয়েছে, এই ব্যাধি থেকে সারতে হলে তাঁকে কি কি নিয়ম পালন করে চলতেই হবে, নিজের দোষে তিনি নিজের কি গুরুতর ক্ষতি করতে পারেন, এবং থুতুতে যখন যক্ষাজীবাণু রয়েছে—তাঁর থেকে যাতে অপর কারুর এই ব্যাধি না হয় সে জন্যে তিনি নিজে কি কি সতর্কতা অব-লম্বন করতে বাধ্য। কোনও রকম লুকোচুরি না ক'রে মোটের উপর তাঁর ব্যাধির প্রকৃতি এবং তাঁর সর্বপ্রকার দায়িত্ব তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কোনও প্রকার রূঢ়তা যেন রোগীর প্রতি প্রকাশ না পায়। তাঁকে উৎসাহ দিতে হবে এবং এই কথা দৃঢ়ভাবে বলতে হবে যে তিনি যদি সততা এবং ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা-বিষয়ক সমস্ত নিয়ম পালন করে চলেন তবে তিনি নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবেন। নিজের অসুখের

কথা জেনে প্রথমটা রোগী হয়ত একটা কঠিন আঘাত পাবেন, কিন্তু বুদ্ধিমান এবং বিবেচক রোগী ধীরে ধীরে তা উঠতে পারবেন সামলে। মনে রাখা উচিত, এ রোগে অনেকটা রোগী নিজেই নিজের চিকিৎসক এবং তাঁর নিজের উপর নিজের ভালমন্দ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। অবশ্য সর্ববিষয়ে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে রোগীকে সর্বদাই নিরুপায় হয়ে পড়তে হয়; এবং এ কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবার উপায় নাই যে চিকিৎসা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্যে রোগীর নিজের মনের জোরের সঙ্গে অপর সবার পরিপূর্ণ সহযোগিতা যুক্ত হওয়াটাও নিতান্ত আবশ্যক।

আর, রোগীর নিজেরও কোনও রকম লুকোচুরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় কোনও মতেই। আত্ম-প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি তাঁর ভিতরে তিলমাত্রও থাকা উচিত নয়। শরীর যখন সুস্পষ্টরূপে খারাপ হতে শুরু করেছে তখন "কিছু নয়" বলে নিজেরও উড়িয়ে দেওয়া নয় বা কোনও অনুপযুক্ত চিকিৎসকেরও এড়িয়ে-যাওয়া ধরনের জবাবের প্রশ্রয় দেওয়া নয় বা থুতুর সঙ্গে রক্তের ছিট দেখা দিলে মাসিমা বা পিসিমার কথা অনুযায়ী তাকে দাঁতের অথবা গলার বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করা নয়—দাঁড়াতে হবে নিষ্ঠুর সত্যের একেবারে মুখোমুখি, সাহসে বুক বেঁধে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক নানা উপায়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা ক'রে যখন টি. বি. বলে মত প্রকাশ করবেন তখন চিকিৎসকের প্রতি অতিমাত্রার বিরূপ হয়ে উঠে তাঁর মুণ্ডপাত করা অথবা তাঁর বিদ্যা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য মনে মনে প্রকাশ করা নয়—দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে নিজেকে ব্যাধিগ্রস্ত বলে এবং অবলম্বন করতে হবে নিজেকে সুস্থ করে তুলবার যথাযথ উপায়। রোগী যেন এমন ধারণা কদাচ মনে পোষন না করেন যে টি. বি. রোগটা কেবল অপর লোকেদেরই হয় এবং তাঁর নিজের দেহ এই ব্যাধিগ্রস্ত হবে এমন হতেই পারে না কিছুতেই।

এবারে এই ব্যাধির চিকিৎসার বিষয় কিছু বলব। এই ব্যাধির চিকিৎসার সর্বপ্রধান অঙ্গ হচ্ছে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম। যক্ষ্মাবিদ চিকিৎসক বলছেন যে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় অসুস্থ অঙ্গের পরিপূর্ণ বিশ্রামকে দিতে হবে সকলের উপরে স্থান। এই "বিশ্রাম" কথাটির অর্থ যে কতখানি কড়াভাবে গ্রহণ করতে হবে, তা বিশেষভাবে বুঝিয়ে না বললে, হয়ত অনেকে কল্পনাই করতে পারবেন না। সর্বসাধারণের কথা ছেড়ে দিই—ডাক্তারদের ভিতরেও অনেকেই জানেন না যে একজন টি. বি. রোগীর পক্ষে এর গুরুত্ব কতখানি হওয়া উচিত। রোগীর কাছে এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ তিনিই বলতে পারেন, যিনি নাকি টিউবারকিউলোসিস্ সম্বন্ধে সত্যিই বোঝেন। প্রকৃতপক্ষে একজন টি. বি. রোগীর অধিকাংশ উপসর্গের প্রাবল্য কমিয়ে আনবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম—দেহের ও মনের। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত অবধি সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রিই রোগীকে বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে। যদি প্রত্যেকটি উপসর্গ প্রবল হয় এবং ফুসফুসে ব্যাধির বিস্তৃতি যদি বেশী হয়, তবে বিছানার উপর উঠে বসা পর্যন্ত নিষেধ। বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রামকে ইংরাজীতে বলা হয়েছে "এবসলিউট্ রেস্ট ইন বেড"। একজন রোগীকে যতদিন পর্যন্ত অ্যাব্সলিউট রেস্ট নিতে হবে, ততদিন তার খাবার জন্যে উঠে বসা, উঠে বসে হাত মুখ ধোয়া, নিজে স্পঞ্জ করা বা স্নান করতে বাথরুমে যাওয়া, উঠে মলত্যাগ করতে যাওয়া, লেখা, পড়া, বেশী কথা বলা (স্বরভঙ্গের অবস্থা থাকলে কথা বলা একেবারেই বারণ), নিজের বিছানা নিজে পাল্টান, দাঁড়িয়ে থাকা, কোনও রকম ক্রীড়া—ইত্যাদি ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ। তবে উপসর্গগুলি যদি প্রবল না থাকে এবং ফুসফুস্ যদি বেশী রকম ব্যাধিগ্রস্ত না হয় তবে চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী (বারম্বার অনুযোগ এবং অনুরোধ করে তাঁর অনিচ্ছাকৃত সম্মতি আদায় করে নয়)—দু পাঁচ

মিনিটের জন্তে উঠে বসে থাওয়া, অথবা এক এক সময়ে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিটের জন্তে হালকা কোনও বই বা খবরের কাগজখানা পড়া, বা দু-চার পা হেঁটে মলমূত্রাদি ত্যাগ করতে যাওয়া, বিছানায় ব'সে চুলটা একটু আঁচড়ে মুখখানাকে একটু মিষ্টি করা···ইত্যাদি অতি হালকা এবং অতি সংক্ষিপ্ত দু'চারটি কাজ দিনের ভিতরে অতি সামান্য বারের জন্তে করা যেতে পারে। (রোগীর এই অবস্থায় লেখা বা পড়া সম্বন্ধে কোনও স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ যে নিয়মের নির্দেশ দিয়েছেন এখানে তার উল্লেখ করছি : রোগী কিছুক্ষণ ধরে পড়লেন বা লিখলেন (১৫ মিনিট) তার পরেই ঠিক ততটুকু সময় একেবারে বিশ্রাম করে নিলেন ; পুনরায় ঐ রকম কিছুটা সময় পড়লেন বা লিখলেন, এবং পুনরায় তারপরেই ওরি সমান সময় একেবারে সব রেখে চুপচাপ পূর্ণ বিশ্রাম ক'রে নিলেন—এই ভাবে এটা চালাতে হবে।) বিশ্রাম যে কতকাল যাবৎ নিতে হবে তার কোনই বাঁধাধরা নিয়ম নাই—রোগীর বুকের অবস্থার উপরেই সব কিছু করবে নির্ভর। খুব অল্প দিন নেবারও প্রয়োজন হতে পারে, আবার খুব দীর্ঘ দিন নেবারও প্রয়োজন হতে পারে। বিশ্রামের অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে কেমন ক'রে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং কে কতখানি শ্রমের উপযুক্ত হবে তার আলোচনা যথাস্থানে থাকবে।

এই বিশ্রাম কথাটার অর্থ ঠিকমতন বুঝতে না পেরে কত অসংখ্য রোগী যে নিজের সর্বনাশ করে তা বলবার নয়। আর, সব সময়েই যে রোগীরই দোষ তাও নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে ডাক্তাররাও (যে সব ডাক্তার জানেনই না তাঁদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, যাঁরা জানেন তাঁরাও) রোগীকে এ কথা একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেন না যে বিশ্রামের অবহেলা করলে আক্রান্ত স্থানের চারিদিক ঘিরে দেহের কোষ-সৈনিকের দল যে গণ্ডী রচনা করবার বিরাট চেষ্টায় নিযুক্ত রয়েছে সেই গণ্ডীগুলি কেমন ক'রে ভেঙ্গে

যাবে, রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে ব্যাধির বিষ কেমন করে দেহে বেশী করে ছড়িয়ে পড়বে এবং "সম্পূর্ণ বিশ্রাম" বস্তুটা ঠিক কি। একজন অ্যামেরিকান যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ কোনও পত্রিকায় তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে তাঁর দুজন রোগীর যে কৌতুকাবহ বিবরণ দিয়েছেন, তা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি :

"রোগীকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, কাজ-কর্ম এখন সে করতে পারবে না, আর ছুটি নিয়ে বাড়ীতে থেকে তার বিশ্রাম নিতে হবে। সে ডাক্তারের উপদেশ মত কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে তার বিবেচনায় বিশ্রাম পালন করতে থাকল। খাওয়াটা অবিশ্যি বিছানাতেই সেরে সে তার সকালের শয্যা ছাড়ত বেলা এগারটার সময়ে, তারপরে বেরিয়ে পড়ত শহরের রাস্তায় খানিক ঘুরবার জন্যে। প্রথমে ঢুকল হয়ত এক নাপিতের দোকানে, সেখানে বসে ঘণ্টাখানেক আড্ডা মারল, আবার আরেক জায়গায় ঢুকে আরও খানিকটা সময় হয়ত কাটাল। তারপর বাড়ীতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে আবার বিকেলে এক বন্ধুকে নিয়ে মোটরগাড়ী করে হাওয়া খেতে বেরুল অথবা এক প্রতিবেশীর সঙ্গে খানিক খোসগল্প করে এল—সারাটা সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

"আর একটি রোগী—খাওয়ার জন্যে উপরতলা থেকে নীচতলায় আসত দিনে তিনবার ক'রে। দাড়ি কামাবার জন্যে এবং অন্যান্য নানান প্রয়োজনে বাথরুমে করত কয়েকবার যাতায়াত। তা ছাড়া একটা কিছু ভুলে ফেলে রেখে এল—সেটা আনবার জন্যে আরও বারকতক করত উপর-নীচের ওঠা-নামা। এ সব জেনে একদিন আমি তাকে বললাম একটা 'পেডোমিটার' (অনেকটা ঘড়ির মত দেখতে এক রকম যন্ত্র—পদক্ষেপের সংখ্যা যাতে ধরা পড়ে—যা থেকে একজন লোক কতটা পথ অতিক্রম করল তা মাপা যায়) —ব্যবহার করতে—দেখবার জন্যে যে সে দৈনিক কতটুকু করে হাঁটছে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে সে দৈনিক ঠিক দেড় মাইল ক'রে হাঁটছে!"

রোগটা যখন টি. বি.—

এই চিকিৎসক তাঁর একটি রোগিণীর কথা বলেছেন যে, সেই মেয়েটি সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার এবং কৃচ্ছ্রসাধন করে পুরো দুটি বছর কড়া বিশ্রামে থেকে কেমন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বামী এবং সন্তানের সঙ্গে আবার মিলিত হয়েছে এবং সেই মেয়েটিরই আর দুটি বন্ধু, যারা নাকি তাদের ডাক্তারকে এইভাবে বলত : "ডাক্তার বাবু, আমাকে একটি দিনের জন্যে কি চায়ের পার্টিতে যেতে দেবেন না?" অথবা, "শুধু একটি দিনের জন্যে একটু মোটরে চড়ে আসতে দেবেন না?" অথবা, "শুধু একটি বারের জন্যে এই ফিল্মটি দেখে আসতে দেবেন না?··· আমি ভারি সর্তক থাকব এবং হৈ-চৈ একটুও করব না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি মনে করেন না যে, এই রকম একটু আধটু পরিবর্তন দ্বারা আমার কোনও ক্ষতি না হয়ে বরং উপকারই হবে?"—এই সব ছোট-খাট আমোদের প্রলোভন ত্যাগ না করতে পেরে ভুল পথে শরীরের এমন ক্ষতি করেছে যে শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে ।

ডাক্তারটি তাঁর প্রবন্ধের শেষে আক্ষেপ করে বলছেন : (আমার অনুবাদ): "বিশ্রাম সম্বন্ধে কড়াকড়ি খানিকটা কমানর অবস্থাতে রোগীদের বেশ ভালই থাকতে দেখা গিয়েছে। ওজন বাড়ে, জ্বর কমে, অন্যান্য কষ্টদায়ক উপসর্গগুলিও কমে; কিন্তু বুকের ক্ষত খুব অল্পই কমে এবং একটু একটু করে বিশ্রামের অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষত সহসা একদিন ভীষণ মূর্তি ধারণ করে রোগীদের সর্বনাশ ঘটায়। আমরা এসব ঘটনা জানি। অত্যন্ত সাময়িক একটু উন্নতির পরে কতজনের ব্যাধিই যে প্রবলভাবে বেড়ে পড়ে! এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ঘটে শুধু বিশ্রামের ত্রুটির ফলেই।"

আর, রোগী যেন বিশ্রাম বলতে শুধু শরীরের বিশ্রামই না বোঝেন; সঙ্গে সঙ্গে মনকেও দিতে হবে বিশ্রাম। এবং এই মনকে বিশ্রাম দেওয়াই হচ্ছে আরও ঢের শক্ত ব্যাপার। কিন্তু যে করেই হোক রোগী:ক ক্রমাগত

চেষ্টা করে মনের বিশ্রাম অভ্যাস করতেই হবে। শরীরের বিশ্রাম তখনই যথাযথরূপ হয় যখন নাকি মনও বিশ্রাম লাভ করছে। শরীরকে বিছানার উপরে জোর ক'রে কোনও মতে লম্বা ক'রে রেখে নিজের ব্যাধি নিয়ে, সাংসারিক আরও দশটি বিষয় নিয়ে, নিজের জীবন নিয়ে, কোনও কঠিন বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে—কেবলই যদি মনের ভিতর তোলাপাড়া করতে থাকা যায়, সহস্র দুশ্চিন্তার ঘোড়ায় চড়িয়ে মনকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকা যায় দিল্লী আর লাহোর—তাহলে স্মরণ রাখা আবশ্যক, নিজের আরোগ্যের মূলে যথেষ্ট কুঠারাঘাত হবে। কোনও ভাবনা নয়, কোনও চিন্তা নয়, কোনও উত্তেজনা নয়—শরীর এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে ঢিল করে দিয়ে থাকতে হবে বিছানায় পড়ে। বিশ্রাম নিতে হবে—একজন ডাক্তারের ভাষায়—যুদ্ধ-ক্ষেত্রে একজন মৃত সৈনিকের মত পড়ে থেকে। এই ডাক্তার বলেছেন যে বিশ্রাম নেবার সময়ে নিজের সম্বন্ধে কোনভাবেই সচেতন থাকতে পারবে না এবং নিজের শরীর-মনকে এত "ছেড়ে দিয়ে" পড়ে থাকতে হবে যে কেউ যদি তোমার খাটের ফিতে কেটে দেয় তবে মেঝের উপরে সটাং চিতপটাং। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যও সব সময় যেন বজায় থাকে—রোগী যে পাশ ফিরে বা যেভাবে শোন না কেন। বিশ্রাম নেওয়াটা প্রথমে কষ্টকর হলেও অভ্যাসের দ্বারা সবই আয়ত্ব হ'য়ে যাবে। বিশ্রাম দেবার জন্যে এবং অসুস্থ দিকের গয়েরটা বিপরীত দিককার ফুসফুসে ঢুকে সেটিকেও খারাপ ক'রে যাতে না দেয় এইজন্যে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে বুকের যে দিকটায় অসুখ অথবা বেশী অসুখ, সেই পাশটা চেপে সেই দিক ফিরেই রোগীর যথাসম্ভব শোয়া উচিত। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ রোগীর ইচ্ছানুযায়ী পার্শ্ব পরিবর্তনেরও বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁরা বিবেচনা করেন যে পার্শ্ব পরিবর্তনের ফলে বুকের ভেতর থেকে গয়েরটা ভালোভাবে উঠে

আসবার সুযোগ পায় এবং তাতে রোগীর অবস্থা নিরাপদ থাকে। রোগী যথাসম্ভব চিত হ'য়ে শুয়ে থাকাও অভ্যাস করতে পারেন। বিশ্রামের ফলে রোগীর হজম শক্তি ক'মে যায় এটা একেবারে ভুল ধারণা।

অনেকেই ভুল ক'রে মনে করেন যে, জ্বর ইত্যাদির অবস্থাতেও রোগীকে নদীর ধারে বা পার্কে-টার্কে একটু বেড়াতে দেওয়া, একটু তাস-পাশা খেলতে দেওয়া বা একটু হাসি-আমোদ-প্রমোদ করতে দেওয়া বা কোনও পার্টিতে যোগদান করতে দেওয়া চলতে পারে। কারণ তাতে রোগী বেশ প্রফুল্ল থাকে, এবং অসুখের কথা খানিকটা ভুলে থাকে, এবং তাতে তার সুস্থ হবার পক্ষে সুবিধাই হয়। হায়! অসুখকে রোগী ভুললেই যদি অসুখ রোগীকে ভুলতো! যাক্, কথা আর না বাড়িয়ে এইটুকুই সোজা বলে দেওয়া যেতে পারে যে উক্ত সব কাজ পরিণামে রোগীর এবং তাঁর লোকেদের আফশোষের এমন কারণ হবে যে তা বলা যায় না। অথবা নিজেদের অজ্ঞতার জন্যে তাঁরা হয়ত কোনও দিনই বুঝতে পারবেন না যে ঐ সবই রোগীর সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করেছিল।

রোগীকে যখন চিকিৎসক সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তখন বাইরের লোক যাঁরা তাঁকে দেখতে আসবেন বা তাঁর কাছে বেড়াতে আসবেন তাঁদেরও কর্তব্য যখন তখন এসে তাঁকে বেশী না বকানো বা অন্য কোনও ভাবে উত্যক্ত না করা। রোগীর সঙ্গে বসে কথা-বার্তা বলবার দৈর্ঘ্যটাকেও এ সময় কমান ভাল।

বিশ্রাম ছাড়া এই ব্যাধির চিকিৎসার আর একটি প্রধান অঙ্গ—উত্তম খাদ্য। পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব এই ব্যাধির অন্যতম প্রধান কারণ এবং বিভিন্ন রকমের পুষ্টিকর এবং উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা এই ব্যাধির চিকিৎসায় অপরিহার্য। এখন দেখা যাক ক্ষয়রোগগ্রস্তদের খাদ্য-বিধান সম্বন্ধে কি বলা যেতে পারে।

এই রোগীর পক্ষে সাধারণভাবে খাওয়ার দ্রব্য সম্বন্ধে খুব বেশী বাছবিচার কিছু করবার দরকার হয় না, অথবা বিশেষ কোনও কারণ না ঘটলে ভয়ানক রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিনিসের দোষ-গুণের বিচার করে খেতে হয় না। সাধারণ সুস্থ মানুষ যা খায় একজন টি. বি. রোগী সাধারণ অবস্থায় সে সবই খেতে পারেন। সাগু বার্লি খেয়ে থাকতে হবে সে রকমও কিছু নয়, অথবা কলা খাব তো মূলো খাবনা, মূলো খাব তো সজনে খাবনা—সে রকমও কিছু নয়।

টি. বি. রোগীর পক্ষে দুধটা মহা দরকারী জিনিস—প্রতিবারের আহারের সঙ্গে বেশ খানিকটা করে দুধ খাওয়া দরকার। অবস্থায় কুলোলে এক একবারে এক পোয়া, দেড় পোয়া করে একজন টি. বি. রোগী দৈনিক একসের দেড়সের দুধ খেতে চেষ্টা করতে পারেন। মাছ, মাংস, ডাল, সব রকম তরিতরকারিই রোগীর ভালো করে খেতে হবে। ডিম, মাখন খাওয়া দরকার। খাওয়ার উপকরণের সঙ্গে নানা রকম ফলমূলও থাকবে। ভাত, রুটি, পরেটা, লুচি—সবই চলবে। আমাদের শরীরের বৃদ্ধি, পুষ্টি, তাপ, শক্তি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্যে এবং নানাবিধ ব্যাধির হাত থেকে শরীরকে রক্ষার জন্যে সব রকম উপকরণে মিশ্রিত খাদ্যের প্রয়োজন। কোনটিরই অভাবও ভাল নয়, অতি আধিক্যও ভাল নয়। অভাব এবং আধিক্য উভয়ের দ্বারাই দেহের ক্ষতিবিধান হয়ে থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের শারীরিক অবস্থা, প্রয়োজন, রুচি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে খাদ্য তালিকা নির্ণয় করতে হয়। প্রোটিন বা আমিষপ্রধান খাদ্য, ফ্যাট বা চর্বিপ্রধান খাদ্য, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাপ্রধান খাদ্য—সবই উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। মাংস, ডিম, দুধ, মাছ, ডাল, সীম, কড়াই, ছানা—ইত্যাদি হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। দুধ, ঘি, মাখন, তেল, ওটমিল (যইএর ছাতু), সোয়াবিন ইত্যাদি খাদ্য হচ্ছে স্নেহ বা

চর্বি (ফ্যাট) জাতীয়। মাছ ও মাংসেও চর্বি আছে—ডিমেও। আর কার্বোহাইড্রেট সংগৃহীত হতে পারে এই সব খাদ্য থেকে : চাউল, আটা, দুধ, আলু, ফল, ডাল. তরিতরকারি, চিনি—ইত্যাদি। খাবার দ্রব্যের ভিতর "ভিটামিন" বলে একটি জিনিস আছে যাকে এ, বি, সি, ডি, ই, এই রকম করে অনেকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই ভিটামিনই হচ্ছে খাদ্য-প্রাণ। ভিটামিন-হীন খাদ্য দেহের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নানাবিধ রোগের আক্রমণ থেকে এক এক রকমের ভিটামিন এক একভাবে দেহকে রক্ষা করে থাকে। এক এক রকম ভিটামিনের অভাবে দেহ হয়ে পড়ে এক এক রকমের রোগ-প্রবণ। ভিটামিন "এ" পাওয়া যায় ভেড়ার মাংস এবং যকৃৎ, কয়েক রকম মাছ, মাখন, ডিম, লিভারের তেল, দুধ, কয়েক রকম শাক সব্জী, তরিতরকারি, বা ডাল, সর, টমাটো, কয়েক রকম ফল,—ইত্যাদির ভিতরে। ভিটামিন "বি" পাওয়া যায় চাউল, গম, ভূট্টা, ডিমের হল্‌দে অংশ, চিঁড়া, সুরাবীজ (ঈস্‌ট্‌) আলু, গাজর, কয়েক রকম রসাল ফল, তাজা তরিতরকারি, শস্যের খোলস—ইত্যাদিতে। মিলে পালিশ করা ধব্‌ধবে চাউল, ধব্‌ধবে আটা—ইত্যাদির ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। ধব্‌ধবে চিনি সম্বন্ধেও ওই কথা। কাজেই ঢেঁকিছাঁটা চাউল, জাঁতায় ভাঙ্গা আটা, গুড় বা লাল চিনি ইত্যাদি অনেক বেশী উপকারী। ভিটামিন "সি" পাওয়া যায় এই সবে : টাট্‌কা তরিতরকারি, লেবু, কমলা, টম্যাটো ইত্যাদি কাঁচা ফল এবং তাদের রসে। আর ডিম, মাখন, দুধ, চর্বি, মেটে, মাছের তেল ইত্যাদিতে ভিটামিন "ডি" পাওয়া যায়। সমস্ত রকম শস্যের অঙ্কুরোদ্গত অংশে, বীজে, ডিমে ভিটামিন "ই" পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও তরল বা বড়ি জাতীয় ওষুধ আকারেও "ভিটামিন" কিনতে পাওয়া যায়। এই সব ওষুধ অত্যধিক সেবনে শরীরে বিষ-ক্রিয়াও ঘটতে দেখা গিয়েছে।

কাজেই কেবল চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ীই এগুলি ব্যবহার করা উচিত।

শরীরের পক্ষে লবণ (সল্ট) জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। টাটকা ফলমূল, নানা রকম উদ্ভিজ্জ-আহার, ডাল ইত্যাদি থেকে শরীর প্রয়োজন মত লবণ সংগ্রহ করতে পারে। টাটকা অথবা শুষ্ক ফল, ডিম, দুধ ইত্যাদিতে ধাতব বস্তু (মিনারেল্স্) পাওয়া যায় এবং এ-ও শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

রোগীর খাবারের প্রত্যেকটি জিনিস টাটকা হওয়ার দরকার। মাছ, মাংস, ডিম,—এগুলি যদি ভালরকম টাটকা না পাওয়া যায় তবে একদম ব্যবহার না করাই ভালো। দুধটাও যেন অবশ্য খাঁটি হয়। রোগীর রান্নায় খুব বেশী মসলাপাতি থাকা মোটেই ঠিক নয়, কারণ এতে অনেক সময় জিনিসের গুণও নষ্ট হয় এবং রোগীর পরিপাকশক্তি দুর্বল থাকলে তার পক্ষে খাদ্য-দ্রব্যটা গুরুপাক হয়ে উঠে। কম মশলায় ওরি ভিতর যথাসম্ভব সুস্বাদু করে রোগীর জন্যে বেশ হাল্কা রান্না করতে হবে। প্রতিদিনকার খাওয়া একেবারে একঘেয়ে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর মুখে অরুচির ভাব না থাকে এবং আহার্য গ্রহণকালে তার মন বিমুখ না হয়ে ওঠে। খাদ্যদ্রব্যের উপকরণ অদল-বদল করা এই জন্যে দরকার যে তাতে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেল ইত্যাদি রোগ গ্রহণ করবার সুযোগ পান। অতিরিক্ত জল দিয়ে কোনও কিছু রান্না না করাই ভাল। শুধু সিদ্ধ করবার জন্যে ঠিক যেটুকু দরকার তাই ব্যবহার করা উচিত। যে জলে কোনও খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়েছে অনেক সময় সেই জলটা ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু এই জলে খাদ্যদ্রব্যের অনেক মূল্যবান অংশ বেরিয়ে যায়। অনেক চিকিৎসকের মতে যক্ষ্মাগ্রস্তের পক্ষে জলীয় খাদ্য অপেক্ষা অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক খাদ্যই বেশী উপকারী।

অবিশ্যি তাই ব'লে আলাদাভাবে যক্ষ্মারোগীর পর্যাপ্ত পরিমাণে দৈনিক জল পানের পক্ষে কোনও বাধা নাই, বরং জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির অবস্থায় এতে রোগীর উপকৃত হবারই কথা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছুদিনের জন্যে নুন একেবারেই না-দেওয়া খাদ্যদ্রব্য রোগীকে ব্যবহার করতে দিয়ে সুফল পাওয়া গেছে, কিন্তু যে সকল চিকিৎসক এ নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা বলছেন যে নুন-হীন আহার বুকের যক্ষ্মার চেয়ে শরীরের অপর কোনও কোনও অংশের যক্ষ্মাতেই অধিকতর সুফল উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। কোনও রকম ভাজা জিনিস মুখরোচক হওয়া ছাড়া তার অন্য কোনও গুণ নাই। ভাজা দ্রব্যাদির ব্যবহার, বিশেষ করে পেটের গণ্ডগোলের অবস্থায়, যথাসম্ভব কমানোই ভালো। রোগীর খাবার জিনিসের উপর মাছি, ধুলো, বালি যেন না পড়তে পারে।

আগেকার দিনে এই রোগীকে একেবারে পেট বোঝাই করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ওজনে কেবলই বাড়াতে হবে—এদিকেই ছিল চিকিৎসকের লক্ষ্য। ইংল্যাণ্ডে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার প্রবর্তনের প্রথম অবস্থাকার সেই "নরড্রাক সিস্টেম"-এর "ওভার ফিডিং"-এর হাওয়া আজকাল সম্পূর্ণরূপে অন্যভাবে বইতে শুরু করেছে। যক্ষ্মারোগীকে ঠেসে খাওয়ানর ব্যবস্থা আজকাল সব জায়গা থেকে উঠে গিয়েছে। রোগীকে ওজনের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, কিন্তু অতিরিক্ত মোটা হবার তাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলছেন যে যথাসম্ভব কম খেয়েই ধীরে ধীরে ওজনে বাড়বার চেষ্টা করা উচিত। আর, অতিরিক্ত ওজনে বাড়াটা বিঘ্নজনক। বস্তুতঃ শরীরে চর্বি জমবার ফলে নতুনতর বহু রকম উপসর্গ দ্বারা রোগীর বিড়ম্বিত হওয়া যথেষ্ট সম্ভব। দেহের স্বাভাবিক ওজন রোগীর যা হওয়া উচিত, তা থেকে সামান্য কয়েক পাউণ্ড বেশী থাকলেই যথেষ্ট। রোগী যেন মনে রাখেন যে, ওজনে

বাড়া মানেই রোগ সেরে যাওয়া নয়। এক পাউণ্ড ওজনে না বেড়ে অসুখ একেবারে ভাল হয়ে গিয়েছে, এবং ঝুড়ি ঝুড়ি ওজন বেড়েও অসুখ এক তিল কমেনি, এ রকম দৃষ্টান্ত বহু আছে। ওজনটা খুব কম থাকলে রোগী যদি উপযুক্ত আহার্য গ্রহণ করে ধীরে ধীরে শরীরকে পুষ্ট করতে পারেন, সেটা একটা ভাল লক্ষণ বলে ধরা হবে। কিন্তু রোগীর শরীরের ওজন যদি কিছুমাত্র না কমে থাকে এবং তাঁর ওজন যদি বেশ স্বাভাবিক থাকে, তা হ'লে বেশী রকম দুধ, ক্ষীর, ছানা, ডিম, মাখন খেয়ে ওজনে আর কিছুমাত্র বাড়বার চেষ্টা না করাই সর্বতোভাবে নিরাপদ। এই অবস্থায় সাধারণ হালকা খাবার খেয়ে এইটে শুধু বজায় রাখতে পারলেই হল। শরীরে অতিরিক্ত খানিক চর্বি জমিয়ে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদিকে শুধু ক্লিষ্টই করা হয়, এবং টি-বির চিকিৎসায় যা নাকি অত্যাবশ্যক—সেই বিশ্রাম গ্রহণের পক্ষেই ফুসফুস বিশেষ একটা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে পড়ে। শরীরের ক্ষয়ের অবস্থাতেই ওজনে বাড়বার চেষ্টা করতে হবে—নতুবা নয়। বুকের ক্ষত যদি ঠিকমতন সারতে থাকে তবে একটু কম ওজন নিয়ে খুব মাথা ঘামাবার কিছু নাই।

দুঃখের বিষয় বহু চিকিৎসকেরও এসব বিষয়ে নানা প্রকার ভ্রম ঘটে থাকে —যা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এ ছাড়া আর একটি দিক আছে, অতিরিক্ত খেয়ে খেয়ে অতিরিক্ত ওজনে বাড়াবার কু-চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক রোগী তাঁদের পেটের একেবারে এমন সর্বনাশ করে বসেন যার প্রতিকার নাকি শেষে বহু চেষ্টাতেও আর হতে চায়না। খাওয়াটাকে চালাতে হবে পেটের দিকে লক্ষ্য রেখে, যাতে কোনও ভাবেই পেটটা খারাপ না হয়। অধিকাংশ টি-বি রোগীর প্রায়ই পেটের গোলমাল লেগে থাকে এবং পেটটা ভাল রাখতে না পারলে শরীরের উন্নতি যথেষ্ট পিছিয়ে পড়ে। বিশেষ কোনও একটা জিনিস

খেয়ে পেটের গোলমাল হয় কি না সেটা খুব লক্ষ্য রাখা দরকার। লোভীর মতন ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি একেবারে অতিরিক্ত যেন রোগী না খান —আর সব কিছু বাদ দিয়ে—যদি নাকি লিভার, কিড্নী, শরীরাভ্যন্তরস্থ ইত্যাদি যন্ত্রকে সুস্থ রাখবার মতলব তাঁর থাকে। পরিমিত মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সহকারে পরিবেশিত খাদ্যের প্রতিই লক্ষ্য রাখতে হবে। রান্না করা জিনিস ছাড়া কিছুটা কাঁচা স্যালাড্, ফলের রস—ইত্যাদি রোগী যেন নিশ্চয়ই খান। কারুর কারুর দুধ খেলে পেটের গোলমাল হয়। কেউ কেউ বা দুধ মোটে ভালই বাসেন না। অথচ দুধের মতন উপকারী জিনিস আর নাই। ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস্, ক্লোরিন, সাল্ফার, আয়োডিন্, আয়ার্ন, পূর্বোল্লিখিত অপরাপর বস্তু ছাড়াও শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এই সমস্ত মিনারেলস্-ই দুধে রয়েছে এবং দুধ নিজেই সম্পূর্ণ খাদ্য। মাত্র পৌনে এক সের দুধে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে, আমরা প্রতিবারে যে পরিমাণে ফল, তরকারি সাধারণতঃ খেয়ে থাকি—সেই পরিমাণ ফল, তরকারি দিনের ভিতর বার কুড়িক খেলে পরে তবে ঐ পরিমাণ ক্যালসিয়াম আমরা তার ভিতর থেকে পেতে পারি। নিতান্ত পক্ষেই দুধ যদি সহ্য না হয় তবে দুধকে অন্য কোনও ভাবে তৈরি করে খেতে চেষ্টা করা যেতে পারে, যেমন ঘোল করে অথবা দই করে অথবা ছানা করে অথবা পুডিং করে। দরকার হলে হজমের সুবিধার জন্যে বেঞ্জার্স্ ফুড্ বা অ্যারারুট ইত্যাদি জাতীয় জিনিস দিয়ে দুধ তৈরি ক'রে ব্যবহার করা যেতে পারে। দুধের সঙ্গে একটু চুনের জল মিশিয়ে নিলেও সুবিধা হতে পারে। ফুটন্ত দুধে একটু লেবুর রস বা ল্যাক্টিক অ্যাসিড্ দিয়ে সূক্ষ্মভাবে দুধটাকে ফাটিয়ে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'লে সেই অবস্থাতেই পান করলে সহজে হজম করা যায়। আগে অত্যন্ত পেট ভরে খেয়ে খানিকটা দুধ খেলে পরে অনেক সময়

হজমের ব্যাঘাত হতে পারে—কারণ দুধ, আগেই বলেছি, নিজেই একটি সম্পূর্ণ খাদ্য—অন্য কিছুর সঙ্গে ভরা পেটে খাবার এ অপেক্ষা রাখে না। পেট ভাল না থাকলে একবারেই বেশী পরিমাণে দুধ খেতে চেষ্টা না ক'রে প্রথমে অল্প থেকে শুরু ক'রে ধীরে ধীরে দুধের পরিমাণ সহমত বাড়ান যেতে পারে। একটু চা বা কফি বা কোকোর গন্ধ করেও দুধ খাওয়া যেতে পারে—একঘেয়ে আস্বাদটাকে দূর করার জন্যে। স্যানাটোজেন বা ওভালটিন জাতীয় জিনিসও মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দুধ কি ভাবে খেলে সহজে হজম হতে পারে এবিষয়ে চিকিৎসকও কোনও নির্দেশ দিয়ে দিতে পারেন—কোনও ওষুধ দিয়ে দুধটা তৈরি করে নেওয়া সম্পর্কে—যেমন সোডা সাইট্রেট্ মেশানো বা পেপটোনাইজ করা দুধ। কাঁচা মুরগীর ডিম ভেঙ্গে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে খাওয়া বেশ ভাল। ডিমকে ভেজে না খেয়ে অল্প একটু সিদ্ধ করে বা "পোচ" করে বা দুধে মিশিয়ে খাওয়াই উচিত। তবে সামান্য পরিমাণও দুধ বা দুধের তৈরী কোনও জিনিস যদি কিছুতেই রোগী বরদাস্ত করতে না পারেন, তা হলে বাধ্য হয়েই এটা খাদ্য-তালিকা থেকে মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে পাঁচমিশালী অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা রোগীর শরীরের পুষ্টি বিধানের চেষ্টা করতে হবে বলেও চিকিৎসকেরা মত প্রকাশ করেছেন। সকালে বিকালে জলখাবার হিসাবে সুজির তৈরী কোনও জিনিস, লুচি, চিঁড়ে, সন্দেশ জাতীয় মিষ্টি, ছোলাভিজা, মাখন-টোস্ট্, পনীর, বিস্কুট, কেক্, পুডিং, পরিজ, জেলী-মাখানো রুটি, মধু—ইত্যাদি—রোগী রুচি, পেটের অবস্থা এবং পূর্বাভ্যাস অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন। সর্বপ্রকার শাক-সবজি, তরিতরকারি, ফলের ভিতর আম, পেঁপে, লিচু, আনারস, আপেল, কলা, বেল, আঙুর, কমলা, টম্যাটো, লেবু, বাদাম, তা ছাড়া শুকনোর ভিতরে খেজুর, কিসমিস, আখরোট্, ইত্যাদি রোগী প্রাণ ভরে আর্থিক অবস্থা অনুসারে খাবেন। নির্দোষ কোনও চাট্নি বা আচারও

এক আধটু খেলে ক্ষতি নাই। মারমাইট, মাংসের যুষ, "সালাড" ইত্যাদিও ভালো। রসুন, পেঁয়াজও খাওয়া চলবে। বস্তুতঃ যক্ষ্মারোগে রসুন এবং পেঁয়াজের বহু উপকারিতার উল্লেখ নানা গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে। পালংশাক, টম্যাটো, পেঁপে, কাঁচকলা, লাউডগা—প্রভৃতি পাঁচমিশালী শাক-তরকারির "যূষ" বা "সুপ"-ও চমৎকার জিনিস। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারীদেরও ঘাবড়ানোর কিছু নাই। নিরামিষ আহারও উৎকৃষ্ট হ'তে পারে যদি বিবেচনার সঙ্গে "মেনু" তৈরি করা যায়।

যক্ষ্মারোগীর দিনের ভিতরে ক'বার খাওয়া উচিত এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে। সুস্থ লোকেরা সাধারণতঃ দিনের মধ্যে চারবার খেয়ে থাকেন—সকালে, দুপুরে, বিকালে এবং রাত্রে। যক্ষ্মারোগীরাও ঠিক এই নিয়মেই খাওয়া চালাতে পারেন অথবা পেটের অবস্থা সুবিধাজনক না থাকলে বিকালে কিছু খেলেও অত্যন্ত হাল্‌কা ধরণের কিছু সামান্য পরিমাণে খেতে হবে। নিয়মিত সময়ের প্রধান আহারের ফাঁকে-ফাঁকে যখন-তখন মুখরোচক এটা-ওটা-সেটা খাওয়া অথবা খানিকটা ক'রে দুধ পান করা অনেক সময়েই হজমের গোলযোগ ঘটায় এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। এ অভ্যাস ছাড়া উচিত। মাংস এবং দুধ এক সঙ্গে খেয়ে অনেকের পেটের গোলমাল হতে পারে। এ অভ্যাসও ত্যাগ করা ভাল ব'লে অনেকে বলেন। এ রোগে জ্বরের সময় খেলেও জ্বর বৃদ্ধি পায় না এবং জ্বরের অবস্থাতে খাওয়াটা চালাতে পারা যায় নিরাপদেই। তবে রোগীর যখন জ্বর অত্যন্ত বেশী থাকে এবং রোগের বিষ অত্যন্ত সক্রিয় হয় তখন হয়ত তাকে হাল্‌কা এবং তরল খাদ্যের উপর রাখবার দরকার হতে পারে। রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুসারে কখনও কখনও তাকে অল্প পরিমাণে বার বার খাওয়ানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু অবস্থা এবং সময় বুঝে ব্যবস্থা চিকিৎসকের উপরেই এ ক্ষেত্রে নির্ভর করবে। কড্‌লিভার, শার্ক-লিভার

বা হালিবাট্-লিভার অয়েলও খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত—যদিও ওষুধ হিসাবে একে সাধারণতঃ ভাবা হয়ে থাকে। পেটের অবস্থা খারাপ থাকলে কড্‌লিভার অয়েল সহজে হজম হয় না। অতিরিক্ত জ্বরের অবস্থাতেও এ জিনিসটি শরীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী এসব দিকে লক্ষ্য রেখে তবে কড্‌লিভার অয়েল ব্যবহার করতে হবে। পেটের টি.বি থাকলে তার চিকিৎসা হিসাবে তিন বা চার আউন্স পরিমাণ কমলা বা টম্যাটোর রসের সঙ্গে আধ থেকে এক আউন্স পর্যন্ত কড্‌লিভার অয়েল মিশিয়ে ঠিক আহারের পরেই রোগীকে খেতে দেবার ব্যবস্থা আছে।

রোগীর পেটের গোলমাল নানা রকমের হতে পারে—অম্ল, বমি, পেটফাঁপা, ডাইরিয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, আমাশয়, পেটের বেদনা—ইত্যাদি। পেটের গোলমালের দীর্ঘকালস্থায়ী এবং জটিল অবস্থায় এই ব্যাধি অন্ত্রকে আক্রমণ করেছে কিনা এটা পরীক্ষা করবার দরকার। পেটের যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্যে অন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করবার প্রয়োজন হতে পারে।

ধীরে ধীরে বেশ করে চিবিয়ে রোগীকে খাবার খেতে হবে। দাঁতের যত্ন নেবার অত্যন্ত দরকার এবং দাঁতের বা মাড়ির পাইরিয়া জাতীয় কোনও প্রকার ব্যারাম থাকলে উপযুক্ত দন্ত-চিকিৎসককে দিয়ে তার সংশোধনের ব্যবস্থা অবশ্য করতে হবে। খাদ্যদ্রব্যের প্রতি বিতৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি অবস্থার প্রতি রোগীর সতর্ক থাকতে হবে এবং মন ও খাদ্যের নানা রকম পরিবর্তন দ্বারা এটা দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। রোগীর মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে তা একেবারে ত্যাগ করতে হবে। অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করা যেতে পারে কিনা—নিতান্তই অভ্যাসটা ত্যাগ করতে না পারলে—এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। পান সুপারিও ত্যাগ করাই ভালো; চা বা কফিও বেশী না খাওয়াই

ভালো। তামাক বা সিগারেট সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই সব চাইতে মঙ্গলজনক, নিতান্ত বিভ্রাটে পড়লে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে মাঝে মাঝে যৎসামান্য সেবন করা চলতে পারে—কাশির উৎপাত, ল্যারিংসের টি. বি. ইত্যাদি—না থাকলে অথবা বুকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো থাকলে। রাত্রে ঘুমের আগে ঘণ্টা তিনেক বা চারেকের মধ্যে চা, কফি, ইত্যাদি খাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। রাত্রে গরম কিছু খেতে ইচ্ছে হলে এক গ্লাস হরলিক্স্ বা গরম দুধ খাওয়াই সব চাইতে ভালো। এতে সুনিদ্রারও সুবিধা হয়। যাঁদের হাতে রোগীর খাদ্য পরিবেশনের ভার তাঁরা এটা লক্ষ্য রাখবেন যে বেশ যত্নের সঙ্গে এবং সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে যেন রোগীকে খাবার দেওয়া হয়। অযত্ন বা অবহেলার সঙ্গে কিংবা দৃষ্টির পক্ষে বিরক্তিকর এরকম ক'রে খাবার জিনিস দিলে রোগীর মন সে খাবারের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। শয্যাশায়ী রোগীকে যাঁরা খাইয়ে দেবেন তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে খাওয়ানোর সময়ে রোগীর বালিশ বা বিছানা কোনওভাবে যাতে নোংরা না হয়।

রমেন তেল-লঙ্কা ছাড়া ভাত খেতে পারে না—শ্যামলী কড়া আমকাসন্দি বা ঝাল-তেঁতুল ছাড়া ভাত খেতে পারে না—যদিও খাবার পর অম্বলের উদ্গার ওঠে বা পেট ভার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রমেন ও শ্যামলীকে বুঝতেই হবে যে তাদের আহারের এই অভ্যাস বদলাতেই হবে—প্রথম প্রথম দু' চার দিন কষ্ট হলেও কয়েকদিন চেষ্টার পরই দেখা যাবে মাখন দিয়ে আলু ভাতে বা বেগুন পোড়া, শুক্তা, শুধু ঘিয়ে অল্প ফোড়ন দিয়ে ডালনা—বেশী ছাড়া কম উপাদেয় নয়; এবং তার কাছে অম্বলের উদ্গার বা পেট ভার হয়ে থাকাটা ঘৃণিত হবারই যোগ্য। খাওয়া সম্বন্ধেও একটা শিক্ষার দরকার। যাঁরা রান্না করবেন তাঁদেরও অজ্ঞতাপূর্ণ অন্যায়

জিদ্‌গুলি দূর করতে হবে। তবে পূর্বেও বলা হয়েছে এবং এখনও বলা যেতে পারে যে অন্য কোনওভাবে অনিষ্টকর না হলে রোগী তাঁর সাধ অনুযায়ী এটা-ওটা-সেটা খেতে পারেন এবং তাঁর খাওয়া সম্বন্ধে অযথা নিষ্ঠুরতার কোনও প্রয়োজন নাই।

অনেক রোগী আবার একেবারেই কিছু খেতে চান না, এবং খাওয়া সম্বন্ধে তাঁদের অজস্র খুঁত্‌খুঁতি নানা ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করে। এ সব দোষ থেকেও রোগীকে মুক্ত হতে হবে।

ভালো খাওয়া ছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু—যা নাকি যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু বলতেও সাধারণ লোকের আছে নানারকম ভ্রমাত্মক ধারণা—যেমন নাকি আছে "বিশ্রাম" সম্বন্ধে। রোগীর জন্যে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বাতাসের ব্যবস্থা কেমন ক'রে করতে হবে আমি এখানে বলছি।

প্রথমতঃ রোগী যদি শহরবাসী হন এবং সে শহরটি যদি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন এবং ধূম-ধূলি-ধূসরিত হয় তবে সে শহরের বাইরে—যেখানে ধুলো-ধোঁয়া ইত্যাদির উৎপাত নাই—মফঃস্বলে এমন কোনও গ্রামের মত একটা জায়গায় গিয়ে বাস করতে চেষ্টা করা মন্দ নয়। তবে বেশী দূরে গেলে যদি নানা কারণে—বিশেষ করে চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়ার এবং চিকিৎসার দিক থেকে সুবিধাজনক না হয় তবে, সম্ভব হলে, শহরের যে অংশে ধুলো, ধোঁয়া, ঘিঞ্জী অপেক্ষাকৃত কম, অথবা শহরতলির দিকটা যদি অন্যভাবে অস্বাস্থ্যকর না হয় তবে সেদিকে গিয়ে রোগীর থাকতে চেষ্টা করা উচিত। চারিদিকে খোলারোদ-বাতাসের ভিতরেই রোগীর ঘরখানা হওয়া দরকার। সুবিধাজনক হলে ছাতের উপর রোগীর জন্যে সুন্দর কটেজ-জাতীয় ঘর তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে—টাইল, অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌, গোলপাতা বা খড় দ্বারা। ঘরের জানালার ভিতর দিয়ে বাইরেকার অনেক দূরের দৃশ্য

রোগটা যখন টি. বি.—

রোগী যাতে ভালোভাবে উপভোগ করতে পারেন, সেটা করা উচিত।

রোগীর ঘরে কারুর শোয়া ঠিক নয়; তবে নিতান্ত অবস্থাগতিকে রোগীর ঘরে যদি কাউকে কোনও কারণে শুতেই হয় তবে রোগীর বিছানার অন্ততঃ আট নয় ফিট দূরে তার বিছানা থাকবে। রোগীকে একটি যা-তা ঘর দিলে চলবে না—তাঁকে দিতে হবে বাড়ীর সর্বোৎকৃষ্ট ঘরখানি। সে রকম ঘর না থাকলে তাঁর জন্যে আলাদা একখানা ঘর তৈরি করতে হবে।

রোগী যে ঘরে শোবেন—সে ঘরে প্রচুর পরিমাণে দরজা-জানালা থাকা চাই এবং সেই দরজা-জানালা খুলে রাখতে হবে সমস্ত দিন এবং রাত—কি গ্রীষ্ম, কি শীত—সব দিনে। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে—জানালা দিয়ে ঠাণ্ডাটা কিংবা বাতাসের কোনও জোর ঝাপ্‌টা যেন সোজা-সুজি এসে রোগীর গায়ে না লাগে। এই ভুল ধারণা মন থেকে একেবারে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে হবে যে, রাত্তিরে দরজা-জানালা খুলে শুলে পরে রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

যদিও আমাদের কারুর কারুর অতিরিক্ত সর্দিপ্রবণ ধাত হবার মূলে অনেক কারণই বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু একথা বললে অন্যায় হবে না যে অধিকাংশ সময়ে খোলা বাতাসের প্রতি ক্রমাগত বিমুখতার ফলে আমাদের শরীর এমনভাবে তৈরী হয়ে ওঠে যে, একটুক্ষণ খোলা জায়গায় থাকলে যখন-তখন সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগে। ধীরে ধীরে একবার যদি জানালা-দরজা খুলে শোয়া অভ্যাস করতে পারা যায়, তবে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় আর থাকবে না এবং একবার ভালো রকম অভ্যাস হয়ে গেলে তখন বদ্ধ ঘরে শুতেই হাঁপিয়ে উঠতে হবে—শুধু তাই নয়, শুতে অবশেষে ঘৃণা বোধ হবে। প্রচণ্ডতম শীতের দিনেও ঘরের আব্‌হাওয়াকে আরামপ্রদ-ভাবে উষ্ণ রেখে ঘরে প্রচুর হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা রাখতেই হবে।

গায়ে ভালো করে লেপ কম্বল জড়িয়ে বেশ আরামের সঙ্গে যেন রোগী শোন। একটা উলের টুপি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা ভালো—কিন্তু এখানে একটা সতর্ক-বাণীর প্রয়োজন—মুখ ঢেকে যেন রোগী কদাচ না শোন। রোগী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, সমস্ত শরীরটা এবং মাথা যদি ভালো ভাবে ঢাকা থাকে—প্রত্যেক ঋতুর প্রয়োজনানুযায়ী বস্ত্রে—তবে ঘরের খোলা বাতাসে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় কিছুমাত্র থাকে না। এবং খোলা বাতাসকে ভালো না বাসতে পারলে শরীরের সন্তোষজনক উন্নতি তিনি কখনই আশা করতে পারেন না।

মুক্ত, বিশুদ্ধ বায়ুতে থাকবার উপকারিতা কিছুদিনের ভিতরেই বেশ বুঝতে পারা যায়। জ্বর বেশ কমে আসতে থাকে, হজম-শক্তি একটু একটু ক'রে বাড়তে থাকে, বিবর্ণ দেহে বেশ অল্পে অল্পে রক্তের আভা দেখা দেয়। আর, আমি বিশ্রাম নেবার কথা যা বলেছি, যার গুরুত্ব নাকি টি.বির চিকিৎসায় অত্যন্ত বেশী, সে রকম বিশ্রাম মুক্ত বায়ুতে ছাড়া নেওয়া প্রায় অসম্ভব। বন্ধ ঘরের বিষাক্ত, গুমোট হাওয়ায় মন ছট্‌ফট্ করতে থাকে এবং বিশ্রামের হয় সম্পূর্ণ ব্যাঘাত। কিন্তু মুক্ত বায়ুতে একেবারে তার উল্টো। বাইরের মনোরম, ঝিরঝিরে হাওয়ার কোমল, সস্নেহ স্পর্শ শরীরে এসে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উত্তেজনা আসে ক'মে, মনে জাগে বেশ একটা শান্ত ভাব। বেশ চুপ চাপ শুয়ে থাকতে অতটা আর কষ্ট হয় না। এই রোগে অনেক সময় নৈশ ঘর্ম হয়ে থাকে। কখনও বা অল্প হয়, কখনও বা ঘামে রোগীর সমস্ত শরীর ভিজে যায়। মুক্ত বায়ু এই নৈশ ঘর্ম নিবারকও বটে। (নৈশ ঘর্মের উৎপাতের প্রতিবিধানার্থে, ঘুমিয়ে পড়বার আগে রোগীকে টয়লেট ভিনিগার মিশ্রিত উষ্ণ জলে স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ও-ডি-কোলোনও ব্যবহার করা যেতে পারে। খুব বেশী কাপড় জামা পরে শোওয়া ঠিক নয়)। ঘরের হাওয়া যদি স্থির, শুষ্ক হয়,

রোগটা যখন টি. বি.—

তবে সেটা খারাপ। ক্ষমতায় কুলোলে এবং সুযোগ থাকলে বিদ্যুৎচালিত পাখার সাহায্যে ঘরের বাতাসকে বেশ ইতস্তত সঞ্চালিত করবার ব্যবস্থা করতে পারলে সেটার ক্রিয়া বিশেষ ভালো হবে। আধুনিক কয়েকজন যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করেছেন যে রোগীর পক্ষে "এয়ার কনডিশান্‌ড" ঘরই সর্বাপেক্ষা ভালো। মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে রোগীর মশারি ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু বায়ু-চলাচল অব্যাহত রাখবার জন্যে "নেটের মশারি" ব্যবহার করা দরকার। হাওয়া খাওয়ার জন্যে তাই বলে ঘরের বাইরে একেবারে মাঠের মাঝখানে গিয়ে অথবা একেবারে উন্মুক্ত ছাতে রাত কাটানো রোগীর পক্ষে একেবারেই ঠিক নয়। আরও একটা কথা এই যে রোগী খুব ঘন ঘন এবং গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে যেন ফুস্‌ফুসকে হাওয়া খাওয়াতে চেষ্টা না করেন বা মুখ দিয়ে বাতাস না গিলতে থাকেন খুব ক'রে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন মানে এসব নয়। জোরে, প্রচুর পরিমাণে এবং দ্রুতভাবে বায়ু নাসিকা পথে যত গ্রহণ করা যাবে আর ত্যাগ করা যাবে, ফুস্‌ফুসের বিশ্রামও তত কম হবে, এবং অসুখের ক্ষতও সারবে না। খুব ধীরে, সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসকে হতে দিতে হবে।

প্রত্যেকটি কাজে নিয়মানুবর্তিতা অভ্যাস করা টি. বি. রোগীর একান্ত প্রয়োজন। পথ্য গ্রহণ, বিশ্রাম, ঔষধ ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজ প্রতিদিন একেবারে ঘড়ির কাঁটায় চালাতে হবে। নিয়মিতভাবে এক সপ্তাহ বা দু' সপ্তাহ অন্তর ওজন নিতে হবে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে—ঘণ্টা চারেক অন্তর প্রতিদিন নিয়মিত টেম্পারেচার নিতে হবে এবং তা খাতায় বা চার্টে লিখে রাখতে হবে। দৈনিক সকালে এবং সন্ধ্যায় অন্তত দুইবার নাড়ির বেগ মিনিটে কত হয় দেখে খাতায় লিখে রাখতে হবে। রোগীর উন্নতি, অবনতি, রোগের প্রকৃতি এবং গতি

ইত্যাদি স্থির করতে পাল্‌স্‌ এবং টেম্পারেচারের প্রতি ক্রমাগত অত্যন্ত লক্ষ্য রেখে চলবার প্রয়োজন হয় ; কাজেই যে খাতা বা চার্টে এগুলি নোট করা থাকবে সে খাতা বা চার্টখানা খুব যত্নে রাখতে হবে।

টেম্পারেচার নেওয়া, পাল্‌স্‌ দেখা, ওজন নেওয়া—এগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে। কোনও পরিশ্রম বা উত্তেজনার মুহূর্তে টেম্পারেচার বা পাল্‌স্‌ দেখা একেবারেই বিধি নয়। প্রত্যেকবার টেম্পারেচার নেবার আগে অন্তত আধ ঘণ্টাখানেক সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে এবং এই সময়টাতে গল্প করা, বই পড়া, লেখা, খেলাধূলো ইত্যাদি চলবে না। মুখে টেম্পারেচার নিতে হলে এই সময়টাতে ঠাণ্ডা বা গরম কোনও কিছু খাওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঠোঁট দুটিও বন্ধ ক'রে রাখা উচিত। এই সব নিয়মগুলির অবহেলা করলে টেম্পারেচার ঠিক মতন থার্মোমিটারে উঠবে না—হয় উঠবে কম, না হয় বেশী। পারা ঠিক মতন উঠছে কিনা এটা দেখবার জন্যে পাঁচ মিনিট পূর্ণ হবার আগেই মুখ থেকে বার বার থার্মোমিটার বের ক'রে দেখা উচিত নয় বা মুখে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করাও ঠিক নয়। বগলে যেন কেউ জ্বর না দেখেন, ওতে জ্বর ঠিক ওঠেনা এবং বগলের টেম্পারেচার বিশ্বাসযোগ্যও নয়। সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে "রেকটাল টেম্পারেচার" (যা নাকি মুখের টেম্পারেচারের চেয়ে সাধারণতঃ একটু বেশী), এবং রেকটাল টেম্পারেচার দ্বারা চালিত হওয়াই রোগীর পক্ষে সর্বোত্তম। রেকটাল টেম্পারেচার নেবার নিয়ম হচ্ছে এই : থার্মোমিটারের বাল্‌বে প্রথমে একটু ভেসেলিন্‌ জাতীয় জিনিস লাগাতে হবে, এবং ধীরে ধীরে মলদ্বারে ইঞ্চি দুই প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। জিভের নীচেই হোক আর মলদ্বারেই হোক ঘড়ির কাঁটা দেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে পুরো পাঁচটি মিনিট থার্মোমিটার রেখে টেম্পারেচার নিতে হবে। আধ মিনিটের মার্কা মারা থার্মোমিটারও পুরো পাঁচ মিনিট রাখতে হবে, আধ মিনিটে

কদাচিৎ সঠিক টেম্পারেচার ওঠে। মুখ বা মলদ্বার থেকে থার্মোমিটার বের ক'রে টেম্পারেচার দেখে কোনও লোশান, স্পিরিট বা অ্যাল্‌কোহল জাতীয় কোনও ওষুধে একটু তুলো ভিজিয়ে থার্মোমিটারটা বেশ ক'রে মুছে, ঝেড়ে ৯৫° ডিগ্রীর কাছে নামিয়ে খাপে বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। একটা শিশিতে লোশানের ভিতরে থার্মোমিটার ডুবিয়েও রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাতে থার্মোমিটারের দাগগুলি কয়েকদিন পরে উঠে যায় এবং টেম্পারেচার দেখবার অসুবিধা হয়। রোগীর নিজের থার্মোমিটার ঝাড়বার চেষ্টা করা সব সময়ে উচিত নয়—বিশেষতঃ দুর্বল বা পীড়িত অবস্থায়। এ বিষয়ে অপরের সাহায্য নেওয়াই ভালো। এক রকম যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায়, যার ভিতর থার্মোমিটার প্রবেশ করিয়ে দিলে পারা আপনা থেকেই নেমে আসে।

সকালের টেম্পারেচার এবং পাল্‌স্‌ নেবার নিয়ম হচ্ছে একেবারে ভোরে ঘুম ভাঙ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই। সমস্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতে হবে তার পরে। দিনের ভিতর কোন সময়ে জ্বরের এবং নাড়ির বেগ সব চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায় সেটা নোট করতে হবে। অনেক সময় অতি সামান্য কারণে যক্ষ্মারোগীর পাল্‌স্‌ অত্যন্ত বেড়ে যায়। কারুর উপরে একটু রাগ করলে, কিছুক্ষণ ধরে কথা বললে, একখানি চিঠি লিখলে, হঠাৎ কোনও প্রীতির বা ঘৃণার পাত্রকে দেখতে পেলে, তর্ক করলে, ডাক্তার ঘরে এসে ঢুকলে—বা অন্য যে কোনও ধরনের উত্তেজনার ফলেই পাল্‌স্‌ খুব বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ ক'রে যে রোগী একটু ভাবপ্রবণ তার তো কথাই নাই। অবিশ্যি এই সব সময়ে সুস্থ লোকেরও স্বাভাবিকভাবেই নাড়ির দ্রুততা ঘটতে পারে। কাজেই এই সব উত্তেজনার মুখে পাল্‌স্‌ গুণতে নাই। শরীর মনের বেশ শান্ত এবং সম্পূর্ণ-বিশ্রামযুক্ত শয়নের অবস্থায় নাড়ীর বেগ যা হয় সেইটেই রোগীর প্রকৃত অবস্থা সূচনা করে

এবং সেইটেই চিকিৎসককে দেখানোর জন্যে খাতায় বা চার্টে টুকে রাখতে হবে।

একটা বিষয় রোগীদের জানবার দরকার। পাল্‌স্‌ই হোক বা টেম্পারেচারই হোক—প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই রকম খাটবে এই ধরনের "অ্যাব্‌সলিউট্‌ নর্মাল" বলে কিছু নাই। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে টেম্পারেচার এবং পাল্‌স্‌-এর অনেক রকম পরিবর্তন হতে পারে এবং রোগী যদি ৯৮.৪°-এর দাগকেই তাঁর "নর্মাল টেম্পারেচার" বলে ধরে বসে থাকেন তবে তিনি অতি দুঃখজনক ভুল করবেন। রাত্রে বেশ সুনিদ্রার পরে ভোর বেলায় জাগরূক অবস্থায় রোগীর রেকটাল টেম্পারেচার ৯৭.৩° থেকে ৯৮° ডিগ্রী পর্যন্ত নর্মাল হতে পারে এবং বিকেলের দিকে ৯৯.১° থেকে ৯৯.৫° পর্যন্তও নর্মাল হতে পারে। এমন কি মেয়েদের ক্ষেত্রে নর্মাল টেম্পারেচারগুলো এর চেয়েও কিছু বেশী হতে পারে—বিশেষ ক'রে মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে। ভোরের টেম্পারেচার দু'চার পয়েণ্ট বেশীও হতে পারে—যদি নাকি রাত্তিরে ভালো ঘুম না হয়—স্বপ্ন, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মশা-ছারপোকা বা গরম ইত্যাদির জন্যে, বা কোনও রকম মানসিক উত্তেজনা বশতঃ। সকাল থেকে বিকেলের টেম্পারেচার স্বভাবতঃই কিছু বেশী থাকতে পারে—সুস্থ লোক বা রোগী উভয়ের ক্ষেত্রেই। সেটাকে "জ্বর" বলে না। কিন্তু ভোরে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে যদি টেম্পারেচার ৯৯° বা তার বেশী হয়, সেটাকে "জ্বর" ধরতে হবে। কাজেই এক সময় যে টেম্পারেচার স্বাভাবিক, অন্য সময় তা জ্বর হতে পারে, এবং এক সময় যা জ্বর, অন্য সময় তা স্বাভাবিক হতে পারে। আরেকটা কথা। দিনের ভিতর চার পাঁচবার জ্বর দেখার নিয়ম এই জন্যেই যে, কোন্‌ রোগীর জ্বর যে কখন সব চেয়ে বেশী বাড়বে তা বলা যায় না। কারুর জ্বরটা সব চেয়ে বেশী হয় হয়ত বেলা এগারোটার

সময়ে, কারুর বা দুটো বা অন্য সময়ে। এটা লক্ষ্য রাখবার দরকার। অবশ্যি অধিকাংশের জ্বর সাধারণতঃ সন্ধ্যায়ই বেশী ওঠে। মুখের এবং রেকটাল টেম্পারেচার-এ যে তফাত তাও এক রকম নয় এবং এই তফাতটা পয়েণ্ট্ এক ডিগ্রী থেকে শুরু ক'রে পূরো এক ডিগ্রী অথবা তারও কিছু বেশী হতে পারে—বিভিন্ন লোকের ভিতর এবং একই লোকের ভিতর বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে।

আরোগ্যাভিমুখী রোগীকে যখন ক্রমে ক্রমে চলা ফেরা করতে দেওয়া হয় তখন রোগী তাঁর টেম্পারেচারের ভিতর আরও অদ্ভুত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ঠিক হেঁটে আসবার পরে বা কোনও উত্তেজনার পরে তাঁর (রেক্টাল) টেম্পারেচার ১০০·২°-ও যদি হয় তবে তাও "জ্বর" নির্দেশ করবে না যদি নাকি টেম্পারেচারটা বিশ মিনিটকাল সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরেই ঠিকমত পূর্বের অবস্থায় নেমে আসে। একজনের পক্ষে যে টেম্পারেচার "নর্মাল" অপরের পক্ষে তা সম্পূর্ণ বিপদ-জ্ঞাপক হতে পারে, এবং একজনের পক্ষে যা বিপদ-জ্ঞাপক তা অপরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারে। কাজেই উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ দ্বারা অভিজ্ঞ চিকিৎসকই কেবল বলতে সক্ষম যে বিশেষ বিশেষ রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক টেম্পারেচার কি হতে পারে। রোগীর পক্ষে, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক টেম্পারেচার সম্বন্ধে তাঁর নিজের উৎকট কল্পনা থেকে নিজেকে মুক্ত করাই মঙ্গলজনক।

ঠিক একই ভাবে এটাও বলা যেতে পারে যে মিনিটে ৭০—৭২ থেকে ৮৪—৮৬ পর্যন্ত যে কোনও পাল্স্-রেট (মেয়েদের ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশী হতে পারে কিছু) বিভিন্ন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিভিন্ন সময়ে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে "নর্মাল" বলে ধরা যেতে পারে।

রোগীর পরিষ্কার পরিচ্ছতার জন্যে
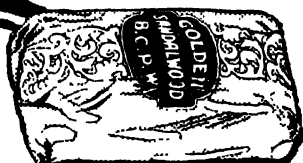
জ্বর বন্ধ হ'য়ে তারপরে একাদিক্রমে কয়েকমাস জ্বরশূন্য অবস্থায় কাটলেও রোগীর মাঝে মাঝে পাল্‌স্‌ ও টেম্পারেচারটা নেওয়া উচিত—বিশেষ ক'রে কোনও শ্রমসাধ্য কাজের পরে। যতটা সতর্কতা দ্বারা চালিত হওয়া যাবে, ততই মঙ্গল।

এখানে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টি-বি রোগীর যে কেবল টি-বির জন্যেই জ্বর হবে তা নয়। সঙ্গে যদি খারাপ টন্‌সিল্‌, ফ্যারিঞ্জাইটিস্‌, পেটের দোষ, বাত, ম্যালেরিয়া বা এই সব জাতীয় অন্য কোনও উপসর্গ থাকে, তবে রোগীর শরীরে এই সবের জন্যেও জ্বর থাকতে পারে, এবং সেটাকে খেয়াল ক'রে ধরতে পারা চাই।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ রোগীর ভোরের টেম্পারেচারটা সাধারণতঃ একভাবেই থাকে, কিন্তু দিনের অন্য সময়কার টেম্পারেচারের তারতম্য হয়। কাজেই ভোরের টেম্পারেচারের সঙ্গে দিনের অন্য সময়ে টেম্পারেচারের সব চেয়ে বেশী হওয়ার অবস্থার কতটা তফাত এটা বুঝবার জন্যে নিয়মিতভাবে ভোরের টেম্পারেচার নিতে অবহেলা করা উচিত নয়। মাঝরাত্রে সাধারণতঃ গায়ের তাপ সব চেয়ে কম থাকে; শরীরের সব চেয়ে কম তাপের সঙ্গে সব চেয়ে বেশী তাপের তফাত ১.৯° ডিগ্রীর বেশী হওয়া উচিত নয়।

ওজন নেওয়া সম্বন্ধে এইটুকু বলবার আছে যে প্রথম দিন দিনের যে সময়ে, যে যন্ত্রে এবং যে পোষাকে ওজন নেওয়া হবে, পরবর্তী বারগুলিতেও ঠিক সেই পোষাকে সেই যন্ত্রে এবং দিনের ঠিক সেই সময়ে ওজন নিতে হবে। তা না হলে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবে।

যদিও রোগীর ঘরে যাতে প্রচুর রোদ আসে সেটা দেখবার দরকার, কিন্তু এটা লক্ষ্য রাখতে হবে তাঁর গায়ে যেন রোদ না লাগে। অনেকে এই রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে রোদে গিয়ে রোজ বসে থাকতে উপদেশ দেন এবং অনেক সময় পীড়াপীড়িও করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে বুকে এভাবে রোদ লাগান অনেক সময়েই নিরাপদ নয়। অজ্ঞ চিকিৎসক অথবা আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে খালি গায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুকে কড়া রোদ লাগিয়ে অনেক রোগীই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন—মাথা ধরিয়ে, জ্বর বাড়িয়ে, রক্তবমি ক'রে··· ইত্যাদি। বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সৌর-স্নান একেবারেই অসঙ্গত এবং রৌদ্র-চিকিৎসা বুকের টি.বি.র জন্য নয়। শরীরের কোন্ কোন্ অংশে কখন, কি ভাবে, কতদিন যাবৎ, কতটুকু রোদ লাগাতে হবে, অথবা কোনও রোগী আদৌ সৌর-স্নানের উপযুক্ত কিনা—এসব সম্বন্ধে কেবল বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। বুকের টি-বি ছাড়া শরীরের অন্যান্য কোনও কোনও স্থানের টি-বিতে আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দ্বারা চিকিৎসার ফল অনেকটা সন্তোষজনক হয়েছে। সূর্যালোক ছাড়া কার্বন আর্ক ল্যাম্প, মার্কারি ভেপার আর্ক ল্যাম্প ইত্যাদি দীপ কৃত্রিম উপায়ে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি বিকিরণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। সুইট্জারল্যাণ্ডে আল্‌স্‌ পর্বতের উপরে লেজাঁ নামক স্থানে স্থাপিত স্যানাটোরিয়ামে বিশেষ কৃতকার্যতার সঙ্গে ডাঃ রোলিয়ে নামক সুইস্-সার্জেন সূর্যালোক দ্বারা অস্থির ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। এই চিকিৎসা-প্রণালীকে বলা হয়ে থাকে "হেলিও থেরাপি"।

যতদিন ব্যাধি সক্রিয় অবস্থায় থাকে, অনেক রোগীকেই কাসি দ্বারা

বড় বিব্রত হ'তে হয়। কিন্তু এই কাসিটা বড় ক্ষতিকর। কাসির সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের সুস্থ অংশে রোগ ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা পায়, কাশতে কাশতে রোগী নিজেকে ভীষণভাবে পরিশ্রান্ত ক'রে তোলে, জ্বর বাড়ে, অনেক সময় কাশতে কাশতে শেষে শুরু হয় রক্ত-বমি। কাসিকে কম রাখবার জন্যে যত রকম উপায় সম্ভব তা অবলম্বন করা উচিত। একটু তাল-মিছরির টুকরো, পেপ্‌স্‌ অথবা ইউক্যালিপ্‌টাস-মেন্থলের বড়ি, কোনও ঝাঁঝওয়ালা কবরেজী অবলেহ, পিপারমিণ্ট্‌ লজেঞ্জ্‌, বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এ রকম যে কোনও থ্রোট-পিল, বচ্‌ বা ঐ রকম যে কোনও ঝাল দ্রব্য মুখে রাখা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে এসব ধরনের কোনও বড়ি বা সাধারণ কোনও পেটেণ্ট্‌ কাসির দাওয়াই বা গলায় একটা পেইণ্ট্‌ লাগান অথবা প্রচলিত কোনও ওষুধ দিয়ে গলায় "স্প্রে" করা অতি সাময়িকভাবে কাসির বেগটাকে একটু কমাতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত নাকি ফুস্‌ফুসের অসুস্থ অংশের প্রকৃত উন্নতি না হয় ততদিন পর্যন্ত এসব দ্বারা সত্যিকারের কোনও উপকারই হয় না। তবুও ফুসফুস যাতে আরও জখম না হয় সেজন্যে কাসিকে কম রাখবার চেষ্টা যথাসাধ্য করতে হবে। গলায় এবং টন্‌সিলের দোষ থাকলে তা ডাক্তারকে দেখিয়ে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে রোগী অভ্যাসবশে কাশেন। গলার কাছে একটুখানি সুড় সুড় ক'রে উঠলেই অমনি খকর খকর ক'রে কখনও কাশতে সুরু ক'রে দেওয়া উচিত নয়। ১০০ টার ভিতর ৬০টা কাসির বেগ রোগী একটু চেষ্টা এবং অভ্যাসের ফলে চাপতে সক্ষম হ'তে পারেন। জোরে কেশে গয়ের তুলতে চেষ্টা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অধিকাংশ সময়ে স্বাভাবিকভাবেই গয়ের উপরে উঠে এসে আপনা থেকেই গলার কাছে জমে, তখন গলাটা একটু টেনে অথবা অল্প একটু কেশে সেই গয়েরটা তুলে ফেলতে হবে—কিন্তু "শুকনো কাসি"কে প্রশ্রয় দেওয়া

অসঙ্গত। একটু গরম জলের ভিতর এক চিমটি সোডা-বাইকার্ব মিশিয়ে একটু একটু পান করলে কাসির সময়ে উপকার পাওয়া যেতে পারে। কি ভাবে শুলে বা বসলে কাসির বেগ বৃদ্ধি পায় বা কমে সেটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে। কথা কম বলতে হবে। পেট বা কোষ্ঠের অবস্থাটাও ভালো থাকা দরকার। অম্বলের অসুখ বা হাঁপানি বা ব্রংকাইটিশ থাকলে তার চিকিৎসা করানো দরকার; কারণ কাশির উৎস এগুলিও হতে পারে। রোগীর সবচেয়ে নাটকীয় উপসর্গ মুখ-দিয়ে-রক্ত-ওঠা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে রক্ত বন্ধ করবার একমাত্র উপায় শয্যায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন। রক্ত ওঠা শুরু হলে হৈ চৈ লাগিয়ে দেওয়া অথবা রোগীকে কোনও রকম টানা-হ্যাঁচড়া করা নিতান্ত অসঙ্গত। রোগীর যত ভয় এবং উত্তেজনা বাড়বে, যত নড়াচড়া হবে—রক্ত উঠতে থাকবে তত বেশী করে। যে মুহূর্তে কাসির সঙ্গে রক্ত উঠে আসতে আরম্ভ করবে, রোগী বসে থাকুন, দাঁড়িয়ে থাকুন—আর কথাটি না বলে বিছানায় এসে সটান লম্বা হয়ে পড়বেন—আর নিজের মনকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করবেন। সম্পূর্ণ বিশ্রামের কিছুমাত্র ত্রুটি না করলে রক্ত দু তিন দিনের ভিতর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে—যদিও কখনও কখনও একটু বেশী সময়ও নিতে পারে। বেশী রক্ত ওঠা বন্ধ হবার পরেও কয়েক দিন ধরে থুতুর সঙ্গে একটু একটু রক্ত বা একটু একটু জমাট রক্তের টুক্‌রো বেরুতে পারে, কিন্তু তার জন্যে রোগী যেন ভাবনা না করেন। রক্ত যদি বেশী ওঠে তবে সেই কয়েকদিন শক্ত অথবা গরম কোনও জিনিস খাওয়া বাদ দিতে হবে—ফলের রস বা বরফ দিয়ে দুধ খেতে হবে শুধু। থুতুর সঙ্গে রক্তের সামান্য ছিট থাকলে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কড়াকড়ি নিষ্প্রয়োজন। বেশী রক্ত ওঠা সম্পূর্ণ বন্ধ হবার পরেও দু-তিন সপ্তাহ অবধি ওঠা-বসা বা কোনও কারণে বিছানা ত্যাগ করতে চেষ্টা করা কিছুমাত্র নিরাপদ নয়।

এই সময়টা বেডপ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। স্পঞ্জিং করবার সময়ে এই অবস্থায় ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করতে হবে; বুক বা পিঠকে ঘষাঘষিও চলবেনা। এবং এর পরেও অনেক দিন পর্যন্ত যে কোনওরূপ নড়াচড়া সম্বন্ধে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রক্ত ওঠা বন্ধ করবার অন্যতম উত্তম উপায় হচ্ছে বুকে আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্স্ নামক ইঞ্জেক্‌শান; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কতকগুলি কারণ আছে যার জন্যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে এটা কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায় না। তবে রক্ত যাতে তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে আসে তার জন্যে মাংসপেশীতে বা শিরাভ্যন্তরে নানা রকম ইঞ্জেক্‌শানের ব্যবস্থা আছে। "আয়াপানে"র রস ইত্যাদিও খেতে দেওয়া যায়। মুখ দিয়ে খুব বেশী রক্ত উঠবার সময়ে অলটারনেট ব্যাণ্ডেজিং হচ্ছে আরেকটি প্রক্রিয়া যা নাকি রক্ত বন্ধ করতে অনেক সময় সহায়তা করে থাকে। এইভাবে "অলটারনেট ব্যাণ্ডেজিং" করা হয়: প্রথমে কনুয়ের উপর দুটি বাহু অথবা একটি বাহু এবং একটি উরু খুব জোরেও নয় খুব আস্তেও নয় এইভাবে একটা বেল্ট্ অথবা ফিতে দিয়ে বাঁধা হয় ঘণ্টা খানেকের জন্যে—অথবা রোগী সহ্য করতে পারলে আরও কিছু বেশী সময়ও রাখা যেতে পারে। তারপরে এই বাঁধন খুলে দিয়ে বাঁধতে হয় ঠিক ওই ভাবে দুই উরুদেশ অথবা এক বাহু এবং অপর উরু এবং রাখতে হয় ঘণ্টাখানেক (বা তার বেশী)। একটা স্ট্র্যাপ্ দিয়ে (কাপড়ের খণ্ড অথবা রাবারের নলও ব্যবহার করা চলতে পারে) এই রকম করে একবার দুই বাহু অথবা এক বাহু, এক উরু একবার দুই উরু অথবা অপর বাহু, অপর উরু বদ্‌লে বদ্‌লে বাঁধা চলতে থাকবে যতক্ষণ না রক্ত বন্ধ হয়। রক্ত উঠবার সময় রোগীকে কখনও কখনও মাথার নীচেকার সব বালিশ একেবারে সরিয়ে বিছানার উপরে একেবারে চিতপাত ক'রে শুইয়ে রাখা হয়ে থাকে, অথবা কখনও কখনও তাঁকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে রাখা

হয়ে থাকে : তাঁর মাথা এবং পিঠের তলায় আরও বালিশ দিয়ে তাঁকে রাখা হয়ে থাকে অর্ধ-এলায়িত অবস্থায়। যে দিকে রোগীর মাথা থাকে খাটের সেই দিকটা পায়ার নীচেয় কাঠ বা ইঁট দিয়ে একটু তুলেও দেওয়া যেতে পারে। রক্ত বমনের অবস্থায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে বুকের চামড়ার নীচেয় অক্সিজেন ইঞ্জেকশান করবার একটা রেওয়াজ এক সময়ে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এটির চলন দেখতে পাওয়া যায় না। কোনও কোনও রোগীর বেলায় ফ্রেনিক নার্ভ অপারেশানও করা হয়ে থাকে। বুকের যে দিক থেকে রক্ত ওঠে সেই দিকে বুকের উপর একটা বরফের ব্যাগ রাখা কেউ বলেছেন ভাল কেউ বলেছেন মন্দ। গলার সুড়সুড়ি কমাবার জন্যে মুখে এক আধ টুকরো বরফ চোষা চলতে পারে। তলপেটে গরম জলের বোতল বা ব্যাগ রাখা কার্যকরী হতে পারে ব'লে কেউ কেউ মনে করেন—কেউ কেউ বা এর একেবারে বিরোধী। কোষ্ঠ পরিষ্কার যাতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর ঘরের হাওয়া-চলাচল অব্যাহত যেন থাকে। ধোঁয়া বা অন্য কোনও কিছুর উগ্র গন্ধ রোগীর নাকে প্রবেশ ক'রে কাসির সৃষ্টি না করে তা দেখতে হবে। অতিরিক্ত রক্তক্ষয় হলে নতুন বিভ্রাটের হাত থেকে রোগীকে বাঁচানোর জন্যে "ব্লাড্ ট্র্যান্‌স্‌ফিউশানে"র ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এক পাইণ্ট ঠাণ্ডা জলে ড্রাম দেড়েক নুন দিয়ে সেই জলটা একটু একটু "সিপ্" করে খাওয়া মন্দ নয়। রোগী রক্ত যেন গিলে না খান। রক্ত বমন কালে "মরফিন" ইঞ্জেকশানের কতকগুলি উপকারিতা আছে, তবে কতকগুলি সতর্কতারও প্রয়োজন আছে।

রোগী অনেক সময় রক্ত উঠবার অবস্থায় ভীষণ ঘাবড়ে যান এবং সময়টিকে মনে করে থাকেন একেবারে তাঁর মৃত্যু-মুহূর্ত বলে। কখনও বা একটুখানি রক্ত উঠলেই মনে করেন শরীরের সব রক্তই গেল বুঝি বেরিয়ে। রোগী

সাধারণতঃ এসব দুর্ঘটনা কাটিয়ে উঠতে পারবেন এবং চিকিৎসায়ও তাঁর বেশ উন্নতিই হবে। তবে এইসব রক্ত-কাসি—ইংরাজীতে যাকে বলা হয়েছে 'হিমপ্‌টিসিস্‌'—প্রায়ই শ্বাস-নালিকাগুলির ভিতর দিয়ে অসুখকে বেশী ক'রে ছড়িয়ে পড়তে সুবিধা প্রদান করে—যেমন নাকি করে বুকের পুঁজ-স্রাবি ক্ষত থেকে উৎপন্ন প্রচুর যক্ষ্মাজীবাণু-পূর্ণ গয়েরও।

কোনও কোনও রোগীর বেলায় দেখা যায় যে অসুখের কোনও সময়েই তাঁদের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠেনা। এই সব রোগী অথবা তাঁর আত্মীয়েরা অনেক সময় এই ধারণা নিয়ে বসে থাকেন যে যাদের রক্ত ওঠেনা তারাই হচ্ছে "ভাল" রোগী এবং যাদের রক্ত ওঠে তারা হচ্ছে "খারাপ" রোগী। রোগীর রক্ত উঠেছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে জানান যে—নাঃ, ওসব "খারাপ" কিচ্ছু হয়নি, এবং এমন প্রশ্নে অনেক সময় অসন্তুষ্টই হন। এঁদের জানতে হবে যে, "ভাল" রোগী আর "খারাপ" রোগীর বিচার এঁদের এই মতামত দিয়ে করা হয় না। অসুখের অতি প্রাথমিক অবস্থাতেও রক্ত উঠতে পারে, অথবা অসুখের অতি খারাপ অবস্থাতেও রক্ত না-ও উঠতে পারে, এবং প্রচুর রক্ত উঠেও অনেক রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতে পারেন। এবং কোনও দিনই রক্ত ওঠে নাই এমন রোগীও দ্রুতবেগেই মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে পারেন। বরং অসুখের প্রথম দিকে একটু আধটু রক্ত উঠলে যে সব রোগী ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে যান এবং নিজের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন তাঁদের পক্ষে ঐ রক্ত ওঠাটুকু একপক্ষে মঙ্গলজনকই হয়।

কাসি, রক্ত-ওঠা ইত্যাদি ছাড়া রোগীর নানা সময়ে নানা রকম উপসর্গ (প্রবল জ্বর, ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, অনিদ্রা, পেটের গোলযোগ, ঘর্ম ইত্যাদি) আসতে পারে এবং রোগের উপসর্গ ছাড়া ভিন্ন ব্যাধির ভিন্ন উপসর্গের

আবির্ভাবও ঘটে থাকে অনেক সময়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকই অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী এ সবের প্রতিকার করতে সচেষ্ট হবেন, এবং রোগীকে শান্তি দেবার জন্যে বা উপসর্গগুলির প্রাবল্য কমাবার জন্যে ঔষধ-পত্রের বা অস্ত্রাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা দেবেন। চিকিৎসকের দূরদর্শিতার সঙ্গে শুশ্রূষাকারী বা কারিণীর বিশ্বস্ততা এবং বুদ্ধিমত্তা মিলিত হয়ে পুনরায় তা যদি মিলিত হয় রোগীর নিজের বিবেচনা-শক্তির সঙ্গে, তাহলে তা উত্তম ফলই প্রসব করবে বলে আশা করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত কাম-চিন্তা রোগীকে মাঝে মাঝে বিব্রত ক'রে তুলতে পারে, তবে সাধারণ নৈশ স্খলনের ব্যাপারে রোগীর কিছুমাত্র ঘাব্ড়ানোর প্রয়োজন নাই। ওটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু হস্তমৈথুন-রূপ কদভ্যাস রোগীকে ত্যাগ করতেই হবে।

যক্ষ্মারোগীর কতকগুলি বিষয় সর্বদা মেনে চলা উচিত। কোনও ভারী বাক্স বা অন্য জিনিস তুলতে যাওয়া বা টানাটানি করা তাঁর কখনও ঠিক নয়। কোনও গৃহাভ্যন্তরিক ক্রীড়া বা কোনও কাজ বা যে কোনও কিছুর উপরে অনেকক্ষণ কুঁজো হয়ে ঝুঁকে থাকা ভয়ানক অন্যায়। নীচের শেল্ফ্-এ কোনও বই-টই খুঁজতে হ'লে অথবা মেঝের ওপর কিছু গুছোতে হ'লে সোজা হ'য়ে নীচেয় বসে সেটা ক'রতে হবে, দাঁড়িয়ে বাঁকা হ'য়ে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে নয়। কাউকে চীৎকার করে ডাকবার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। বিছানার পাশে রোগী একটি "কলিং বেল" রাখতে পারেন, কাউকে ডাকবার জন্যে সেইটে টিপলেই চলবে। অতিরিক্ত অট্টহাস্য খুবই খারাপ। কারুর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলা অথবা বহুক্ষণ ধরে অবিরাম কথা বলা, গুন-গুনের চেয়ে পর্দা আরেকটু চড়িয়ে মনের আনন্দে অথবা দুঃখে গর্দভ রাগিণীতে গান ধরে দেওয়া—ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। হঠাৎ লাফ মেরে বিছানা থেকে ওঠা, অথবা ধাঁ

করে চোখের নিমেষে ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ানো, শরীরকে একটা ঝাঁকানি মেরে কোনও কিছুর উপর উঠে বসা, নিজের হাতে কাপড়-চোপড় কাচা, দৌড়ান, দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা—অথবা শরীরের যে কোনও ধরনের অতর্কিত প্রবল আন্দোলন—গুরুতর রকমের হানি করতে পারে। রোগী জামা কাপড় এমন আঁটসাট করে কখনও না পরেন যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে বা শুয়ে থাকবার সময়ে অস্বাচ্ছন্দ্যকর হতে পারে। রোগীর পোষাক পরিচ্ছদ থাকবে বেশ ঢিলে রকমের। অনেক রোগীর বদ অভ্যাস আছে—থুতু গিলে ফেলা। এটা যে শুধু একটা নোংরামি তাই নয়, এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। যাঁদের থুতুতে যক্ষ্মা জীবাণু বর্তমান আছে (এবং ব্যাধির কোনও না কোনও সময়ে অধিকাংশেরই প্রায় থেকে থাকে), তাঁরা যদি থুতু-গিলে-খাওয়া-রূপ কদভ্যাস অচিরাৎ ত্যাগ করতে না পারেন, তবে তাঁদের পেট যক্ষ্মাক্রান্ত হতে একটুও বিলম্ব ঘটে না। এবং মনে রাখতে হবে অন্ত্রাদির যক্ষ্মা সারানও অতিরিক্ত শক্ত ব্যাপার।

থুতু সম্বন্ধে যক্ষ্মা রোগীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেখানে সেখানে যেভাবে-সেভাবে থুতু ফেলে পরিবারের সুস্থ লোকেদের আক্রান্ত করা তাঁর পক্ষে মহাপাপ হবে। অবশ্য রোগী কখনই চান না যে তাঁর দ্বারা অপরের কোনও ক্ষতি হয়। কিন্তু শুধু চাওয়া নয়, কিসে অপরের ক্ষতি হবে না হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর ভাল রকম জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। আমি পূর্বেই বলেছি—গয়েরটাই হল আসল বিপদ। গয়ের ফেলবার জন্যে রোগীর কাছে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পাত্র থাকবে। পাত্রটি ঢাকনাযুক্ত হওয়া দরকার। টি-বি রোগীর থুতু ফেলবার উপযোগী কাপ্ কিনতে পাওয়া যায়। এই পাত্রের এক তৃতীয়াংশ ফিনাইল-জল বা কার্বলিক লোশান বা

লাইসল লোশান (১ পাইণ্ট জলে ১ চামচ) বা আইজাল লোশান (২০০ ভাগ জলে এক ভাগ) দ্বারা পূর্ণ করে তার ভিতরে থুতু ফেলতে হবে। অভিজ্ঞ কবিরাজ মশায়দের মতে আকন্দ পাতা ও ধুতুরা পাতা সিদ্ধ জল অথবা ত্রিফলা, নিমপাতা সিদ্ধ জল বা শুধু চুনের জলও পিকদানিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছুই না পাওয়া গেলে অগত্যা শুধু জলই রাখতে হবে। প্রতিদিন এই থুতুর পাত্র সাবধানে পরিষ্কার করতে হবে। থুতুর পাত্রটিকে মাঝে মাঝে ফুটন্ত জলে আধঘণ্টা খানেক ধরে সিদ্ধ করে নেওয়া ভাল। থুতু সম্বন্ধে এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে: মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলা যেতে পারে, অথবা শক্ত কাগজের ঠোঙায় বা একটি পাত্রে চুন, ছাই বা কাঠের গুঁড়ো রেখে তার ভিতরে থুতু ফেলে শেষে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। বড় সহরে পাইখানার নর্দামার ভিতরেও থুতু ঢেলে ফেলে কাপ পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে। ফ্ল্যাস্ টেনে পাইখানা ধোয়া হলে পরে আবার ব্লিচিং পাউডার বা ফিনাইল-জল ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। যেখান থেকে লোকে পানীয় জল সংগ্রহ করে এমন কোনও পুকুরে, বা যেখানে লোকে স্নান করে বা বস্ত্রাদি ধোয় বা বাসন মাজে এমন কোনও জলাশয়ে থুতু নিয়ে ঢালা বা থুতুর মগ্ ধোয়া, অথবা যক্ষ্মা রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত যে কোনও দ্রব্যাদি ধোয়া—একটি জঘন্য অন্যায় ছাড়া আর কিছু নয়। হাতে-টাতে কখনও থুতু জড়িয়ে গেলে সে হাত তৎক্ষণাৎ কোনও লোশানে অথবা কার্বলিক-জাতীয় সাবান দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলতে হবে। টি. বি. রোগী যখন কাশবেন, মুখের সামনে একখানা ন্যাকড়া বা কাগজ নিয়ে কাশবেন, পরে সেই ন্যাকড়া বা কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রুমালও ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে পরে সেই রুমাল খুব ভাল করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। পুরুষ যক্ষ্মারোগীর কখনও দাড়ি, গোঁফ রাখা ঠিক নয়। কাশবার সময়ে

দাড়ি গোঁফে থুতুর কণা আটকে থাকে, কখনও বা গয়ের ফেলবার সময়ে দাড়িতে খানিক জড়িয়ে যায়। এ সব শুধু অপরিচ্ছন্নতা নয়—দস্তুরমত বিপজ্জনক। তা ছাড়া তরল খাদ্যদ্রব্যও এসব জিনিসে ঠেকে যায়—যে দৃশ্য অতি বিশ্রী।

যদি হঠাৎ কোনও ভাবে থুতুর পাত্রটি উল্টে যায় এবং মেজের উপর থুতু ঢেলে পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ—মাছি ইত্যাদি বসবার আগে—জায়গাটিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। প্রথমে ফিনাইল-যুক্ত নুড়িতে জায়গাটিকে থুতু-মুক্ত করে খানিক মেথিলেটেড স্পিরিট্ ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

রোগীর যদি হাড় বা গ্ল্যাণ্ড্ আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং সে সব স্থান থেকে পুঁজ ইত্যাদি যদি নির্গত হয় তবে এই সব ক্ষত বাঁধবার ব্যাণ্ডেজ্, তুলো ইত্যাদি একেবারে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। থুতু হোক, পুঁজ হোক—এগুলি কিছুতেই শুকিয়ে ধূলি হয়ে হাওয়ায় উড়বার সুযোগ না পায়। রোগীর দেহ থেকে নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা অবস্থাতেই ওগুলিকে বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। একটি পাত্রে যতক্ষণ এগুলি ভিজে বা কাঁচা অবস্থায় থাকে ততক্ষণ চারিদিকে ছড়াবার বা অন্যের শরীরে প্রবেশ লাভের সুযোগ এদের থাকে না। কিন্তু শুকিয়ে উঠলেই বিপজ্জনক। রুমাল ইত্যাদিতে কখনও থুতু ফেলতে নাই। কারণ থুতু ওতে শুষ্ক হয় এবং ঝাড়া লাগলেই চারিদিকে জীবাণু ছড়ায়।

যক্ষ্মারোগীর সমস্ত শরীর, বিছানা-পত্র সর্বদা বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। ঝাঁট দিয়ে রোগীর ঘরে ধূলো উড়ান ঠিক নয়। ঘরের মেজে, দেওয়ালের নীচের অংশটা প্রত্যেক দিন ফিনাইল বা ব্লিচিং পাউডার মিশান জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বেশ করে পুঁছতে হবে। যক্ষ্মারোগীর খাওয়ার বাসনপত্র, সাবান, টুথব্রাশ ইত্যাদির সম্পূর্ণ একটি প্রস্থ একেবারে

আলাদা থাকবে—সেগুলি ব্যবহার করবার অধিকার অপর কারুরই থাকবে না। টুথব্রাশ সিদ্ধ করলে তা নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। একটা পাত্রে খানিক নুন রেখে ব্রাশটা তার ভেতর গুঁজে রাখলে সেটা বিশোধিত হয়। রোগীর ঘরে ছোট ছেলে-পিলেদের আনাগোনা হওয়াটা মোটেই ঠিক নয়। ঘরের ভিতর অনাবশ্যক জিনিসপত্র কিছু থাকবেনা এবং ঘরটিকে গুদামে পরিণত না করে রাখতে হবে-সর্বদা পরিষ্কার, ঝরঝরে করে। রোগীর বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপড় মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে—এবং দেখতে হবে সেগুলি কখনও কোনও ভাবে নোংরা না থাকে। রোগীকে নিয়মিত স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়া, মাথা ধোয়ান—ইত্যাদির অন্যথা কখনও না ঘটে। রোগী যদি অত্যন্ত পীড়িত বা দুর্বল না হন তবে ঈষদুষ্ণ জলে বা সহ্য করতে পারলে ঠাণ্ডা জলে চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করে নিয়মিত স্নানও করতে পারেন। এতে উপকার ছাড়া অপকার হবার সম্ভাবনা নাই, তবে দেখতে হবে রোগী স্নান করতে গিয়ে বেশী ঘষামাজা করতে চেষ্টা করে নিজেকে ক্লান্ত না করে তোলেন। ক্ষেত্র বিশেষে দুধ, দশমূল, বেলপাতা, শোভাঞ্জন পত্র ও সোন্দাল পাতা সিদ্ধ জলে স্নান যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে হিতকর ব'লে কব্‌রেজ মশায়রা মনে করেন। অতিরিক্ত গরম জলে স্নান হানিকর। স্পঞ্জিং-এর জলে এলকোহল, অডিকোলন—ইত্যাদি মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। যে রোগী ওঠা-বসা করতে পারছেন না তাঁর দেহে শয্যাক্ষতাদি নিবারণের জন্যে সমস্ত পিঠে, ঘাড়ে, কাঁধে, কনুইতে, হাতের কব্জিতে, পাছার দুই পাশ এবং মাঝখানের হাড়ে বেশ ক'রে স্পিরিট লাগিয়ে পাউডার ঘষে দিতে হবে—প্রত্যেক বার স্পঞ্জিং-এর পরে, বা দরকার হ'লে রাত্রেও আরেকবার।

রোগীর ঘর মাস তিনেক অন্তর অন্তর চুনকাম করে দেওয়া ভাল। তার

জামা কাপড় ধোপা-বাড়ী দেবার আগে বাড়ীতে সিদ্ধ ক'রে বা সাত আট ঘণ্টা উজ্জ্বল সূর্যালোকে রেখে বিশোধিত ক'রে দেওয়া উচিত।
রোগীকে খাওয়ার আগে এবং পরে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। কবিরাজ মশায়দের মতে শোধিত সোহাগার খৈ-এর গুঁড়ো (১ ভাগ) মেশানো উষ্ণজলে (৬ ভাগ) মুখটা কুলকুচো করে ধুয়ে নির্দোষ করে তারপরে রোগীর খাওয়া উচিত। হাতের নখ ইত্যাদি যেন বেশ ভালভাবে কাটা থাকে। রোগী মুখ ধোবেন গামলা জাতীয় কোনও পাত্রে এবং থুতু বা থুতুর পাত্র সম্বন্ধে যে সব সাবধানতা এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, মুখ ধোয়া জল বা এই জলের গামলা সম্বন্ধেও তাই করতে হবে। অশক্ত অবস্থায় রোগীকে যখন বেড্-প্যান্ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে তখন সেটাকেও সর্বদা পরিষ্কার রেখে বিশোধক ওষুধে প্রত্যেকবার ব্যবহারের পরেই ধুয়ে ফেলতে হবে। যে জলের মধ্যে একজন যক্ষ্মারোগীর বাসন-পত্র বা কাপড় চোপড় ধোয়া হয়েছে, বাড়ীর সুস্থ লোকদের বাসন-পত্র, কাপড়-চোপড় কখনই সে জলে ধোয়া চলবেনা।
রোগীকে যাঁরা দেখাশোনা করবেন, যাঁদের উপর রোগীর সর্ববিধ শুশ্রূষার ভার থাকবে, মনে রাখা দরকার, রোগীর নিজের চাইতে তাঁদের দায়িত্ব অনেক সময়ে অনেক বেশী। রোগীর নিজের তো শুয়েই থাকতে হয়, কাজ করবার ভার বেশীর ভাগই অপরের উপরে। কাজেই তাঁরা যদি তাঁদের কর্তব্য ভালভাবে উপলব্ধি না করতে পারেন অথবা কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তার পরিণাম সকলের দিক দিয়েই শোচনীয় হতে পারে।
রোগীর পরিচর্যা যেমন করতে হবে, পরিচর্যাকারী বা কারিণীদের তেমন নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও, রোগীর কোনও রকম বিরক্তি উৎপাদন

না করে বেশ কৌশল ও বুদ্ধির সঙ্গে সতর্ক হতে হবে—যেন তাঁদের দেহে রোগসংক্রমণ না হয়। নিজেদের এক্স-রেটা করিয়া নেওয়া এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা মাঝে মাঝে নিজেদের শারীরিক অবস্থাটা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াও তাঁদের পক্ষে ভাল হবে।

রোগী যদি নিজের কাসিকে কিছুতেই দমন করতে না পারেন বা রোগী যখন হাঁচবেন, শুশ্রূষাকারী বা কারিণীর উচিত হবে রোগীর পাশের দিকে সরে থাকা, অথবা তার চাইতেও ভালো, নিজেদের নাক ও মুখে কাপড়ের "মাস্ক" বা রুমাল বেঁধে নেওয়া। শুশ্রূষাকারী বা কারিণী যদি সর্দিতে আক্রান্ত হন, তাহলেও এই রকম মাস্ক মুখে বেঁধে রোগীর কাছে যেতে হবে—যাতে সর্দি দ্বারা তিনি রোগীকে সংক্রামিত না করেন।

পরিবারে কোনও যক্ষ্মারোগীর মৃত্যুর পর বা তাঁকে কোথাও সরিয়ে নেবার পর, এখানে যে নির্দেশগুলি দেওয়া থাকল এগুলি প্রতিপালন করলে ঘরের অবস্থা নিরাপদ হবে এবং পরিবারটির সুস্থ ব্যক্তিদের দেহেও জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা তিরোহিত হবে। বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবার সুবিধা আছে অথবা যে সব জায়গায় বেশ রৌদ্র-কিরণ পড়ে, সেখানে যক্ষ্মাজীবাণু তত সুবিধা করে উঠতে পারে না; কিন্তু কোনও অসতর্ক রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত গৃহকোণে তাদের ক্ষমতা অসীম। কাজেই রোগী যদি তাঁর থুতু সম্বন্ধে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন না করে থাকেন তবে তাঁর ব্যবহৃত ঘরকে উত্তমরূপে সংশোধন করে নেওয়া অতীব প্রয়োজন।

(১) সব চেয়ে ভাল হচ্ছে, রোগী যে সব জিনিসপত্র ব্যবহার করেছিলেন তা সোজা পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া। তবে নিতান্ত অবস্থাগতিকে কারুর যদি সেগুলি ব্যবহার করতেই হয় তবে:

(ক) প্রথমেই বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে ইত্যাদি

সোডা মিশ্রিত জলে খুব মতন সিদ্ধ করে কেচে তার পরে রোদে শুকিয়ে পাঠাতে হবে ধোবির বাড়ীতে। রাগ্, কম্বল—এগুলি গরম জলে প্রচুর সাবান গুলে ভাল করে নিংড়ে ধুয়ে কয়েকদিন ধরে কড়া রোদে রাখতে হবে।

(খ) লেপ, গদি, তোষক, বালিস—এগুলোকে আইজাল, কার্বলিক বা ফর্মালিন সলিউশানে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বেশ করে মুছে কয়েক দিন ধরে কড়া রোদে ফেলে রাখতে হবে। সূর্যের আলো যক্ষ্মাজীবাণুর মহাশক্র। ছয় থেকে আট ঘণ্টার ভিতরে প্রখর সূর্যালোকে যক্ষ্মাজীবাণু নিধন প্রাপ্ত হয়। অন্ধকার, স্যাঁস্‌সেঁতে জায়গায়, কোনা-কানাচে এরা বেঁচে থাকে দীর্ঘকাল— তিন মাস থেকে ছমাস আট মাসেরও বেশী। সূর্যের আবছা আলোয় সপ্তা তিনেক এদের বাঁচতে দেখা গিয়েছে।

কিন্তু রোদে যাই রাখা হোক না কেন, দেখতে হবে রোদটা সর্বত্র ঠিকমতন লাগছে কি না। এক পিঠে লাগল আরেক পিঠে লাগল না, বা ভাঁজে ভাঁজে লাগল না—এ রকম হলে চলবেনা। রোদ লাগবার ভিতর ত্রুটি থাকবার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও যদি থাকে—তবে সব কিছু হয় বাষ্পীয় যন্ত্রে বিশোধিত করে নিতে হবে, না হয় সোজা পুড়িয়েই ফেলতে হবে—কোনও মায়া না করে।

(গ) জামা, কাপড়—রোগী সর্বদা যা ব্যবহার করেছেন—এসব একেবারে নষ্ট করে ফেলে দেওয়াই সব চেয়ে মঙ্গলজনক, না হলে যেগুলিকে খুব সিদ্ধ করা যাবে সেগুলিকে তাই করতে হবে এবং ধোপা-বাড়ী পাঠাতে হবে, আর পশমী জিনিস অথবা তুলোর জিনিস—যেগুলি কেবল সাবান দিয়ে ধোয়া চলে অথবা আদৌ ধোয়া চলে না, সেগুলিকে প্রখর রোদে এবং খোলা বাতাসে কয়েকদিন রাখতে হবে। অথবা ভাল কোনও স্টিমলণ্ড্রীতে পাঠিয়ে দিতে হবে।

(ঘ) খাবার বাসন পত্র, ছুরি. কাঁটা, চামচ—ইত্যাদিও উত্তমরূপে সিদ্ধ করতে হবে। বাসন-কোসন সিদ্ধ করবার প্রণালী সম্বন্ধে এইটে বলা যেতে পারে: প্লেট, কাপ, গ্লাস বা খাবার জন্যে ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্য ডেকচি কিংবা অনুরূপ কোনও উপযোগী পাত্রে রেখে জল দিয়ে একেবারে পূর্ণ করে দিতে হবে। তারপর ডেকচিটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুল্লীর আগুনের উপর রাখতে হবে। যখন ডেকচির জল গরম হয়ে বুদ্বুদ উঠতে শুরু ক'রল তখন সিদ্ধ হওয়াও শুরু হল বুঝতে হবে। এই অবস্থায় ২০।২১ মিনিট কাল রেখে ওগুলিকে সিদ্ধ করবার পর ওগুলি জীবাণু-মুক্ত হয়েছে বুঝতে হবে।

যে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখ করা গেল, যেখানে সম্ভব হবে আধুনিক শক্তিশালী যন্ত্রে সেগুলিকে উষ্ণ বাষ্প দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে নেওয়াই হবে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। রোগীর ব্যবহৃত পিকদানি, পাইপ, সিগারেট হোল্ডার, দাঁত-খড়কে, জিব-ছোলা, দাঁতের ব্রাশ—সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।

(২) টেবিল, চেয়ার, খাট, ইত্যাদি সমস্ত কিছু কার্বলিক অ্যাসিড মিশ্রিত গরম জল. সাবান, ক্লোরিন জল ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং রোদে রাখতে হবে। পরে নতুন করে পালিশ করে নিতে হবে।

(৩) ঘরের মেজে, দেয়াল, ইত্যাদি ফিনাইল, গরম সাবান-জল এবং কোনও বিশোধক লোশান (যথা আইজাল বা কম্পাউণ্ড ক্রেশল সলিউশান—জলে ১%) দিয়ে খুব করে ঘষে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কয়েকদিন যাবৎ ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে রেখে রোদ লাগাতে হবে। দেয়ালের বালি খসানো সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজন, তবে নতুন চুনকাম করা দরকার। সালফার ডায়ক্সাইড্ অথবা ফর্মালিন

ভেপার দ্বারাও ঘরকে বিশোধিত করে নেওয়া যেতে পারে। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে মেজের উপর বেশ পুরু করে কয়েকদিন চুন বা ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে রাখাও ভাল। ঘরের মেজে যদি মেটে হয় তবে মেজের উপরকার মাটি চেঁছে তা পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া উচিত। তারপর ঐ মেজে কোনও প্রতিষেধক ওষুধ দ্বারা ঘণ্টা ছয়েক ভিজিয়ে রেখে নতুন মাটি দ্বারা পুনরায় নতুন মেজে প্রস্তুত করতে হবে।

ঘরকে জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটি বা পাব্লিক হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য নেওয়া ভাল। ঘরের হাওয়ার পোকা খুব মরছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঘরে কয়েক মিনিট একটু ধুনো জ্বালালেই কাজ হবে না। ঘরকে উপরোক্ত প্রণালীতে শুদ্ধ করার পর ঘরটি ব্যবহার না করে সমস্ত দরজা জানালা খুলে রেখে কয়েকদিন সূর্যালোক প্রবেশ করতে দিলে অবশিষ্ট জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি দ্বারাও ঘরের বায়ুকে জীবাণুমুক্ত করা যায়। তবে দেয়াল, মেঝে এবং অন্যান্য কোণগুলিকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করবার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাগুলিও অবলম্বন করতে হবে।

যতদিন পর্যন্ত ব্যাধি সক্রিয় অবস্থায় থাকে, ততদিন পর্যন্ত রোগীর পক্ষে শারীরিক শ্রমের কথা ওঠেই না। রোগী কেবল তখনই ধীরে ধীরে একটু একটু করে কিছুটা শ্রমের উপযুক্ত হবেন যখন নাকি সমস্ত উপসর্গগুলি একেবারে কমে গিয়ে শরীর বেশ ভাল হয়ে উঠেছে। সাধারণতঃ অন্যান্য উপসর্গগুলি অপেক্ষাকৃত শীগগীরই কমে আসে, কিন্তু নাড়ীর একটু দ্রুততা এবং বিকেলের দিকে অল্প একটু জ্বর, এইটে কিছুতেই যেতে চায় না। এই অবস্থায় একটু ধৈর্য ধরে বিশ্রামই চালিয়ে যেতে হবে।

থুতু জীবাণুমুক্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে বাঞ্ছনীয় এবং রক্ত পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক হওয়া দরকার। অসুখ ক্রমেই বেশ কমের দিকে চলেছে, পুনঃ পুনঃ এক্স-রে পরীক্ষা দ্বারা এটাও দেখবার দরকার। তাড়াহুড়ো করে ব্যায়াম করতে গিয়ে বহুদিনের চেষ্টায় ভাল-হয়ে-আসা অবস্থাটিকে রোগী মুহূর্তে নষ্ট করে ফেলেছেন এর অনেক উদাহরণ আছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দীর্ঘদিন বিশ্রাম নেওয়া রোগীর পক্ষে বড়ই অস্বস্তিকর হতে পারে; কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এটা সহ্য করতেই হবে। কারণ রোগের অবস্থায় শ্রমের চেষ্টা করলে কবরের দিকেই শুধু এগিয়ে যাওয়া হবে। রোগীর এমন ধারণা মনে পোষণ করা উচিত নয় যে যত বেশী স্ফূর্তিবাজ হয়ে লাফালাফি হৈ রৈ করা যাবে, ততই রোগটা আসবে কাবু হয়ে। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্রামই একমাত্র অস্ত্র যা তীব্রভাবে প্রয়োগ করতে হবে এই দুরন্ত শত্রুর অঙ্গে। রোগী হয়ত এমন গল্প—নিজেদিগকে বিশেষ পণ্ডিত বলে মনে করেন—এমন আত্মীয় বা বন্ধুর মুখে শুনতে পাবেন, বা কোনও দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখকের লেখায় পড়তে পাবেন যে, অমুকের টি. বি. রোগ ঘোড়ায় চড়েই ভাল হয়ে গিয়েছে বা অমুক টি. বি.-গ্রস্ত হয়েও "যা-খুশি-তাই" করে বেড়াচ্ছে—টি. বি. তার কিছুই করতে পারছে না। কিন্তু রোগী যেন মনে রাখেন যে, ঐ সব করে ঘটনাচক্রে এক-টি রোগী যদি কোথাও বেঁচেও থেকে থাকেন কোনও গতিকে, সেখানে লক্ষটি রোগীর ঐ ভাবে হয় প্রাণান্ত, এবং সারবার চাইতে গুরুতর বিপদ মুহূর্তে ডেকে আনবার সম্ভাবনা এসব দৌড়-ঝাঁপের ভিতরে এ রোগীর পক্ষে হাজার হাজার গুণ বেশী।

যখন নাড়ি, টেম্পারেচার ইত্যাদির অবস্থা বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়াবে এবং শারীরিক অন্যান্য অবস্থাও সন্তোষজনক হবে,

তখন প্রথমে শুরু হবে বারান্দায় চেয়ারে ঘণ্টাখানেক করে সকালে বাইরে এসে বসা থেকে। পাঁচ সাত দিন বসবার পরে পাল্‌স এবং টেম্পারেচার যদি না বাড়ে তবে সময়টা ক্রমে বাড়িয়ে ঘণ্টা দুই করতে হবে এবং ক্রমে বিকেলের দিকেও বসা অভ্যাস করতে হবে। এতে যদি কোনও ক্ষতি না হয়, তবে ধীরে ধীরে করতে হবে হাঁটবার চেষ্টা। প্রথমে এক ফার্লং, (৮ ফার্লং-এ এক মাইল হয়), তার পরে দুই ফার্লং, তার পরে তিন ফার্লং—১০।১২ দিন বা ১৫ দিন অন্তর অন্তর এইভাবে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে বাড়িয়ে এক, দুই, বা তিন মাইলও অবস্থানুযায়ী হাঁটা চলবে। এক ফার্লং-এর জায়গায় আধ ফার্লং করে করেও বাড়ান যেতে পারে। হাঁটাটা দূরত্ব দ্বারা নিয়মিত না করে সময় দ্বারাও করা যেতে পারে। যেমন প্রথম কিছুদিন হাঁটা গেল পাঁচ মিনিট করে। তার পরে দশ মিনিট। তার পরে পনের। এই রকম করে করে আধ, এক, দেড় বা দুই ঘণ্টা অবধি ক্রমে শরীরের অবস্থা বুঝে বাড়াতে হবে। এই সময়টাতে লক্ষ্য রাখতে হবে হাঁটবার সময়ে কোনও রকম ক্লান্তি বোধ বা শ্বাস কষ্ট হয় কিনা, এবং হেঁটে আসবার পরেই টেম্পারেচার এবং পাল্‌স যদি একটু বেড়ে থাকে তবে ২০।২৫ মিনিট সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরেই তা স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে আসে কিনা। অসুখ যদি ভালভাবে নিস্তেজ হয়ে থাকে তবে অল্প একটু আধটু চলা-ফেরা বা পরিশ্রমের পরে পাল্‌স বা টেম্পারেচার তেমন বিশেষ কিছু আর বাড়ে না। যখনই বেড়ানর ফলে 'পালস' বা 'টেম্পারেচার' বাড়তে দেখা যাবে—তখনই আবার পূর্ণ বিশ্রাম করতে হবে কয়েকদিনের জন্যে। অথবা বেড়ানোটাকে কমিয়ে দিয়ে আরও ধীরগতিতে সেটাকে খুব সাবধানে বাড়াতে হবে। রোগীর কখনও জোরে জোরে হাঁটা উচিত নয়। কোনও অবসরপ্রাপ্ত বহুমূত্রগ্রস্ত সরকারী চাকুরিয়াকে ছড়ি হাতে

করে সকাল বা সন্ধ্যের দিকে কোনও পার্কে-টার্কে বেড়াতে কি রোগী কখনও দেখেছেন? ঐ ভাবে হাঁটতে হবে আর কি! দৌড়ানো তো ভুলেও চলবে না। প্রথম প্রথম সমতল ভূমিতেই হাঁটবার অভ্যাস করতে হবে। বেশী উঁচু সিঁড়িতে ওঠা-নামা বা শরীরের আরও ভাল অবস্থায় পাহাড়ের উঁচু-নীচু রাস্তায় ভ্রমণ—ইত্যাদি সবই রয়ে-সয়ে— ধাপে ধাপে করতে হবে। রোগীর পক্ষে প্রশস্ত পদচারণ-রূপ ব্যায়াম গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় হচ্ছে সকাল, এবং অভ্যাস হয়ে যাবার পরে তার সঙ্গে বিকাল। কিন্তু দুপুর রোদে বেরুন একেবারে ভুল। হুটোপুটি না করে যত নিয়ম মতন ব্যায়ামটি গ্রহণ করা যাবে, ততই জ্বর প্রভৃতি উপসর্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা কম থাকবে। ব্যস্তবাগীশ হতে গেলেই পস্তাতে হবে। একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল। এই রোগের চিকিৎসায় বিশ্রাম এবং উপযুক্ত সময়ে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যায়াম— উভয়েরই প্রয়োজন। চিরকালই কেবল শুয়ে কাটাতে হবে তা নয়, এবং চিকিৎসকের বিচার অনুযায়ী উপযুক্ত অবস্থায় ব্যায়াম গ্রহণ না করাটাও ক্ষতিকর। বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের সাম্য দ্বারাই দেহকে ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা হয়ে থাকে। তবে ব্যায়ামের সীমা এবং প্রকৃতি বিভিন্ন রোগীর পক্ষে বিভিন্ন প্রকার। বিশ্রামের অবস্থা থেকে রোগীকে ক্রম-ব্যায়াম দ্বারা কর্মঠ করে তুলবার ভিতরে চিকিৎসার একটি বিশেষ সার্থকতা নিহিত রয়েছে, এবং যথাকালে "ক্রম-ব্যায়াম" চিকিৎসার একটি অঙ্গ বিশেষ। এই রোগের এক অবস্থায় যেমন সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রম-ব্যায়ামেরও তেমনই প্রয়োজন। কাজেই রোগী এটা যেন মনে রাখেন যে যখন চিকিৎসক তাঁকে ধীরে ধীরে চলা-ফেরা অভ্যাস করতে বলেছেন তখন তিনি অতি সতর্ক হতে গিয়ে তার ত্রুটি করে চিকিৎসার বিশেষরূপ অঙ্গ-

হানি না করে বসেন। বিশ্রাম দ্বারা রোগীর জড়তা সম্পাদন এবং তাঁকে নতুন কোনও উপসর্গ-প্রবণ করে তোলা চিকিৎসার উদ্দেশ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে কার যে কতদিন অবধি বিশ্রাম নিতে হবে এবং কে যে কতখানি পরিশ্রম সহ্য করতে পারবে—তা বুকের অবস্থার উন্নতির অনুপাতই নির্দেশ করে দেবে। ব্যাধি যদি বেশী দূর না এগিয়ে থাকে এবং উপসর্গগুলি যদি চট্ করে কমে আসে, তবে হাঁটা-চলাটা সেই অনুপাতেই শীগ্‌গীর শুরু করা যায়। হয়ত চিকিৎসা শুরু হবার পরে দু চার মাস বা পাঁচ ছয় মাসের ভিতরেই এটা সম্ভব হবে। কিন্তু বুকের অবস্থা যদি অন্য রকম হয় এবং চিকিৎসায় দ্রুত সাড়া না পাওয়া যায় তবে এক বছর, দু-বছর অবধিও বিছানায় পড়ে থাকতে হতে পারে! চিকিৎসা-অন্তে কেউ কেউ বা ক্রমান্বয়ে বেশ কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন, আবার কারুর কারুর বা অতটা পরিশ্রম আর সহ্য হয় না। বুকের ক্ষত ভালো করে সারা না সারার উপরেও পরিশ্রমের ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করে।

হাঁটা চলা করবার অবস্থাতে এলেও রোগী যেন ভুলেও না মনে করেন যে তিনি সারাদিনই যা খুশি তাই করতে পারেন, বিছানার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে। বিছানার সঙ্গেই যক্ষ্মারোগীর সব চেয়ে নিকট এবং আজীবনের সম্পর্ক। রোগী বিপজ্জনক অবস্থা অতিক্রম করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকলেও দিনের ভিতর খানিকটা সময় তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতেই হবে। এক হচ্ছে, হেঁটে ঠিক ফিরে আসবার পরেই আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা। এই সময়টা রোগী খবরের কাগজ, বই পড়া অথবা কারুর সঙ্গে হাসি-গল্প-করা-রূপ "বিশ্রাম" না নেন। বিশ্রাম মানে শরীর মন সব এলিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর চোখ বুজে পড়ে থাকা। তারপরে আর একটি বিশ্রামের সময় হচ্ছে খাওয়ার আগে—

অবস্থা বুঝে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা। অনেক সময়ে খাওয়ার পরে অনেক রোগীর টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যায়, পাল্‌স বেড়ে যায়, মুখ চোখ কান গরম হয়ে ওঠে। খাওয়ার আগে বিশ্রাম নিলে এ সব দ্বারা উপদ্রুত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। আর একটি কথা, বেড়িয়ে এসেই অথবা অন্য যে কোনও ভাবে পরিশ্রান্ত হয়ে অমনি খেতে বসার চেষ্টা রোগী যেন ভুলেও না করেন। ভাত, তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে যাক—তবুও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তিটাকে দূর না করে যেন টি-বি রোগী কখনই খেতে চেষ্টা না করেন। তারপরে আরেকটি "সম্পূর্ণ বিশ্রামের" সময় হচ্ছে খাওয়ার ঠিক পরেই। দুপুর বেলাকার খাওয়া শেষ করে অবস্থা বিশেষে এক থেকে তিন ঘণ্টা চুপ-চাপ শুয়ে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবার পরেও দুপুরে খাওয়ার পরে খানিকটা সময় বিশ্রামের অবহেলা রোগী দীর্ঘকাল অবধি করতে পাবেন না। তারপরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরেও খানিকক্ষণ বিশ্রামের দরকার।

রোগীর অনেক সময়ে একটা সমস্যা উপস্থিত হয় এই নিয়ে, যে, চিকিৎসার জন্যে বাড়ীতেই থাকা উচিত, না-কি, কোনও স্যানাটোরিয়ামেই যাওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিকে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা স্যানাটোরিয়ামে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় স্যানাটোরিয়ামের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ লোকের, এমন কি অনেক চিকিৎসকেরও নানারূপ অজ্ঞতা আছে। স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন।

প্রথমতঃ স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসা প্রণালী। টি-বির চিকিৎসায় "বিশ্রামে"র মূল্য সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে বলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, শুধু বিছানায় শুয়ে থাকলেই যে বুকের সম্পূর্ণ বিশ্রাম সব সময়ে হয় তা নয়। যখনই রোগী কাশেন বা কথা বলেন বা হাসেন বা উঠে

বসেন—তখনই ফুসফুসের কিছু না কিছু পরিশ্রম হয়। আর, এগুলো সম্পূর্ণ এড়াতে পারাও নিতান্ত কঠিন। তা ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসটাই ফুসফুসের পক্ষে একটা পরিশ্রম। শুয়ে থাকবার ফলে আংশিক বিশ্রাম যা হয়, তা রোগের উপশমের পক্ষে সব সময়ে পর্যাপ্ত নয়। কখনও হয়ত উপকার হতে অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়, কখনও কখনও বিশেষ কিছুই কাজ হয় না—বিশেষ করে ফুসফুসে যখন "ক্যাভিটি"র সৃষ্টি হয়েছে। ("ক্যাভিটি" হচ্ছে ফুসফুসের ভিতরে গর্তের অবস্থা। ফুসফুসে ব্যাধিজনিত ক্ষতস্থান থেকে গয়ের, পুঁজ ইত্যাদি বেরুতে বেরুতে ক্রমে এই গর্তের সৃষ্টি হয়। যক্ষ্মাজীবাণু ফুসফুসের উপাদানের ধ্বংস সাধন করে এবং এইগুলি রূপান্তরিত অবস্থায় ঘন গয়েরের সঙ্গে শ্বাসনালীর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে—ফুসফুসের ভিতর ছোট থেকে ক্রমান্বয়ে বড় "ক্যাভিটি উৎপাদন ক'রে।) কিন্তু স্যানাটোরিয়ামে আধুনিক পদ্ধতিতে বিশেষ অস্ত্রচিকিৎসা বা অন্য এমন সব উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে, যা দ্বারা রোগী অধিকতর উপকৃত হতে পারেন এবং যার সুফল শীগ্‌গীরই প্রকাশ পায়। কোনও একটা উপসর্গ প্রবল হয়ে উঠলে তাকে সত্বর প্রশমিত করবার আয়োজন স্যানাটোরিয়ামে সর্বদাই থাকে এবং হাতের কাছে বিচক্ষণ চিকিৎসককে সর্বদা পাবার দরুন রোগীর মনে যথেষ্ট সাহস থাকে। নানা বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এই ব্যাধির আধুনিক উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতির সর্ববিধ সুবিধা পাওয়া একজন রোগীর পক্ষে একমাত্র স্যানাটোরিয়ামেই সম্ভব। ইঞ্জেক্‌শানে এবং অপারেশানে এই চিকিৎসাগুলির ব্যবস্থা অধিকাংশই এমন, যেগুলি চলবার সময়ে সর্বদা ডাক্তারের চোখে চোখে থাকবার দরকার হয় এবং অনেক সময় এমন সব উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়, যার প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া দরকার। মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র রোগীর পক্ষে বাইরে থেকে এসব কদাচিৎ সম্ভব হয়

এবং রোগী নিজের অবস্থা বিপজ্জনক করে তোলে। তারপরে রোগীকে স্যানাটোরিয়ামে আবশ্যকমত এত বার এত উপায়ে পরীক্ষা করা হয় এবং তার চিকিৎসা এবং আরোগ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়—যে সবের ব্যবস্থা অনেক রোগীর পক্ষে বাড়ীতে থেকে করা অসম্ভব। রোগীর বিশ্রামের অবস্থা থেকে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যাবার কথা বলা হয়েছে। আমি যা কিছু বলেছি, একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্যেই। কিন্তু বিশ্রামের অবস্থা থেকে পরিশ্রম শুরু করবার সময়ে রোগীর দায়িত্ব যে কতখানি, কত সতর্কতার সঙ্গে যে তাঁকে অগ্রসর হতে হবে, তা বুঝিয়ে বলবার নয়। বুকের অবস্থার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে এবং রোগী কিছুই জানতে পারেন না যে, তাঁর বুকের অবস্থা কি রকম—এমন কি বাইরের সমস্ত লক্ষণ যথেষ্ট ভাল থাকলেও হঠাৎ একদিন গিয়ে একজন ডাক্তারকে দিয়ে বুক পরীক্ষা করিয়ে এলে কিছুমাত্র সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসক দীর্ঘদিন রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যে ব্যবস্থা দিতে সক্ষম হন, সেটাই একমাত্র নিরাপদ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়তঃ, রোগীর পরিচর্যা। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই রোগ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা এত বেশী যে তা বলবার নয় এবং এই অজ্ঞতার ফলে রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসা সব ক্ষেত্রে বাড়ীতে হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। যাঁদের হাতে এই রোগীর সেবার ভার থাকে, তাঁদের দুইটি কর্তব্য: একটি—রোগীকে সুস্থ করে তুলবার চেষ্টা এবং আর একটি—পরিবারের অপর সবাইকে নিরাপদে রাখবার চেষ্টা। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা গিয়েছে যে, এই দুটোর কোনওটাই বাড়ীতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। নানা মুনি আসেন নানা মত দিতে, রোগীকে নিয়ে চলে ছেলেখেলা। রোগের গুরুত্ব পারেন না কেউ সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে, রোগীর প্রতি চলে বহু অবিচার এবং

একভাবে নয়, নানাভাবে রোগীর উন্নতির মূলে করা হয় কুঠারাঘাত—শুধু এই বহুবিধ অজ্ঞতার ফলে। এবং কেবল যে দরিদ্র রোগীদের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে তা নয়, বহু সময়ে সঙ্গতিসম্পন্নের ক্ষেত্রেও।
তৃতীয়তঃ, একটি স্যানাটোরিয়ামে রোগীর অনেক কিছু শিখবার, জানবার, বুঝবার আছে যা নাকি তাঁকে ভবিষ্যতে নিজেকে সাবধানে রাখতে এবং অপরকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করতে সাহায্য করে। এই রোগটা একটি দিন, দুটি দিন, দুটি মাস অথবা ছ'টি মাসের ব্যাপার নয়। অনেক সময় একটি লোকের সমস্ত জীবনটাই ওলট্-পালট্ হয়ে যায় এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে। এই রোগের এমনই মজা যে, নিজেকে সুস্থ 'করা' বহু কষ্টে যদি বা সম্ভব হয়, তার চেয়ে আরও কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় নিজেকে সুস্থ 'রাখা'। একবার এই ব্যাধিগ্রস্ত হবার পরে ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকখানি অংশকে, এমন কি কোনও কোনও সময়ে সমস্ত ভবিষ্যৎকেই নতুন করে গড়ে তুলবার প্রয়োজন হয়। জীবনকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার সম্পূর্ণ শিক্ষা স্যানাটোরিয়াম-বাসের অভিজ্ঞতা থেকেই ভালভাবে হতে পারে—বাইরে থেকে এক আধজনের মুখে একটু শুনে এটি হয় না।
চতুর্থতঃ, স্যানাটোরিয়ামে একজন টি. বি. রোগী এমন বহু রোগীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান, যাঁরা অত্যন্ত খারাপ অবস্থা নিয়ে এসে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এঁদের দেখে রোগী উৎসাহ পান। আর, অনেক রোগীকে তাঁর নজরে পড়ে যাঁদের শারীরিক বা অন্য কষ্ট তাঁরই মতন, বা তাঁর চাইতে অনেক বেশী। এটাতে তিনি অনেক সময় নিজের দুঃখ ভুলবার সুযোগ পান। বাড়ীতে থাকবার সময়ে রোগী দেখতে পান যে, তিনি বাদে আর সবাই সুস্থ এবং সবাই বেশ স্ফূর্তি আর আমোদে রয়েছেন। এটা তাঁর মনে একটা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি করে। স্যানাটোরিয়ামে তাঁর মত বহু লোকেই যে কড়াকড়ির ভিতরে থাকে, সেই কড়াকড়ি মেনে চলা তাঁর মনের উপরে খুব বিরুদ্ধ ক্রিয়া করে না এবং রোগী নিজের খেয়াল মত যা খুশি তাই করবার সুযোগ না পেয়ে ধীরে ধীরে এবং অবাধে আরোগ্যের পথে চলতে থাকেন। তাঁর কোনও রকম অধৈর্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতাই এখানে প্রশ্রয় পাবে না—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবার একটা ভীষণ প্রতিযোগিতার মাঝখানে।

অবশ্য আমাদের দেশের স্যানাটোরিয়ামের দোষ ত্রুটি যে কিছুই নাই, একথা নিশ্চয়ই সত্য নয়। এদেশের স্যানাটোরিয়াম হাসপাতালে যে অনেক সময় অনেক অসুবিধাই সহ্য করতে হয়, এটা মিথ্যা নয়। অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারে কোনও কোনও অবিবেচক ডাক্তারের অনেক রকম মন্তব্য রোগীকে পীড়িত করে, কোনও কোনও কর্তব্যজ্ঞানহীন নার্স বা ওয়ার্ড-অ্যাসিস্ট্যাণ্টের অনেক দুর্ব্যবহার, অবহেলা, ঔদাসীন্য বা রূঢ়তা তাঁর মনকে তিক্ত করে তোলে—এ-ও ঠিক। বিশেষ করে আরেকটি কথা, স্যানাটোরিয়ামের রান্নাটা অনেকেই তেমন রুচির সঙ্গে খেতে পারেন না এবং খাওয়া নিয়ে যে অভিযোগ লেগে থাকে প্রায়ই তাও বহু জানা যায়। তা ছাড়া কারুর কারুর কাছে আরও হয়ত ছোট-খাট অসুবিধা থাকে, ছোট খাট আরামের অভাব থাকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে চট করে কোনও বিরুদ্ধ কথা বলতে একটু ইতস্ততঃ করতে হয় এই জন্যে যে বাইরে স্যানাটোরিয়ামের মতন ব্যবস্থা করে নিজের চিকিৎসা চালান বড় সহজ কথা নয়। স্যানাটোরিয়ামের বাইরে রোগীর বিড়ম্বনা ঘটতে পারে আরও বেশী। অবিশ্যি একথা সর্বদাই স্বীকার্য যে, কোনও স্যানাটোরিয়াম হাসপাতালে রোগীদের প্রতি কারুরই কোনও রকম অকারণ দুর্ব্যবহার, কোনও রকম অমনোযোগিতা,

THERAPY OF TUBERCULOSIS WITH

PAS-CILAG

MEANS :

Intensive tuberculostatic action verified by numerous original clinical reports—

Excellent tolerability on account of absolute chemical purity—

Exact and individual dosage with a complete range of presentations :

Granules	**65 %**
Pills	**0.3 gm.**
Tablets	**0.5 gm.**

for peroral administration, containing ANHYDROUS ACID of 25% higher therapeutic efficacy in comparison with equal doses of Sodium Salt

Ampoules 10 and 2 cc. 20%

for intravenous and intra-thoracic application respectively

Supplies of PAS-CILAG have arrived and will shortly be available from our Sole Distributors:-

HIND CHEMICALS LTD., 104, Apollo Street, Bombay, 1, or through their stockists all over India.

CILAG - HIND LIMITED

MUBARAK MANZIL, APOLLO STREET, BOMBAY, 1.

NAS 517

কোনও রকম কর্তব্যে শিথিলতা কিছুতেই ক্ষমার্হ নয় এবং স্বীকার করব যে আমাদের দেশের অধিকাংশ, অধিকাংশ কেন—সবগুলি স্যানাটোরিয়াম হাসপাতালই এখনও যথেষ্ট সংস্কারের অপেক্ষা রাখে এবং এ-ও অস্বীকার করব না যে এদেশে এগুলির পরিচালকদের ভিতরে এখনও বহু সততা, আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তার প্রয়োজন একান্তভাবেই আছে। তবে এক ধরনের লোক আছেন যাঁদের অতি তুচ্ছ কতকগুলি বিষয় নিয়ে খুঁত ধরা এবং অভিযোগ করাই স্বভাব এবং এসব রোগীর নিজেদের চরিত্রে আরও এমন কতকগুলি ত্রুটি আছে যেগুলির জন্যে স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাঁদের উপর বিরক্ত না হয়ে পারেন না। তাছাড়া একথাও বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি যে রোগীরা স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে এমন চিকিৎসক, নার্স বা ওআর্ড-অ্যাসিস্টেণ্টের সংস্রবেও হয়তো অনেক সময় আসবেন যাঁদের মহত্ত্বের বা সদ্‌গুণের কোনও তুলনা হয় না।

যাঁরা সঙ্গতি-সম্পন্ন, তাঁরা স্যানাটোরিয়ামে প্রচুর বিলাসিতা করতে পারেন। দু একজন আত্মীয়, বন্ধুও সঙ্গে নিতে পারেন, নিজেরা নিজেদের চাকর-বাকর বা নার্স রাখতে পারেন, নিজেদের খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেরা করতে পারেন, সময় কাটাবার জন্যে নিজেদের গ্রামোফোন, নিজেদের রেডিয়ো বা অন্য কিছু রাখতে পারেন। প্রায় সব স্যানা-টোরিয়ামেই নানারকম শ্রেণীবিভাগ আছে, যিনি যে ক্লাসে যত ইচ্ছা খরচা করে থাকতে পারেন। দরিদ্র যে, তার কষ্ট এবং অসুবিধা এদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সর্বত্রই; এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। দরিদ্রের প্রতি সুবিচার হবার দিন আমাদের দেশে আসতে এখনও বহু দেরি।

যাই হোক, প্রথমটা স্যানাটোরিয়ামে থাকাই বহু রোগীর পক্ষে যে

সর্বতোভাবে সুবিধাজনক এবং মঙ্গলজনক এই মত প্রকাশ করা—সব কিছুই বিশেষভাবে বিবেচনা করে—সব দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। লেখাপড়া শিখবার ব্যাপারেও যেমন বাড়ীতে থেকে পড়বার চাইতে স্কুল, কলেজে ভর্তি হওয়াই বহু রকমে ভাল ও সুবিধাজনক, টি. বি. রোগে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাটাও সেই রকম আর কি। স্যানাটোরিয়ামে রোগীর অনেকখানি দায়িত্ব থাকে উপযুক্ত লোকের হাতে এবং দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রণালীগুলি নিয়েও রোগীর নিজের মাথা ঘামিয়ে মরতে হয় না। সাংসারিক গোলমাল থেকে দূরে থেকে তাঁর মনও অনেকটা বিশ্রাম পায়। অনেকের পক্ষে প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবার একটা বেদনা আছে, কিন্তু পরিবারের শিশু এবং অন্যান্য সবাইকে নিরাপদে রেখে রোগী যে অন্যত্র নিজেকে সুস্থ করে তুলবার প্রচেষ্টায় রয়েছেন এ চেতনা দ্বারা রোগীর খুশি থাকা উচিত এবং তাঁর আত্মীয় বন্ধুদেরও। রোগীর উপরেই পরিবারের ভরণ-পোষণ বা অন্যান্য ব্যবস্থা নির্ভর করত এ রকমটা যদি হয়, তবে রোগীর অনুপস্থিতির দরুন সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটা বিচিত্র নয়; কিন্তু এটা শুধু সাময়িক। আশা করে থাকতে হবে রোগী ভাল হয়ে ফিরে এসে আবার সবার কথা ভাববেন। রোগী এবং তাঁর পরিবারের লোকের মনে রাখা উচিত : এই পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়—একজন বাদ গেলেও সংসারে চলে যাবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে!

কোনও কোনও রোগী হয়ত স্যানাটোরিয়াম-জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কিছুতেই সক্ষম হন না; কিন্তু এটা সত্যি কথা, অসংখ্য রোগীই এই বলে আক্ষেপ করেন যে একেবারে ষোল আনা সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কেন তাঁরা স্যানাটোরিয়ামে থাকবার সুযোগ পাচ্ছেন না।

তবে এখানে একটি বিষয় বলবার আছে। অনেক সময়ে অন্যান্য রোগীর যন্ত্রণা বা মৃত্যুই অনেকের মনের উপর বেশী ক্রিয়া করে ; যাঁরা ভাল হয়ে যান তাঁদের তাঁরা গণনার মধ্যে আনেন না বা তাঁদের দিকে তাকিয়ে সাহস পান না। স্যানাটোরিয়ামে রাখবার ফলে যে সব রোগীর এই সব কারণে মানসিক ক্রিয়া অত্যন্ত খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে এবং এসবের বিভীষিকা যদি রোগীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে, তা হলে সেই সব "নার্ভাস্" রোগীকে স্যানাটোরিয়ামে স্থানান্তরিত করা প্রকৃতপক্ষে সঙ্গত কিনা এটা ভাববার বিষয়। তবে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা খুবই কম এটা বলা বাহুল্য। স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারেন বলে "কটেজ" বা "ক্যাবিনের" রোগীরা "জেনারেল ওআর্ডের" রোগীদের চাইতে এ বিষয়ে অনেক বেশী সৌভাগ্যবান। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে থাকবার সুবন্দোবস্ত রোগীর আর্থিক অবস্থার উপরেই শুধু নির্ভর করে।

স্যানাটোরিয়ামে যে সব রোগী চিকিৎসিত হন তাঁদের কারুর কারুর মধ্যে একটা প্রধান ত্রুটি অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়—তাঁরা বড় টিউবার-কুলোসিস মনোভাবাপন্ন হয়ে যান। টি-বির গল্পই তাঁদের ভিতর বড্ড বেশী চলে, এবং টি-বির ব্যাপারগুলোই তাঁদের অন্যান্য সব চিন্তা বা কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রাখে। টি-বি ছাড়া তাঁদের কাছে আর যেন কোনও সমস্যা থাকেনা এবং বাইরের লোকের কাছেও অনেক সময় একটু বিরক্তিজনকভাবে তাঁরা টি-বির আলোচনা করেন। অবিশ্যি সবাই-ই যে এ রকম হন তাও ঠিক নয়। যাই হোক, দীর্ঘকালব্যাপী একটি উৎকট ব্যাধির নিরবচ্ছিন্ন চেতনা এবং অভিজ্ঞতা এসব রোগীদের মনটাকে যে খানিকটা এই ধরনের করে দেবে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং এর জন্যে তাঁদের দোষও দেওয়া চলেনা সব সময়।

রোগটা যখন টি. বি.—

পূর্বকালে টি. বি. রোগের চিকিৎসা-প্রণালী যেমন ছিল অদ্ভুত, তেমন বিপজ্জনক। ধমনী বা শিরা থেকে রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা অতি সচরাচর করা হত; ব্যবস্থা করা হত হরেক রকম বাজে ওষুধের; অনেকগুলি রোগীকে একত্র করে রেখে দেওয়া হত গরম ঘরের ভিতরে, ইত্যাদি।

একশ বছরেরও কিছু বেশী আগে জর্জ বডিংটন টি-বির চিকিৎসায় বিশ্রাম এবং মুক্ত বায়ুর বিষয় সর্বপ্রথম প্রচার করেন, কিন্তু তাঁর মতামত সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধ সমালোচনা হয় যে, তিনি অতিমাত্রায় নিরুৎসাহ হয়ে ইংল্যাণ্ডে সাটন্ কোল্ডফিল্ড-এ তাঁর নিজের স্থাপিত হাসপাতাল নিজেই তুলে দিয়ে সেটিকে পরিণত করলেন একটি পাগলা হাসপাতালে। কিন্তু এর পনের বিশ বছর পরে জার্মান চিকিৎসক হার্মান ব্রেমার দক্ষিণ জার্মেনীতে একটি স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করে বিশ্রাম, মুক্ত-বায়ু এবং ক্রমব্যায়াম দ্বারা টি-বি রোগের চিকিৎসা করতে লাগলেন, সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করে। এইটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম যক্ষ্মানিবাসরূপে পরিচিত এবং স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার গোড়াপত্তনের সঙ্গে ব্রেমারের নামই সর্বপ্রধান ভাবে জড়িত। কিন্তু বিশ্রামের উপর আরও বেশী জোর দিয়ে অধিকতর বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং সুসম্বদ্ধভাবে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাকে নিয়ন্ত্রিত করলেন ডেট্‌উইলার এবং তাঁর আরও পরে—পেটারসান। ব্রেমারের বিশ বছর খানেক পরে আমেরিকায় স্বনামধন্য চিকিৎসক এড্‌ওআর্ড লিভিংস্টোন ট্রুডো সর্বপ্রথম স্যারানাক লেক এ অ্যাডিরন্‌-ডাক্‌স্ পাহাড়ে কটেজ স্থাপন করে য়ুনাইটেড্ স্টেটস্-এ স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার সূত্রপাত করলেন। আস্তে আস্তে এই রকম করে শুরু হয়ে এখন তো স্যানাটোরিয়ামে দেশ ছেয়ে গিয়েছে।

যক্ষ্মারোগ নির্ণয়ে, যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় এবং যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন

তথ্য প্রচারে কত জনের যে কত রকম কৃতিত্ব আছে, তার অন্ত নাই এবং কোনটিরই মূল্য কম নয়। যক্ষ্মাজীবাণুর আবিষ্কর্তা রবার্ট কখ্-এর কথা আমি বলেছি। তাঁর আবিষ্কারের একশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রেনে থিওফিল হায়াসিন্থ ল্যেনেক। এই প্রতিভাশালী তরুণ ফরাসী চিকিৎসক আবিষ্কার করেন স্টেথোস্কোপ তিনি এই ব্যাধিসংক্রান্ত নানা বিষয় জানতে চেষ্টা করেন এবং এর নানা বিষয়ে অনেক আলোকপাত করেন। ল্যেনেকেরও আগে ফুস্‌ফুসে গুটিকার উৎপত্তি, তার সঙ্গে যক্ষ্মার সম্পর্ক, বুকে ক্যাভিটি বা গর্তের স্থষ্টি - পরপর ইত্যাদি বিষয়গুলির সন্ধান দিলেন এক একজনে (সিল্‌ভিয়াস, মর্টন, বেইলি···ইত্যাদি)। কখ্-এর আবিষ্কারের কয়েক বছর পরে জর্জ করনেট দেখালেন যে, যক্ষ্মারোগীদের ব্যাধি যখন সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং তাদের প্রচুর পরিমাণে গয়ের উঠতে থাকে, তখন তার ভিতর লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মাজীবাণু পাওয়া যায়। অত্যন্ত অসাবধানতার সঙ্গে যেখানে সেখানে নিক্ষিপ্ত গয়ের অপর সুস্থদেহীদের ভিতরে করে ব্যাধির বিস্তার এবং এই গয়ের পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দিলে আর কোনও ভয় থাকে না। কর্নেট-এর প্রদর্শনের পরে যত্রতত্র থুতু ফেলা, একই পাত্রে সকলের পানীয় গ্রহণ, অসাবধানতার সঙ্গে কাশা এবং হাঁচা ইত্যাদির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী শিক্ষাপ্রচার আন্দোলন হল। বছর পঞ্চাশেকের সামান্য কিছু বেশী আগে ভিলহেল্‌ম্ কন্‌রাড্ র‍্যাণ্ট্‌গেন এক্স-রে উদ্ভাবন করেন। তখন অবিশ্যি শরীরের কোনও হাড় মটকে গেলে, যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও সৈনিকের শরীরের কোথাও গুলি বিঁধলে এই সব ধরনের জিনিস দেখবার জন্যেই চিকিৎসাক্ষেত্রে এক্স-রের বেশী চলতি ছিল। ক্রমেই এক্স-রের প্রয়োজনীয়তা বহুভাবে বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে টি. বি. রোগীর বুকের

অবস্থা নির্ণয়ে ত' বর্তমানে এক্স-রে একেবারে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূর্যালোক দ্বারা অস্থির যক্ষ্মা-চিকিৎসা-প্রবর্তক সুইস্ সার্জেন ডাঃ এ. রোলিয়ের কথা আগেই বলেছি। লেজাঁতে তাঁর স্থাপিত ক্লিনিক এখন বিখ্যাত স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হয়েছে। এতদ্ভিন্ন কেউ দেখালেন যক্ষ্মাজীবাণুর দুরকম টাইপ্‌কে ভাগ করে (হিউম্যান টাইপ এবং বোভাইন টাইপ) এবং দেখালেন যে গো জাতীয় জীবাণুও মানুষের দেহে ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে (থিয়োবাল্ড্ স্মিথ)। দেহে যক্ষ্মা-জীবাণু-সংক্রমণ ঘটেছে কিনা তা পরীক্ষার উন্নত উপায় দেখালেন আরেকজন (ক্লিমেন্স ভন পিরকেট)। কারুর নাম বা জড়িত হয়ে রইল পৃথিবীর প্রথম টিউবারকুলোসিস্ ডিস্‌পেন্সারি স্থাপন করবার ব্যাপারে (এডিন্‌বরায় সার রবার্ট ডব্লিউ ফিলিপ)। জনসাধারণের সহযোগিতা যাতে যক্ষ্মা রোগ নিবারণী কার্যে আসে এই উদ্দেশ্যে সহজ পুস্তিকাদি লিখে সর্বসাধারণের ভিতর এই ব্যাধি নিবারণ সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যের প্রচারে কেউ-বা হলেন অগ্রণী (নিউ-ইয়র্কে ডাঃ হারম্যান এম. বিগ্‌স্)। কেউবা টি-বির হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করবার জন্যে লাগলেন মাথা ঘামাতে (ফ্রান্সে প্রফেসার গ্র্যানসার)। আরও নানা বিষয়ের আবিষ্কার এবং প্রয়োগের ব্যাপারে আরও অনেকেই অবিশ্মি রয়েছেন। যাই হোক, চরক, সুশ্রুত বা হিপোক্রাটিস-এর আমল থেকে শুরু করে বহুজনেই এই ব্যাধি সংক্রান্ত বহু নতুন বিষয়ের সন্ধান দিয়েছেন, এবং আজও দিচ্ছেন। আশা করা যায়, আরও বহু সাধক মনীষীদের অক্লান্ত গবেষণা-প্রসূত ফলাফল এই ব্যাধি সংক্রান্ত আরও অভিনব তথ্যের উদ্‌ঘাটন করে দেবে ভবিষ্যতে।

আঠারশ-আশী থেকে উনিশশো দশ খ্রীষ্টাব্দ অবধি স্যানাটোরিয়াম

চিকিৎসার দোলা দুলত নানাভাবে। কখনও শুধু উঠত হাওয়া খাওয়ানরই ধুয়ো, শীতে এবং গ্রীষ্মে রোগীকে একেবারে জমিয়ে অথবা একেবারে পুড়িয়ে; কখনও অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে উপেক্ষা করে রোগীদের একেবারে ঠেসে দুধ-ডিম খাইয়ে, দিনের ভিতর আট দশ বার ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা করে উঠত শুধু ওজন বাড়ানোর ধুয়ো; কখনও বা উঠত অতিরিক্ত পরিশ্রম করানর ধুয়ো। জার্নাল অব আউটডোর লাইফ-এ ক্যালিফোর্নিয়ার এক বৃদ্ধ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন : তিনি যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে পঞ্চাশ বছর আগে রক্তবমির অবস্থায় সারানাক লেক-এ ডাঃ ট্রুডোর স্যানাটোরিয়ামে যখন চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতি প্রথমেই ব্যবস্থা হয়েছিল প্রত্যেক দিন অন্ততঃ তিন মাইল করে বেড়াবার—আবহাওয়ার অবস্থা যা-ই থাকুক না কেন। বুড়ো নিতান্ত বরাত-জোরেই এই রকম অসঙ্গত চিকিৎসায়ও বেঁচে উঠেছিল!

আজকাল নানা রকম অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ফলে মাত্রা ছাড়িয়ে সব কিছু করবার ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন হয়েছে এবং চারিদিকে একটা সাম্য এবং সামঞ্জস্যের মাঝখানে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা রোগীদের মঙ্গলজনকভাবে বেশ সন্তোষজনক পথে চলেছে।

কোনও স্যানাটোরিয়ামে সব সময়েই যে জায়গা খালি থাকে, তা নয়। রোগীর দরখাস্ত গ্রহণ-যোগ্য হলেও সঙ্গে সঙ্গেই রোগী স্যানাটোরিয়ামে বিছানা পাবেন – এমন নাও হতে পারে। যত শীঘ্র তিনি জায়গা পেয়ে যাবেন ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গলজনক, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই যখন কম বেশী বিলম্ব করতে হয়, তখন যতদিন পর্যন্ত স্যানাটোরিয়ামে রওনা হবার আদেশ না আসে এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁকে বাড়ীতে অপেক্ষা করতে হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁর খুব সাবধানে থাকা উচিত এবং

কোনও রকম অনিয়ম অত্যাচারে রোগ যাতে বেশী দূর অগ্রসর হবার সুযোগ না পায়, আন্তরিকতার সঙ্গে সে চেষ্টা করা উচিত। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর আহার, মুক্ত বায়ুতে অবস্থান—এই সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, এবং সম্ভব হলে এই সময় বিশেষজ্ঞের চিকিৎসাধীন থাকলে অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ার চেয়ে কমবার সম্ভাবনাই বেশী। এই সময়ে রোগী এই ব্যাধি সম্বন্ধে সুলিখিত দু একখানি পুস্তকও পড়তে পারেন নানা জ্ঞান লাভের জন্যে।

স্যানাটোরিয়ামে যাবার জন্যে যদি রোগী মনস্থির করে ফেলেন তবে তাঁকে এই ভাবে অগ্রসর হতে হবে: রোগী যে স্যানাটোরিয়ামে যেতে চান প্রথমে সেখানে চিঠি লিখে ভর্তির এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের ফরম্ আনাতে হবে। যথাযথভাবে পূরণ করে আবার এগুলি ওই স্যানাটোরিয়ামের অধ্যক্ষ অথবা মেডিক্যাল অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। রোগী দরখাস্তের ফরম আনাবার সঙ্গে স্যানাটোরিয়ামের একটা পরিচয়-পত্রও চেয়ে পাঠাতে পারেন, এই পত্রে স্যানাটোরিয়ামটিতে কত রকমের থাকবার বন্দোবস্ত আছে, কোন্ শ্রেণীর কি ভাড়া, কি রকম স্থানে স্যানাটোরিয়ামটি অবস্থিত এবং এর কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুনের অনেকগুলি জ্ঞাতব্য সংবাদ রোগী পাবেন। অধিকাংশ স্যানাটোরিয়ামেই সম্পূর্ণ বিনা খরচায় কিছু কিছু রোগী রাখবার বন্দোবস্ত আছে। যে সব রোগী অত্যন্ত দরিদ্র, তাঁরা এই সব "ফ্রী-বেড্"-এর জন্যে চেষ্টা করতে পারেন।

স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার কল্পনা যাঁরা করবেন, তাঁরা যেন একটি বিষয় স্মরণ রাখেন—ভর্তির দরখাস্ত করে উত্তর এবং রওনা হবার অনুমতি-পত্র না আসা অবধি কেউ যেন রওনা না হন। প্রত্যেক স্যানাটোরিয়ামে সর্বদা বহু রোগীর দরখাস্ত এসে জমে থাকে। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার

যাঁরা উপযুক্ত বেছে বেছে সাধারণতঃ পর পর তাঁদের গ্রহণ করা হয়। কোনও খবর-বার্তা না দিয়ে হুট্ করে কোনও স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে হাজির হলে সেখানে হঠাৎ বেশ কিছু মুস্কিলে পড়তে হতে পারে এই জন্যে যে, হয়ত স্থানাভাবেও ডাক্তার রোগীটিকে গ্রহণ না করতে পারেন, অথবা রোগীটির 'কেস' হয়ত তাঁর বিবেচনায় স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার যোগ্য না হতে পারে। এমতাবস্থায় কেবল যাবার কষ্ট ও হাঙ্গামা, অর্থব্যয়, এবং অন্যান্য অসুবিধাই সার হবে।

স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রতীক্ষাকালে রোগীর সমস্ত তোড়জোড় সেরে ফেলে দিতে হবে। বিছানা, মশারি, তা ছাড়া জামা-কাপড়-চোপড়—সমস্ত কিছু প্রস্তুত রাখতে হবে। বালিশের ওআড়, বিছানার চাদর, সার্ট, তোআলে, কাপড়, রুমাল—ইত্যাদির সবই দু একটা অতিরিক্ত সঙ্গে থাকা মন্দ নয়, নইলে স্যানাটোরিয়ামে প্রথমটা গিয়েই (বিশেষ করে যদি নিজের লোক কেউ কাছে না থাকেন) কেনা-কাটি অথবা তৈরি করা হাঙ্গামাজনক হতে পারে। থার্মোমিটার, পকেট স্পিটুন, আউন্স-গ্লাস, খাবার বাসনপত্র—এসবও রোগীর নিজের থাকবে। কোনও পাহাড়িয়া স্যানাটোরিয়ামে যদি রোগীর যাওয়া ঠিক হয় তবে উপযুক্ত জুতো, মোজা, মাফলার, সোয়েটার, কোট, ওভার-কোট, অধোবাস (আণ্ডার-উয়ার), পাজামা—এসব যেন রোগীর থাকে। কামাবার সমস্ত সরঞ্জামও পুরুষ-রোগীর রাখবার দরকার। মেয়ে-রোগীরা যেন বিশেষ কোনও গহনা-পত্র নিয়ে স্যানাটোরিয়ামে না যান; কারণ এগুলি হারিয়ে গেলে বা চুরি গেলে স্যানাটোরিয়াম দায়ী থাকে না। রোগীর আত্মীয় স্বজন যেন স্মরণ রাখেন, রওনা হবার সময়ে গাড়ীতে রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে এবং যথেষ্ট আরামের ভিতর রাখতে চেষ্টা করতে হবে—যদি রোগীর শরীরে বিশেষ কোনও গ্লানি থাকে

রোগটা যখন টি. বি.—

তবে তো কথাই নাই। এমন কোনও যান ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে খুব ঝাঁকানি লাগতে পারে। স্টেশনে যেখানেই গাড়ী বদল করতে হবে—সাহায্য নিতে হবে স্ট্রেচারের। কিছু পয়সা বাঁচাতে চেষ্টা করে রোগীর প্রাণ পথেই যেন বার করে দেওয়া না হয়। বুকের অবস্থা, চিকিৎসা এবং শারীরিক উন্নতি-অবনতি অনুযায়ী স্যানাটোরিয়ামে তিন চার মাস থেকে এক বছর, দেড় বছর অথবা তার চেয়েও বেশী দিন থাকতে হতে পারে। এর জন্য রোগীকে সব দিকে তৈরী হয়ে যেতে হবে। যক্ষ্মারোগীর এরোপ্লেনে ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এই বই-এর চতুর্থ অধ্যায়ে থাকবে।

সব চাইতে নিকটের কোনও স্যানাটোরিয়ামে যাওয়াই ভাল—আধুনিক চিকিৎসার যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা সেখানে থাকে। দূরাবস্থিত স্যানাটোরিয়ামে যাতায়াতের খরচ বা ক্লেশও কম নয়, তা' ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে সর্বদা দেখাশোনারও অসুবিধা হতে পারে।

আরেকটি কথা। স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে দুই এক মাসেই ভাল হয়ে যাবেন—কোনও চিকিৎসকেরই তাঁর রোগীকে এ রকম মিথ্যা আশা দেওয়া সঙ্গত নয়। রোগীর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধেও সেই কথা। এর ফল পরিণামে অতি খারাপ হতে পারে। রোগী এই সব ভরসা নিয়ে স্যানাটোরিয়ামে যান, এবং ঠিক ঐ দুই এক মাস হয়ত বেশ চুপ চাপ থাকেন; কিন্তু তারপরে যখন দেখতে পান যে দুই এক মাসে হয়ত কিছুই হয়নি তখন ওঠেন ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে—এমন কি চিকিৎসকের সঙ্গে সহযোগিতা পর্যন্ত আর করতে চান না। সত্য কথাই রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে—সেটা প্রথমে একটু নৈরাশ্যের সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত সুফলদায়ী ও নিরাপদ। রোগীকে বলতে হবে সুস্থ তিনি নিশ্চয়ই হবেন, এবং বহুলোকেই হচ্ছে। তবে

একটু সময় লাগবে—হয়ত বা বছর খানেকও হতে পারে।...তার জন্যে কি?......

স্যানাটোরিয়াম জীবন দুই ভাগে বিভক্ত—বিশ্রামের অবস্থা এবং ক্রম-ব্যায়ামের অবস্থা। প্রথমে স্যানাটোরিয়ামে যাবার পরেই রোগীকে বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় রাখা হয়। যতদিন পর্যন্ত রোগীকে এই ভাবে থাকতে হয় ততদিন তাঁকে বলা হয়—"বেড্ পেসেণ্ট"। তারপরে দিন যেতে যেতে যখন বুকের বেশ উন্নতি হতে থাকে সব উপসর্গ কমে যায় তখন ধীরে ধীরে রোগীকে হাঁটতে শুরু করতে হয়। এই সময়ে তাঁরা "ওয়াকিং পেসেণ্ট" নামে অভিহিত হন। রোগী স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরেই তাঁর রক্ত, থুতু, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং অবিলম্বে বুকের এক্স-রে ফটো তোলা হয়। তারপরে অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ফুসফুসকে পূর্ণ বিশ্রাম দেবার জন্যে বিশেষ কতকগুলি অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োগ অধুনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শরীরের যে অংশই আক্রান্ত হোক না কেন, সেই অংশের সম্পূর্ণ বিশ্রামের উপরেই চিকিৎসার কৃতকার্যতা নির্ভর করে, এবং সেই বিশ্রামটা যত বেশী হবে, চিকিৎসার ফলাফল তত বেশী সন্তোষজনক হবে। ফুসফুসটাকে একেবারে চেপে রাখতে না পারলে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। রোগীকে অলসভাবে বিছানায় শুইয়ে রেখে দিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা এবং ফুসফুসের শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত আলোড়নের গভীরতা অনেকটা কমে বটে, কিন্তু তা দ্বারা ফুসফুস যে পূর্ণ বিশ্রাম পায় তাও নয় বা জোর কাসির বেগে যে বিপুল ঝাঁকানি লাগে তা থেকে যে রক্ষা পায় তাও নয়। অসুখটা সারবার পথে যেতে যে এত সময় নেয় তার প্রধান্ কারণই হচ্ছে ফুস্ফুসের এই রকম অবিশ্রান্তভাবে সক্রিয় অবস্থায় থাকা।

"আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্স" বা "ফ্রেনিক ইভালশান" ব "থোরাকো-প্লাসটি বা অন্য কোনও অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারা অসুস্থ ফুস্ফুসের প্রয়োজন অনুযায়ী আংশিক বা সম্পূর্ণ বিশ্রাম সাধিত হতে পারে, এবং তা দ্বারা টি-বির জখমটা মেরামত হবার বিশেষ রকম সুযোগ পায়। ফুসফুসের নড়াচড়া রূপ ক্রিয়া একেবারে কমে আসবার ফলে ক্ষত-কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিষ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বার এবং রোগ জীবাণুর পক্ষে ফুস্ফুসের সুস্থ অংশে প্রবেশ লাভ করবার সম্ভাবনা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ফলে, রোগীর সাধারণ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়, জ্বর কমে আসে এবং ব্যাধির স্থানীয় ব্যাপ্তির আশঙ্কাকে বহুল পরিমাণে দূরীভূত করে। ফুসফুসের পূর্ণ বিশ্রাম—শ্বাস-প্রশ্বাস কালে, বিশেষ করে কাশবার ঠিক আগে এবং পরে দ্রুত ও গভীর শ্বাস গ্রহণ কালে—শ্বাসনালী দ্বারা রোগের বিস্তৃতি ঘটবার সুযোগকে নষ্ট করে। ফুস্ফুস্কে ভালভাবে চেপে রাখতে পারলে কফও অনেক কমে আসে এবং কাশবারও প্রয়োজন অনেক কমে। তাতে হয় কি, ঐ যক্ষ্মা-জীবাণু-পূর্ণ কফ অন্য ফুসফুস্টাকেও আক্রমণ করবার সুবিধা পায় না।

"ক্যাভিটি" সর্বদাই বিপজ্জনক, কারণ এগুলি যক্ষ্মাজীবাণু উৎপাদনের একটি কারখানা বিশেষ। ক্যাভিটির জীবাণুযুক্ত পুঁজ ফুস্ফুসের সুস্থ অংশে বা অপর সুস্থ ফুস্ফুসে প্রবেশ লাভ ক'রে অসুখের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। কাজেই ফুস্ফুসের ভিতরকার ক্যাভিটিকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সব রকমে দরকার। এবং এ ব্যাপারে অস্ত্রচিকিৎসার ফলাফলই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক—এই মত যক্ষ্মার অস্ত্র চিকিৎসা বিশারদগণ প্রকাশ করছেন। অবিশ্যি তাই বলে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে অস্ত্র চিকিৎসা হলেই শয্যা বিশ্রাম এবং রোগীর অন্যান্য সাধারণ পালনীয় বস্তুগুলির আর প্রয়োজন নাই; বস্তুতঃ অস্ত্র

চিকিৎসাযোগ্য রোগী এবং অপর রোগী, সকলের পক্ষেই ওগুলি অত্যাবশ্যক।

আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্স" (সংক্ষেপে এ. পি.)—চিকিৎসা বুকের টি. বি-র জন্যে আজকাল সুপ্রচলিত এবং এটা একটা সহজ প্রক্রিয়া। এ. পি. (উর আধ্মাপনা)-কে পুরোপুরি অস্ত্র চিকিৎসা ঠিক বলা চলে না, ব্যাপারটা অনেকটা "ইঞ্জেকশান্" ধরনের। পিঠের বা বুকের কোনও জায়গায় সূচী দ্বারা ফুঁড়ে "প্লুরাল্ স্পেস্"-এর ভিতর বিশুদ্ধ হাওয়া ঢুকিয়ে ফুসফুসের অসুস্থ অংশের পতন "এ. পি." চিকিৎসা দ্বারা সাধিত হয়। (প্লুরার যে অংশটা পাঁজরার দিকে লেগে থাকে তাকে বলা হয় "প্যারাইটাল প্লুরা" এবং যে অংশটা ফুস্‌ফুসের গায়ে লেগে থাকে তাকে বলা হয় "ভিসেরাল প্লুরা"; আর দুটো প্লুরার মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় "প্লুরাল স্পেস্")। দেখা গিয়েছে যে ফুস্‌ফুসের পূর্ণ সঙ্কোচন নয়, যাতে শুধু ফুসফুসের অসুস্থ অংশটাই সঙ্কুচিত হয় সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে বাঞ্ছনীয়। বুকে হাওয়া দেওয়াটাকেও বর্তমানে সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। ফুস্‌ফুসের আংশিক সঙ্কোচনই ফুসফুস থেকে রক্তের মধ্যে বিষ সঞ্চারণ বন্ধ ক'রে রোগের উপসর্গ কমিয়ে দিয়ে রোগীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাবার পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু অনেক সময়ে "অ্যাঢিশান" (যা নাকি অনেক টি. বি. রোগীর বুকে ঘটে থাকে এবং যার মানে হচ্ছে ফুস্‌ফুসটা পাঁজরার দিককার দেয়াল থেকে আলাদা না থেকে তার সঙ্গে জায়গায় জায়গায় জোড়া লেগে আছে)—"এ. পি."কে কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন হতে দেয় না। অনেক সময় প্লুরাল স্পেস্-এ জল (ফ্লুইড) জমবার জন্যে বা নিউমোথোরাক্স স্পেস্-এ যক্ষ্মা-জীবাণু-সংক্রমণকে ছড়িয়ে দেবার জন্যেও এই অ্যাঢিশান দায়ী। এসব ক্ষেত্রে "থোরাকোস্কোপ" নামক আয়না সন্নিবিষ্ট যন্ত্রের ভিতর

দিয়ে লক্ষ্য রেখে বুকের এই অ্যাডিশানগুলিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অস্ত্রোপচারের নাম হচ্ছে—"ইনট্রা প্লুরাল নিউমোনোলাইসিস" (উর স্থাপকর্ষণ)। থোরাকোস্কোপ এবং বৈদ্যুতিক শলাকার সাহায্যে অ্যাডিশান কাটার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন প্রায় বছর চল্লিশেক আগে স্টকহল্‌মের জ্যাকোবিয়াস নামক এক ব্যক্তি। হাওয়ার বদলে কখনও কখনও প্লুরাল ক্যাভিটির ভিতর তেল (মিনারেল অয়েল, গোমিনল, অলিভ অয়েল ইত্যাদি) প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তেল দিয়ে ফুসফুস্‌কে চেপে রাখার নাম হচ্ছে "ওলিওথোরাক্স"। বিশেষ এক একটা ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্সের চাইতে ওলিওথোরাক্সটা একটু বেশী সুবিধাজনক হয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। অবিশ্যি ওলিও-থোরাক্সের চাইতে আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্সের ব্যবহার এবং সুবিধা বহু বহু গুণ বেশী। রবার্ট কখ্‌-এর যক্ষ্মাজীবাণু আবিষ্কারের আমলেই কার্লো ফরলানিনি বলে একজন ইটালিয়ান আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্স চিকিৎসার প্রচলন করেন। অবিশ্যি এরও বছর ষাটেক আগে জেম্‌স্‌ কারসন নামে একজন লিভারপুল নিবাসী চিকিৎসকই আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্সের কথা প্রথম বলেছিলেন, কিন্তু সফলতার সঙ্গে রোগীদের উপর এর প্রয়োগ কার্লো ফরলানিনিই করেন। তবে পরবর্তীকালে এ. পি. দেবার যন্ত্রের এবং এই চিকিৎসা-পদ্ধতির নানাবিধ উন্নতি ক্রমে ক্রমে সাধিত হয়েছে। "এ. পি." অকৃতকার্য হলে প্যারাইটাল প্লুরা অর্থাৎ বাইরের পর্দাটাকে পাঁজরা থেকে ছাড়িয়ে ঐ নতুন স্থানে বিশুদ্ধ হাওয়া প্রবেশ করিয়ে ফুসফুসকে সংকুচিত করবার চেষ্টা করা হয়। এর নাম এক্সট্রা প্লুরাল নিউমোথোরাক্স।

অস্ত্র প্রয়োগ করে বুকের ভিতরকার পাঁজরার দিককার দেয়াল-সংযুক্ত প্লুরাটাকে ছাড়িয়ে জায়গা করে নিয়ে এই সব নিরেট কোনও জিনিস,

যথা—চর্বি, মাংসপেশী, মোম, রাবার, গজ, প্যারাফিন্ (প্লোমবে) ইত্যাদির কোনওটা প্যাক করে দিয়ে ফুসফুসের আক্রান্ত জায়গাটিকে চাপার নাম এক্সট্রা প্লুরাল নিউমোনোলাইসিস। "লুসাইট্ বল" নামক প্ল্যাস্টিকের এক রকম ছোট বলের দ্বারা বর্তমানে এই খালি জায়গাটিকে ভরে রাখবার চেষ্টা চ'লেছে। কাচের তন্তু ব্যবহারেরও সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ফুস্ফুসের চূড়া (অ্যাপেক্স)-টাকে যখন চাপা হয় তখন তাকে বলা হয় এপিকোলাইসিস্"। এক্সট্রা-প্লুরাল নিউমোনোলাইসিস্ সর্ব প্রথম ক'রেছিলেন প্যারিসের টাফিয়ার—বছর ষাটেক আগে। বুকের টি-বির আরেকটি অস্ত্র চিকিৎসার নাম হচ্ছে—"ফ্রেনিসেকটোমি" অথবা "ফ্রেনিকোটোমি" অথবা "ফ্রেনিক এক্সেয়ারেসিস" অথবা "ফ্রেনিক অ্যাভালশান" বা "ইভালশান" (অনুকণ্ঠিকা নাড়ী ব্যবচ্ছেদ)। এই অস্ত্রোপচারে ঘাড়ে ঠিক কণ্ঠাস্থির উপরে একটি স্থান চিরে ফ্রেনিক নার্ভের কিছুটা অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় অথবা নার্ভ টিকে একেবারে উৎপাটন করা হয়। ঘাড়ের ডান এবং বাঁ প্রত্যেক দিকে একটি একটি করে দুটি ফ্রেনিক্ নার্ভ আছে। ফ্রেনিক নার্ভের কাজ হচ্ছে ডায়াফ্রাম (যে পেশী নাকি পেট এবং বক্ষগহ্বরকে পৃথক করে রাখে)-এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ডায়াফ্রামটাও ওঠানামা করে। এই ওঠানামাকে বন্ধ করতে পারলে ফুসফুস্টাও সেই অনুপাতে বিশ্রাম পায়। এক দিককার ফ্রেনিক নার্ভকে যখন কেটে ফেলা হয়, তখন ডায়াফ্রামটা, যদি নাকি বক্ষ-প্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, উপরের দিকে খানিকটা উঠে এসে ফুসফুস্‌কে কতকটা সংকুচিত ক'রে তার খানিকটা বিশ্রামের ব্যবস্থা করে। কখনও কখনও ডায়াফ্রাম-টাকে সাময়িকভাবে অচল করে দেবার জন্যে ফ্রেনিক নার্ভটাকে কেবল থেঁতো করে দেওয়া হয় এবং এই অপারেশানের নাম হচ্ছে

ফ্রেনিক্রেসিস্ অথবা ফ্রেনেমক্রেক্সিস। বছর চল্লিশেক আগে স্টুয়ার্টজ্ বলে একজন প্রথম ফ্রেনিকোটোমি সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন কিন্তু সয়ারব্রাশ এই অপারেশান সব প্রথমে চালাতে থাকেন—স্টুয়ার্টজ্-এর প্রস্তাবের কোনও খবর না রেখে। "স্ক্যালিনিয়টোমি" হ'চ্ছে আরেকটি অপারেশান। এই অপারেশানে প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঁজরার সঙ্গে যুক্ত. শ্বাস প্রশ্বাসে সহায়ক পেশী-বিশেষকে কেটে দেওয়া হয়। এই মাংসপেশীর আকর্ষণে উক্ত পাঁজরাগুলি উন্নত হয়; কাজেই এই পেশীকে কেটে দিলে অ্যাপেক্স অর্থাৎ ফুসফুসের চূড়াটা পতিত হয় এবং খানিকটা বিশ্রাম পায়। তবে স্ক্যালিনিয়টমির আলাদাভাবে চলতি আজকাল আর দেখা যাচ্ছে না। পেটের আভ্যন্তরিক সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদনকারী রসসিক্ত আবরণের নাম - পেরিটোনিয়াম, এবং আচ্ছাদিত গহ্বরের নাম পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। এই পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে অক্সিজেন অথবা পরিস্রুত বায়ু প্রবেশ করান হয় এবং এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে "অক্সি-পেরিটোনিয়াম" বা "নিউমো-পেরিটো-নিয়াম"। এর ফলাফল কতকটা ফ্রেনিক ইভালশানের মতই কিন্তু অন্ত্রের অথবা পেরিটোনিয়ামের যক্ষ্মাতেও এটা করা হয়। "ইন্টার কসটাল নিউরেকটোমি" নামক অন্য এক প্রকার অস্ত্রোপচার দ্বারাও ফুসফুসের অচলতা ঘটান হয়। যে সব স্নায়ু পাঁজরাগুলির নড়াচড়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, এই অস্ত্রোপচারে সেই সব স্নায়ুর অংশ কর্তন করা হয়। এই অস্ত্রোপচার প্রথম করেন কনিগ্সবার্গের ওআরস্টার্ট্। স্বতন্ত্রভাবে এই অস্ত্র চিকিৎসাও বর্তমানে প্রচলিত নয়। বুকের টি. বি.র অস্ত্র চিকিৎসার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "এক্সট্রা প্লুরাল থোরাকোপ্লাস্টি" (পর্কা-খণ্ডন)—যেটা নাকি খুবই জমকাল রকমের, এবং যেটা ক্রমেই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে বুকের যক্ষ্মায় অস্ত্র

চিকিৎসার ভিতরে। বছর পঁয়ষট্টি আগে লসেন্-এর ডি সেয়েনভিলই যদিও সর্বপ্রথম থোরাকোপ্ল্যাসটি সম্পাদন করেন, কিন্তু ব্রয়ার-কেই যক্ষ্মায় আধুনিক থোরাকোপ্ল্যাসটি অপারেশানের প্রকৃত জনক বলা হয়েছে। কতকগুলি পাঁজরার অংশকে বা কতকগুলি পাঁজরাকে সম্পূর্ণরূপে কর্তন ক'রে বক্ষপ্রাচীরের পতন ঘটিয়ে ফুসফুসকে চেপে দেওয়াই থোরাকোপ্ল্যাসটির কাজ। মেরুদণ্ড, পাঁজরা এবং সামনে উরঃফলক দ্বারা তৈরী হাড়ের খাঁচাটির ভিতরেই তো থাকে ফুসফুস। শ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে যদিও একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই ফুসফুসকে ওঠানামা করতে হয় তবুও এই হাড়ের খাঁচাটার জন্যে ফুসফুসের সম্পূর্ণ পতন ঘটান সম্ভব হয় না। যখন নাকি কতকগুলি পাঁজরা থেকে খানিকটা অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়, খাঁচাটার আয়তন কমে আসে এবং ফুস্‌ফুসের সংকোচ ঘটে। এই রকম চেপে থাকবার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা ফুসফুসের নড়াচড়া হবার আর সম্ভাবনা থাকে না। ফুসফুসের আয়তন এবং সংকোচন-প্রসারণকে যথেষ্ট পরিমাণে কমানর জন্যে অনেকখানি পাঁজরা কেটে ফেল্‌বার দরকার হতে পারে।
থোরাকোপ্ল্যাসটির পরে বুকের বিকৃতি অনেক সময় খুবই ঘটে থাকে। বাইরে থেকে খারাপ দেখালেও বিবেচক রোগী তাঁর অধিকতর কুৎসিত রোগের চেয়ে এই বিকৃতিকে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করেন। (বিকৃতি মানে, দেখলে দেখা যায় বুক বা পিঠের একটা জায়গা— অর্থাৎ যেখানে অপারেশনটা করা হয়েছে সেই জায়গাটা—খানিকটা চেপে গেছে। অথবা কাঁধটা একটু উঠে বা নেমে বা বেঁকে গেছে।) থোরাকোপ্ল্যাসটি করে একজন রোগীকে পঙ্গু করে রাখা হয় তা যেন কোনও রোগী না ভাবেন। বাস্তবিক যদি কোনও রোগীর এই অপারেশানটা ঠিক মতন লেগে যায়—অন্য কোনও বিপদের সৃষ্টি না ক'রে— তা হলে রোগী

উপযুক্ত সময়ে দস্তুর মতন পরিশ্রমের কাজের উপযোগীও হতে পারেন এবং চলাফেরায়ও যে তাঁর কোনও অস্বাভাবিকতা থাকবে তা নয়। অপারেশানের পরে বিকৃতি যাতে না ঘটে এবং স্বাভাবিক বাহু সঞ্চালন ক্রিয়া যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্যে অপারেশানের সময়ে এবং অপারেশানের পরে নানা উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হচ্ছে।

অনেক সময়ে থোরাকোপ্ল্যাসটির পরে রোগীকে এক রকম দোলা বা ঝোলায় শুইয়ে রাখা হয়—যাতে অপারেশান করা অংশটি বেশ চেপে থাকবার সুযোগ পায়।

ফুসফুসের বিশ্রাম সাধনের জন্যে আরও নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও বালু বা সিসার ছোট বল-পূর্ণ থলি বুকের যে জায়গাটাতে অসুখ সেই জায়গাটার উপরে (সাধারণতঃ কণ্ঠাস্থির নীচেয়) বাইরে বসিয়ে রাখা হয়। এই ব্যাগের চাপের দরুন ফুসফুসের নড়াচড়াটা একটু কম থাকে। কখনও বা রোগীকে বিশেষভাবে নির্মিত এক রকম বেল্ট বুকে পরতে দেওয়া হয়—যে বেল্ট্‌ও ঐ উদ্দেশ্যই সাধন ক'রে থাকে। থোরাকোপ্ল্যাসটি অপারেশনের পরেও এগুলির ব্যবহার দেখা যায়।

ক্যাভিটিতে উৎপন্ন পুঁজ-গয়েরাদি শ্বাসনালীর ভেতর দিয়ে সহজে বেরুনোর রাস্তা না পেলে অনেক সময় কতকগুলি জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হয়। তখন বুকের বাইরে থেকে ক্যাভিটির ভিতর নল ঢুকিয়ে পুঁজ-গয়ের ইত্যাদি বেরিয়ে আসবার রাস্তা করে দেওয়া হয়। এতে রোগীর কাশবার এবং থুতু ফেলবার প্রয়োজন অনেক কমে যায়, ক্যাভিটির দেয়ালগুলির ওপরকার চাপও কমে। এই অপারেশানের দুটি প্রক্রিয়া আছে। একটির নাম "মোনাল্‌ডিস্‌ অপারেশান", আরেকটির নাম "ক্যাভারনোস্‌টোমি।" সাধারণভাবে এগুলির নাম

হচ্ছে "ক্যাভিটি ড্রেনেজ"। কেবল "ক্যাভিটি ড্রেনেজ" দ্বারাই ক্যাভিটিকে সারানো অনেক সময়েই যায় না, থোরাকোপ্ল্যাসটি জাতীয় অপারেশানেরও দরকার হ'তে পারে।

ফুসফুসের "লোব্" কাকে বলে তা আগেই বলেছি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফুসফুসের অসুস্থ "লোব্"কে একেবারেই কেটে বাদ দেওয়ার নাম "লোবেক্টমি"। উপায়ান্তর না থাকলে প্রয়োজন বোধে সম্পূর্ণ একটা ফুসফুসকেও কেটে বাদ দিতে হতে পারে। এই অস্ত্রোপচারের নাম "নিউমোনেকটমি"।

"এম্পাইমার" কথাও আগে এক জায়গায় বলেছি। এম্পাইমার ফলে ফুসফুসটা চেপে গিয়ে আর খুলতে না চাওয়ার অবস্থা ঘটলে একটি অপারেশানের ব্যবস্থা আছে যার নাম "ডিকর্টিকেশান।" এম্পাইমার জন্যে থোরাকোপ্ল্যাসটিও অনেক ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।

আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্সে যেমন প্লুরাল স্পেসে হাওয়া ঢোকানো হয়, "স্পনটেনিয়াস নিউমোথোরাক্স" বলে আরেকটি উপসর্গ আছে যাতে জোর কাশি বা অন্য কোনও কারণে ক্যাভিটি বিদীর্ণ হয়ে ফুসফুসের হাওয়া আপনা থেকে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্লুরাল স্পেস-এ জমতে থাকে। এর ফলে রোগীর শ্বাস কষ্টই যে ক্রমে বাড়তে থাকে তাই নয়, খারাপ কিছুও ঘটে যেতে পারে। তখন "আর্টিফিশিয়াল নিউমোথোরাক্সের" ঠিক উল্টো প্রক্রিয়ায় বুকের ভেতর থেকে এই হাওয়াকে বের ক'রে দেওয়া হয়।

প্লুরাল স্পেস্-এ জল জমাকে বলে "ফ্লুইড" হওয়া। এই "ফ্লুইড" যদি কোনও উপসর্গের সৃষ্টি করে, তবে বুকটাকে ফোঁড়াফুঁড়ি ক'রে তাও বের ক'রে দেবার ব্যবস্থা আছে—যাকে বলা হয় "অ্যাস্পিরেশান"।

এই অসুখের চিকিৎসায় ওষুধ যা ব্যবহার করা হয় তার ভেতর

"স্ট্রেপ্টোমাইসিন"-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। টি. বি. র চিকিৎসায় ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ইঞ্জেকশান উঠে গিয়েছে বললেই হয়, "গোল্ড" বা "টিউবার-কিউলিন" এখনও সামান্য প্রচলিত। টি. বি.র চিকিৎসায় অজস্র ওষুধ অজস্র লোকে বার ক'রে এই রোগকে সারাবার নানা দাবি ক'রেছেন, কিন্তু একের পর একে সে সবই জলের আল্পনার মত মিলিয়ে গেছে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন যক্ষ্মাজীবাণুকে একেবারে ধ্বংস করতে পারে না বটে কিন্তু এমনভাবে কাবু করতে পারে যাতে এই রোগের সঙ্গে লড়বার পক্ষে রোগীর যথেষ্ট সুবিধা হয়ে যায়। সব রকম টি. বিতে বা টি. বি.র সব রকম অবস্থাতে স্ট্রেপ্টো-মাইসিন সমান কার্যকরী হয় না, কতকগুলি ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহারের পরে কতকগুলি খারাপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হ'তে পারে—যথা কানে কম শোনা, চোখে কম দেখা, মাথা ঘোরা—ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে এই ওষুধ একেবারে আশ্চর্যকর ফল দিয়েছে এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বহু রোগীকে রক্ষা করেছে। টিউবারকুলার মেনিঞ্জাইটিসের কোনও চিকিৎসাই ছিল না। কিন্তু স্ট্রেপ্টোমাইসিন দ্বারা অনেক টি. বি-মেনিঞ্জাইটিসগ্রস্ত রোগীর রোগ উপশম ঘটেছে। বহু বিষয় বিবেচনা না ক'রে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের বেপরোয়া ব্যবহার দ্বারা অনেক চিকিৎসক অনেক রোগীর প্রতি বহু অন্যায় ক'রেছেন ব'লে খবর পাওয়া গেছে। স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কর্তা হচ্ছেন ইউনাইটেড্ স্টেট্স্ অব অ্যামেরিকার ডাঃ সেল্‌ম্যান্ এ. ওআক্স্‌ম্যান্। ডাঃ ওআক্স্‌ম্যানের মায়ের নাম 'স্ট্রেপ্টো-মাইসিস্ ফ্র্যাডিই'। মায়ের নামানুসারেই ডাঃ ওআক্স্‌ম্যান ক'রেছেন তাঁর ওষুধের নাম। স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সূত্র ধ'রে আরও শক্তিশালী এবং আরও ফলপ্রদ ওষুধ আবিষ্কারের অপেক্ষায় বিজ্ঞানীরা র'য়েছেন,

এবং আশা করছেন যে টি. বি.কে একেবারে নির্মূল ক'রে সারানোর ওষুধ ঠিকই একদিন বেরিয়ে যাবে।

স্ট্রেপটোমাইসিনেরই নির্মলীকৃত অবস্থান্তর হচ্ছে 'ডি হাইড্রোস্ট্রেপটো-মাইসিন'— বিরুদ্ধ শারীরিক প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা যেটায় ক'মেছে।

স্ট্রেপটোমাইসিনকে বলা হয় "অ্যান্টিবায়োটিক" জাতীয় ওষুধ। এই অ্যান্টিবায়োটিক দলে টি. বি.র চিকিৎসায় আরেকটির আবির্ভাব হয়েছে —"নিওমাইসিন" বলে।

টি. বিতে নতুন আরেকটি ওষুধের ব্যবহার চ'লেছে "প্যারা-অ্যামিনো-স্যালিসাইলিক অ্যাসিড" (পি. এ এস্) নামে।

সুইজারল্যাণ্ডের জনৈক যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ বুকে একটা অস্ত্রোপচার ক'রে এই ওষুধটি ঠিক ফুসফুসের ঘায়ে সোজাসুজি প্রয়োগ দ্বারা নাকি বিশেষ ভালো কাজ পেয়েছেন।

"টিবিওন" ব'লে একটি নবাবিষ্কৃত জার্মান ওষুধও নাকি টি.বি.র চিকিৎসায় বিশেষ কার্যকরী হ'চ্ছে।

আরও নিত্যনূতন অনেক "ওষুধ" আবিষ্কারেরই খবর ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এ কথার উল্লেখ আরেকবারও করতে চাই যে পূর্বেও বহু ওষুধই বহুবার বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এগুলিরও কোন্‌টা যে কতদূর টিকবে তা বলা কঠিন। এবং এই বই সবার হাতে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই যে আরও কি সব বেরিয়ে যাবে তাই বা কে জানে।

ভাল স্যানাটোরিয়ামে, রোগীর যদি টি. বি. ছাড়াও অন্য কোনও ব্যাধির কোনও উপসর্গ থাকে, তবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও কম-বেশী যথাসম্ভব করা হয়ে থাকে। স্যানাটোরিয়ামের কাছেই বড় কোনও হসপিট্যাল থাকলে রোগীর অপর কোনও উপসর্গের জন্যে অনেক

সময়ে সেখানকার ডাক্তার বা সার্জেনদেরও সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। যক্ষ্মারোগী যদি অন্য কোনও রোগ দ্বারা বিড়ম্বিত হন তবে সঙ্গে সঙ্গে তারও সুষ্ঠু চিকিৎসা না হলে তাঁর কোনই উন্নতি হবে না। কাজেই বহু দূর প্রদেশে, সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোনও স্থানে—যেখানে সব রকম সুবিধা হাতের কাছে পাওয়া যায় না এমনতর জায়গায় গিয়ে স্যানাটোরিয়াম স্থাপন আধুনিক যক্ষ্মা-বিশারদরা সমর্থন করেন না।

সঙ্গে টি. বি যদি না থাকে তবে শুধু ডিস্‌পেপসিয়া, কালাজ্বর, "ম্যালোয়ারি" সারাবার জন্যে কেউ যেন কোনও টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে যাবার উপক্রম না করেন। কেউ শুধু একটা সাধারণ চেঞ্জের জন্যেও এসব জায়গায় যাবার কল্পনা না করেন। টি. বি. স্যানাটোরিয়াম "হোটেল" নয়।

স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরে রোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—নিজের আরোগ্যলাভ। এবং এই আরোগ্যলাভের জন্যে তাঁর অভ্যাস করতে হবে অসীম সংযম আর নিষ্ঠা। অভ্যাস করতে হবে বিপুল ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা।

রোগী স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরে স্যানাটোরিয়ামে কি কি নিয়ম-কানুন মানতে হবে এবং কখন কি ভাবে চলতে হবে, তার একখানা ছাপান কাগজ অথবা ছোট্ট বই তাঁকে দেবার ব্যবস্থা অনেক স্যানাটোরিয়ামে আছে অনেক স্যানাটোরিয়ামে নাই। যেখানে এই কাগজ দেওয়া হয়, সে ত' ভালই, যেখানে দেওয়া হয় না সেখানে নবাগত রোগীরা পুরানো রোগীর কাছ থেকে সব শুনে নিতে পারবেন। তবে যে করেই হোক সব নিয়মকানুন জানবার পরে রোগী প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করে চলবেন—আন্তরিকতার সঙ্গে। রোগী নিজেকে

নিজে এই প্রশ্নটি করবেন: "কিছুদিন একটু কষ্ট সহ্য করে নিজেকে সারিয়ে তুলে আবার ফিরে যাব আমার সেই স্বাধীন, কর্ম্মময়, আনন্দময় জীবনে—সেইটা আমি চাই, না কি বর্ত্তমানের কতকগুলি অতি ছোটখাট তৃপ্তির মোহের বশবর্ত্তী হয়ে অতি ছোটখাট কতকগুলি দুর্বলতা প্রকাশের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে, নিজেকে ক্রমাগত ভুগিয়ে ভুগিয়ে চলব মাসের পর মাস—বছরের পর বছর—সেইটা আমি চাই?" প্রকৃতপক্ষে আরোগ্যলাভের পথে যক্ষ্মারোগীকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, বহু ক্ষুদ্র প্রলোভনের প্রতি উদাসীন হতে হবে, জয় করতে হবে প্রতি পদে পদে বহু হৃদয় দৌর্বল্য, নিজেকে পরিণত করতে হবে এক নিষ্ঠুর সাধকে। এমন দেখা গিয়েছে যে, রোগীকে যখন কড়াভাবে বিছানায় সর্বক্ষণ শুয়ে থাকতে বলা হয়েছে, তিনি একটুখানি বসবার বা দাঁড়াবার দিব্যি একটা কৈফিয়ৎ চট্ করে আবিষ্কার করেছেন অথবা পায়চারি করবার একটু সুযোগ চুরি ক'রে ক'রে নিয়েছেন। নবাগত রোগী স্যানাটোরিয়ামে হয়ত এমন অনেক রোগী দেখতে পাবেন, যাঁরা করবেন বিশ্রামের অবহেলা, অমান্য ক'রে চলবেন স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন; কিন্তু ডাক্তারের সাড়া পাওয়া মাত্র সাজবেন একেবারে ভিজে বেড়াল, সটান বিছানায় এসে এমন মড়ার মত পড়ে থাকবেন যে, দেখলে মনে হবে, যেন তাঁরা সেই আদমের যুগ থেকে এমনি ক'রে বিশ্রাম নিচ্ছেন—একটু এপাশ ওপাশও করেন নি! তাঁদের ভিতরে যাঁ'দিগকে হাঁটবার অনুমতি ডাক্তার দিয়েছেন, তাঁরা এক ফার্লং-এর জায়গায় এক মাইল হেঁটে এসে মনে মনে করবেন পৌরুষ অনুভব! কিন্তু এই সব রোগীর, মহাত্মা গান্ধী তাঁর "মাই এক্সপেরিমেণ্টস্ উইথ ট্রুথ" গ্রন্থে যে সুন্দর কথাটি বলেছেন, এটি জেনে রাখা ভাল—"আলটিমেট্‌লি

এ ডিসিভার ওন্‌লি ডিসিভ্‌স্‌ হিম্‌সেল্‌ফ্‌."—একজন প্রতারক শেষ পর্যন্ত নিজেকেই প্রতারিত করে। ডাক্তারকে ফাঁকি দিলে তাঁর হবে না একটুও কিছু, ঠকতে হবে নিজেরই। এই ব্যারাম নিয়ে ছেলেখেলা নয়, কাজেই মনের সমস্ত বিদ্রোহকে শান্ত করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ— অবশ্য সারবার মতলব থাকলে। একবার ব্রিটিশ লেবার পার্টি'র একটি বার্ষিক অধিবেশনে মিঃ হার্বার্ট মরিসন বৃটেনের অবস্থার সঙ্গে রাশিয়ার একটা তুলনা ক'রে এই কথা বলেছিলেন: 'রাশিয়ানদের মত আমরাও একটি সতর্ক পথ ধরে চলছি। সেটি হচ্ছে: কালকে বেশীর জন্যে আজকে কম ....আমরা যদি এটা না করি তবে আজকের চাইতে কালকের বিড়ম্বনা আমাদের কপালে অনেক বেশী ঘটবে!"

যক্ষ্মারোগীকেও ঠিক এই সতর্ক-পথ অবলম্বন করতে হবে: "কালকে বেশীর জন্যে আজকে কম"!...

বড় এবং ভাল স্যানাটোরিয়ামগুলিতে রোগীদের সময় কাটাবার কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে। গ্রামোফোন, রেডিয়ো অথবা দু'চার রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা—যাতে নাকি কোনও পরিশ্রম না হয়, ইত্যাদি আছে। লাইব্রেরিও থাকে—রোগীরা ইচ্ছামত বই, পত্রিকা আনিয়ে পড়তে পারেন। কখনও কখনও বাইরের লোককে আমন্ত্রণ করে গান-বাজনা অথবা অন্য কোনও রকম জলসার ব্যবস্থা, বা উৎসব, সখের মেলা .. ইত্যাদি রোগীদের আমোদ-বিধানের জন্যে করা হয়। যতদিন অবধি "বেড্‌-পেসেণ্ট" হয়ে থাকতে হয়, ততদিন সত্যিই খানিকটা কষ্টে এবং অসুবিধায় থাকতে হয় বই কি; কিন্তু ভাল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যখন বাইরে বসবার, বেড়াবার বা আমোদ-প্রমোদে একটু আধটু যোগদান করবার অনুমতি পাওয়া যায়, তখন স্যানাটোরিয়াম-জীবন দুঃসহ আর ঠিক তেমনটি থাকে না। "ওআকিং-পেসেণ্ট"রা অনেক

সময়েই বেশ দল বেঁধে আড্ডা দেবার সুযোগ পান—নানা বিষয় আলোচনা করে তাঁদের সময় কাটে। তবে রোগীদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত—যাতে নাকি শরীর এবং মনের পক্ষে গুরুতর-রকম ক্ষতিকর ঝগড়াঝাঁটি বা উত্তেজনাপূর্ণ বাগ্-বিতণ্ডা নিজেদের ভিতর কখনও কিছু নিয়ে না হয়। স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন ক্রমাগত লঙ্ঘন করবার মনোবৃত্তি যাঁদের থাকবে, তাঁদের এসব জায়গায় না যাওয়াই উচিত। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভাব, পরস্পরের ভিতর একতার ভাব, চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসা ব্যাপারে অহিংস সহযোগের প্রচেষ্টা—ইত্যাদি রোগীদের নিজেদের অন্তরে সযত্নে জাগিয়ে তুলতে হবে।

রোগীকে হতে হবে সাহসী এবং নির্ভীক। কত রোগীর কত যন্ত্রণার কথা, কত রোগীর শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ কানে আসবে—চোখেও দেখতে হতে পারে। নিজের শরীরেও যথেষ্ট গ্লানি থাকা সম্ভব। কিন্তু তার ভিতরেও নিজেকে রাখতে হবে শান্ত, সমাহিত। নিজের অথবা চারি পার্শ্বের এত বেদনার মাঝখানেও নিজেকে শক্ত রাখতেই হবে, নইলে চলবে না। হতাশ হয়ে পড়বার চেয়ে টি. বি. রোগীর বড় বিপদ আর নাই। সেরে উঠবই—এই দৃঢ়তা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ।

এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করবার প্রয়োজন বলে মনে করি। এমন রোগী এক-আধটি দেখতে পাওয়া যায়, যিনি ডাক্তারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চিকিৎসা চলবার অবস্থায়, স্যানাটোরিয়াম থেকে চলে যেতে সচেষ্ট হন। অবিশ্যি দীর্ঘকালের ভিতরেও যদি কোনও রকম উন্নতি না হয়, তবে রোগী অন্য চেষ্টা ইচ্ছে হলে করতে পারেন, কিন্তু উন্নতি যদি সুস্পষ্ট হয়, তবে শুধু খেয়ালের বশে মাঝ-পথে স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করা

কখনই সঙ্গত নয়। এমন দেখা গিয়েছে, যক্ষ্মারোগীর জীবনে বহুবার সাময়িক উন্নতি আসে, বহুবার সে উন্নতি চলে যায়। কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা একটু ভাল ঠেকল, দুদিন জ্বরটা একটু কম থাকল, অথবা কাসিটা একটু কম থাকল, অথবা দু সপ্তাহ ওজনটা একটু বাড়ল, এইতেই যক্ষ্মারোগী নিজের সম্বন্ধে কোনও রঙিন কল্পনা যেন গড়ে না তোলেন। চিকিৎসা সম্পূর্ণ শেষ না করে স্যানাটোরিয়াম ছেড়ে চলে আসবার জন্যে ব্যস্ত হওয়া মানে কিছু দিনের ভিতরেই পুনরায় সেখানে ফিরে যাবার পথ পরিষ্কার করে রাখা।

কেবল স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের কথাই নয়; স্যানাটোরিয়ামের বাইরেও যে সব রোগী বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসিত হবেন, তাঁদের সম্পর্কেও এই সব কথা খাটবে। এ বিষয়ে জনৈক চিকিৎসক তাঁর একটি রোগিণীর শোচনীয় পরিণতির ইতিহাস "এ কেস্ অব ফল্‌স্ সেন্‌স্ অব সেফ্‌টি" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধের ভিতরে দিয়েছেন। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা এবং বয়স ছিল ২৫ বছর। কাসি, রক্তবমন, জ্বর দুর্বলতা—সবই তাঁর ছিল। এই অবস্থায় তাঁকে "এ. পি." করা হল এবং "গোল্ড" দেওয়া হল। ১০ মাস চিকিৎসার পরে তাঁর চমৎকার উন্নতি হল, কিন্তু তখনও তাঁর আরও দীর্ঘকালের চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অথচ এই সময় তিনি এবং তার আত্মীয়েরা বেঁকে বসলেন—আর কিছুতেই চিকিৎসা করান হবে না। তাঁদের মতে—এখন একটু হাওয়া পরিবর্তন করলে, আর একটু ভাল খাওয়া দাওয়া করলেই রোগিণী ভাল থাকবেন—এইটে হল ঠিক এবং তাঁরা ধরে নিলেন রোগিণী সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। ডাক্তারের উপদেশ তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না।·· অল্প কিছুদিন পরেই মেয়েটি হলেন গর্ভবতী—ডাক্তারের ঘোর অমতে।

জানেন, এ সবের পরিণাম শেষ পর্যন্ত মোটের উপর কি হল?

শেষ পর্যন্ত তাঁর অসুখ এমন ভীষণভাবে বেড়ে পড়ল যে, তাঁর জন্যে আর কিছুই করা সম্ভবপর হল না। মৃত্যু ছিল তাঁর নিশ্চিত এবং অতি দ্রুত অবশেষে তাই-ই সংঘটিত হল।

যক্ষ্মারোগীর জীবনে সাময়িক উন্নতিও যেমন অনেকবার আসতে পারে, সাময়িক অবনতিও ঠিক তেমনই আসতে পারে এবং এর জন্যে রোগীর কিছুমাত্র হতাশ হয়ে পড়া ঠিক নয়। বেশ হয়ত দিন চলেছে, হঠাৎ জ্বর বেড়ে পড়ল, কাসি বেড়ে গেল. খুব গয়ের উঠতে থাকল, ওজনও তরতর করে খানিক গেল কমে. কি জানি বা মুখ দিয়ে খানিক রক্তই মাঝে বেশ উঠে পড়ল! কিন্তু রোগীর যদি সুদৃঢ় ধৈর্য এবং জয়ী হয়ে উঠবার অদম্য ইচ্ছা থাকে তবে এসব অবস্থা তিনি নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে উঠতে পারবেন কাটিয়ে। অনেক সময়েই এমন দেখা গিয়েছে যে, কিছুদিন এই সব উপদ্রবের পরে রোগীর সহসা একেবারে আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি শুরু হয়েছে। কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের ভিতর দিয়ে এ অসুখ অগ্রসর হতে থাকে এবং এমন অনেক সময় হয় যে কতকগুলি নিয়ম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সারবার দিকে অসুখ সহজে মুখ ফিরাতে চায় না, কখনও চাপা থাকে, আবার কখনও ওঠে একটু মাথা চাড়া দিয়ে। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা চলবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অসুখ শান্তভাব ধারণ করে এবং রোগীর আরোগ্যলাভকে নিশ্চিত করে। রোগীর মনে রাখা উচিত: যখন নাকি কোনও বিষয় নিয়ে অবস্থা এমন জটিল হয়ে ওঠে যে, মনে হয় যেন সব কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে এবং মনে হয় যেন মাত্র একটি মিনিটও আর তাঁর শক্ত হয়ে লেগে থাকবার উপায় নাই—কিছুতেই যেন তিনি সেই সময়টাতে হাল ছেড়ে না দেন—কারণ সেইটেই হচ্ছে আসল জায়গা এবং সময়, যে জায়গায় এবং যে মুহূর্তে অবস্থার মোড় আবার ঘুরে যাবে।

রোগটা যখন টি. বি.—

স্যানাটোরিয়ামে যখন একজন নতুন রোগী আসবেন তখন পুরানো রোগীর কর্তব্য হবে তাঁকে সর্বদা এই বলে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করা যে আরোগ্য লাভই তাঁর আসন্ন, মৃত্যু নয়! তাঁরা তাঁকে এই সব মধুর, মমতাপূর্ণ, সাহসযুক্ত কথা দ্বারা অনুপ্রাণিত করবেন: বন্ধু! মেঘের ফাঁকে রয়েছে আলো; তোমার বিপদের দিন কেটে যাবে, কিছু ভয় নাই। স্বাস্থ্যদেবতা ফিরে আসছেন তোমার দুয়ারে -তুমি তাঁকে অভিনন্দিত করো!

* * * ব্যাধি জিনিসটা সুন্দরও নয়, মহৎও নয়। ব্যাধিকে সুন্দর বা মহৎরূপে কল্পনা করাটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, অন্ততঃ অস্বাভাবিকতার দিকেই তার গতি। * * ব্যাধি এমন চমৎকার একটা বস্তু অথবা এমন একটা শ্রদ্ধার বস্তু যার সঙ্গে অবসাদের কোনই সম্পর্ক নাই—এটা তো একেবারেই নয়, বরং এটা মানুষের এমন একটা অধঃপতন—যে অধঃপতনের কথা চিন্তা করতেও কষ্ট হয় আর অন্তরে ঘৃণার ভাব জাগে। ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে ব্যাধিকে হয়তো একটু বিবেচনার সঙ্গে দেখা যেতে পারে; কিন্তু একে অভিনন্দন জানানোটা মানসিক বিকারের লক্ষণ, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হবার অবস্থার সূচনা। * * *

—টমাস্ ম্যান (দি ম্যাজিক মাউণ্টেন)

রোগের উপশমান্তে রোগী যেদিন হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করেন, সেটি তাঁর পক্ষে শুভদিন। যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন, দেহ ছিল তাঁর জীর্ণ—ব্যাধির সহস্র গ্লানি দ্বারা জর্জরিত। কিন্তু যেদিন তিনি স্যানাটোরিয়াম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন—তখন আর তাঁর সে অবস্থা নাই। পরিপুষ্ট, উজ্জ্বল দেহে তাঁর জেগেছে নতুন রক্তের লাবণ্য, গতির ভিতরে আবার এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, তাঁর আশা-ভরা মনের প্রান্তে এসে পড়েছে নতুন জীবনের ছায়া. ব্যাধির দীর্ঘকালের যত কুৎসিত উপদ্রব কোথায় করেছে আত্মগোপন—তার ঠিকানা নাই।

কিন্তু তত্রাচ, একদিক দিয়ে এটি রোগীর পক্ষে যেমন সুদিন, অপর দিক দিয়ে আবার এটি বিপজ্জনক দিনও বটে! এই রোগের এমন ব্যাপার, এতদিনকার সাধনার ফল সহসা কখন, কি ভাবে যে নষ্ট হয়ে যাবে কিছুই বলা যায় না!

আমি এই বিষয়টির উপর বেশী করে জোর দিতে চাই এই জন্যে যে স্যানাটোরিয়াম-কর্তৃপক্ষ যখন রোগীকে মুক্তি দিয়ে গৃহে যাবার অনুমতি দিলেন, তখনও সত্যি সত্যিই কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খল-মুক্ত নন! রোগীদের হিতার্থে যক্ষ্মারোগে "সম্পূর্ণ-সেরে-যাওয়া" কথাটাকে খুব হালকা ভাবে ব্যবহার না করাই ভাল, এবং চিকিৎসকেরও কর্তব্য রোগীকে তাঁর রোগের পুনরাবির্ভাবের বিপদ সম্বন্ধে প্রথমেই সতর্ক এবং সচেতন করে দেওয়া। রোগাক্রান্ত অবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌টির স্বাভাবিক এবং সুস্থ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে স্থান হয় নতুন নরম টিসুর— যেগুলির নাকি সহজে ভেঙে পড়বার এবং স্ফোটক সৃষ্টি করবার প্রবণতা থাকে। এবং সারবার কাজে "ফ্রাইব্রাস্ টিসু"গুলি যত ঘন ও শক্ত হতে থাকে, সারাটাও সেই

পরিমাণে ভালভাবে চলতে থাকে। কিন্তু যে নিয়মের ভিতর দিয়ে এগুলি অগ্রসর হতে থাকে তা রাতারাতি শেষ হয় না ; তাতে সময় লাগে। ব্যাপারটা হয় এই : যক্ষ্মাজীবাণু প্রথমে ধরুন ফুসফুসের উপর অংশে গিয়ে আশ্রয় নিল। তারা সেখানে গিয়ে একটা প্রদাহের সৃষ্টি করল এবং ছোট ছোট কতকগুলি গুটিকার উৎপত্তি ঘটাল। এই গুটিকাগুলি ক্রমে আকারে বড় হতে থাকে। এই গুটিকাগুলির নামই হচ্ছে "টিউবার্ক্ল্স্"—যা থেকে অসুখের নামকরণ হয়েছে "টিউবারকিউলোসিস" বলে। একটি টিউবার্ক্লকে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচেয় পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখতে পাওয় যায় যে সেটি নানাপ্রকার জীব-কণিকা বা "সেল্"-এর সঙ্গে "মনোসাইট্স্" নামে অন্য প্রকার ছোট ছোট কতকগুলি জীব-কণিকা এবং "লিম্ফোসাইট্স্" নামে শ্বেতকণিকার বিশিষ্ট একটি দল—ইত্যাদি দ্বারা সুবিন্যস্তভাবে গঠিত। এর মধ্যেই আবার একটি বৃহৎ কোষের আবির্ভাব হয় যাকে "জায়েণ্ট সেল্" বলা হয়। এই "জায়েণ্ট সেল" টিউবার্কল্টির একটি বিশেষত্ব। এই জায়েণ্ট সেলের ভিতর এবং টিউবার্কল্টা অন্য যে সব কণিকাদ্বারা গঠিত হয়েছে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তার ভিতর যক্ষ্মা জীবাণুকে পাওয়া যায়। টিউবার্কল্-এর ভিতরে কোনও রক্তকোষ থাকে না—কাজেই রক্তের ভিতর কোনও ওষুধ ইঞ্জেকশান ক'রে সোজাসুজি যক্ষ্মাজীবাণুকে ধ্বংস ক'রে এই ব্যাধির প্রতিকার সম্ভবপর হয় না। যাহোক, রোগের গতি যদি অপ্রতিহত অবস্থায় থাকে, তবে টিউবার্কল্গুলি এবং যে সব টিস্যুর ভিতর টিউবার্কল্গুলি অবস্থিত থাকে, সেগুলির এক রকম রূপান্তর ঘটতে থাকে—যে ব্যাপারটিকে বলা হয়েছে—"কেজিয়েশান"। তারপরে ওগুলি সব মিলে পরিণত হয় পুঁজে—অথবা তার আগেই হয়ে যায় "ক্যালসিফায়েড", আক্রান্ত

স্থানে চুন জ'মে যেটা নাকি অসুখের বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এক ধরনের "অ্যারেস্টেড" হবার অবস্থা।

অপর পক্ষে, বাড়াবাড়ি হবার সুযোগ না পেয়ে অসুখ যদি ভালর দিকে যায় তবে "কেজিয়েশান" অবধি আদৌ গড়ায় না অথবা গড়ানর মত হলেও বেশী দূর এগুতে পারে না এবং "ফাইব্রাস টিস্যু" বলে নবগঠিত আরেক রকম টিস্যু সমস্ত টিউবার্কল্‌গুলিকে আচ্ছাদন করে ফেলে। এই "ফাইব্রোসিস" হয়ে যাবার অবস্থাটা হচ্ছে অসুখটার আরেকভাবে "অ্যারেস্টেড" হবার অবস্থা এবং এইটের ফলই অধিকতর সন্তোষজনক।

রোগ "অ্যারেস্টেড" হওয়া এবং রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাওয়া এক কথা নয়। এই রোগের ক্ষত এত ধীরে ধীরে সারে যে একেবারে "সম্পূর্ণ" সুস্থ হতে রোগীর কয়েক বছরও হয়ত লেগে যেতে পারে। রোগের কোনই উপসর্গ আর না থাকতে পারে, থুতুও হয়ত সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত ; কিন্তু ফুসফুসের ক্ষত-স্থানে "স্কার টিস্যু" দ্বারা নব-নর্মিত স্থান এখনও হয়ত তেমন শক্ত হয়নি এবং 'স্কার-টিস্যু'র দেয়ালের মাঝে মাঝে এখনও অনেক স্থানেই পুঞ্জীভূত ব্যাধিগ্রস্ত টিস্যু হয়ত রয়েছে। এগুলির ভিতরে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মাজীবাণু বন্দী অবস্থায় রয়েছে। রোগীর অনিয়ম অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে যে কোনও মুহূর্তে এই জীবাণুর দল "স্কার টিস্যু"র দেয়াল ভেঙ্গে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠে আপনাদিগের করতে পারে দ্রুতগতিতে বিস্তার সাধন, এবং করতে পারে পুনরায় রোগীর প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন।

স্যানাটোরিয়ামে আসবার জন্যে বহু সংখ্যক রোগীই চেষ্টা করে থাকেন এবং সকলেই যাতে চিকিৎসার সুযোগ পান ডাক্তারের এটা দেখবার দরকার হয় ; কাজেই একজন রোগী একেবারে ষোল আনা সুস্থ

পরিমাণে ভালভাবে চলতে থাকে। কিন্তু যে নিয়মের ভিতর দিয়ে এগুলি অগ্রসর হতে থাকে তা রাতারাতি শেষ হয় না ; তাতে সময় লাগে। ব্যাপারটা হয় এই : যক্ষ্মাজীবাণু প্রথমে ধরুন ফুসফুসের উপর অংশে গিয়ে আশ্রয় নিল। তারা সেখানে গিয়ে একটা প্রদাহের সৃষ্টি করল এবং ছোট ছোট কতকগুলি গুটিকার উৎপত্তি ঘটাল। এই গুটিকাগুলি ক্রমে আকারে বড় হতে থাকে। এই গুটিকাগুলির নামই হচ্ছে "টিউবার্ক্‌ল্‌স্"—যা থেকে অসুখের নামকরণ হয়েছে "টিউবারকিউলোসিস" বলে। একটি টিউবার্ক্‌লকে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচেয় পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখতে পাওয় যায় যে সেটি নানাপ্রকার জীব-কণিকা বা "সেল্"-এর সঙ্গে "মনোসাইট্‌স্" নামে অন্য প্রকার ছোট ছোট কতকগুলি জীব-কণিকা এবং "লিম্‌ফোসাইট্‌স্" নামে শ্বেতকণিকার বিশিষ্ট একটি দল—ইত্যাদি দ্বারা সুবিন্যস্তভাবে গঠিত। এর মধ্যেই আবার একটি বৃহৎ কোষের আবির্ভাব হয় যাকে "জায়েণ্ট সেল্" বলা হয়। এই "জায়েন্ট সেল" টিউবার্কল্‌টির একটি বিশেষত্ব। এই জায়েণ্ট সেলের ভিতর এবং টিউবার্কল্‌টা অন্য যে সব কণিকাদ্বারা গঠিত হয়েছে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তার ভিতর যক্ষ্মা জীবাণুকে পাওয়া যায়। টিউবার্কল্-এর ভিতরে কোনও রক্তকোষ থাকে না—কাজেই রক্তের ভিতর কোনও ওষুধ ইঞ্জেকশান ক'রে সোজাসুজি যক্ষ্মাজীবাণুকে ধ্বংস ক'রে এই ব্যাধির প্রতিকার সম্ভবপর হয় না। যাহোক, রোগের গতি যদি অপ্রতিহত অবস্থায় থাকে, তবে টিউবার্কল্‌গুলি এবং যে সব টিস্যুর ভিতর টিউবার্কল্‌গুলি অবস্থিত থাকে, সেগুলির এক রকম রূপান্তর ঘটতে থাকে—যে ব্যাপারটিকে বলা হয়েছে—"কেজিয়েশান"। তারপরে ওগুলি সব মিলে পরিণত হয় পুঁজে—অথবা তার আগেই হয়ে যায় "ক্যালসিফায়েড", আক্রান্ত

স্থানে চুন জ'মে যেটা নাকি অসুখের বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এক ধরনের "অ্যারেস্টেড" হবার অবস্থা।

অপর পক্ষে, বাড়াবাড়ি হবার সুযোগ না পেয়ে অসুখ যদি ভালর দিকে যায় তবে "কেজিয়েশান" অবধি আদৌ গড়ায় না অথবা গড়ানর মত হলেও বেশী দূর এগুতে পারে না এবং "ফাইব্রাস টিসু" বলে নবগঠিত আরেক রকম টিসু সমস্ত টিউবার্কল্‌গুলিকে আচ্ছাদন করে ফেলে। এই "ফাইব্রোসিস" হয়ে যাবার অবস্থাটা হচ্ছে অসুখটার আরেকভাবে "অ্যারেস্টেড" হবার অবস্থা এবং এইটের ফলই অধিকতর সন্তোষজনক।

রোগ "অ্যারেস্টেড" হওয়া এবং রোগীর সম্পূণ সুস্থ হয়ে যাওয়া এক কথা নয়। এই রোগের ক্ষত এত ধীরে ধীরে সারে যে একেবারে "সম্পূর্ণ" সুস্থ হতে রোগীর কয়েক বছরও হয়ত লেগে যেতে পারে। রোগের কোনই উপসর্গ আর না থাকতে পারে, থুতুও হয়ত সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত; কিন্তু ফুসফুসের ক্ষত-স্থানে "স্কার টিসু" দ্বারা নব-নর্মিত স্থান এখনও হয়ত তেমন শক্ত হয়নি এবং 'স্কার-টিসু'র দেয়ালের মাঝে মাঝে এখনও অনেক স্থানেই পুঞ্জীভূত ব্যাধিগ্রস্ত টিসু হয়ত রয়েছে। এগুলির ভিতরে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মাজীবাণু বন্দী অবস্থায় রয়েছে। রোগীর অনিয়ম অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে যে কোনও মুহূর্তে এই জীবাণুর দল "স্কার টিসু"র দেয়াল ভেঙ্গে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠে আপনাদিগের করতে পারে দ্রুতগতিতে বিস্তার সাধন, এবং করতে পারে পুনরায় রোগীর প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন।

স্যানাটোরিয়ামে আসবার জন্তে বহু সংখ্যক রোগীই চেষ্টা করে থাকেন এবং সকলেই যাতে চিকিৎসার সুযোগ পান ডাক্তারের এটা দেখবার দরকার হয়; কাজেই একজন রোগী একেবারে ষোল আনা সুস্থ

যতদিন না হন ততদিন পর্যন্ত তাঁকে স্যানাটোরিয়ামের একটি বিছানা অধিকার করতে দিয়ে রাখা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সাধারণতঃ একজন রোগীকে ততদিন পর্যন্তই রাখা হয় যতদিনে তাঁর অবস্থাটা মোটামুটি নিরাপদ হয়ে ওঠে। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাকে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য করবার জন্যে তারপরে বাড়ীতেও তাঁকে কিছুকাল ঠিক একই নিয়মে কাটাতে হবে—চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী।

অ্যামেরিকান স্যানাটোরিয়াম অ্যাসোসিয়েশান এবং ইউ. এস. এর ন্যাশ্‌নাল টিউবারকিউলোসিস্‌ অ্যাসোসিয়েশান স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার ফলাফলকে এই ভাবে ভাগ করাটা গ্রহণ করেছেন :

(১) আপাত-দৃষ্টিতে—"কিওর্ড"।

রোগের কোনও লক্ষণেরই আর প্রকাশ নাই ; থুতু, যদি থেকেও থাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়েছে সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত ; এক্স-রে পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে ক্ষত-স্থানগুলি সেরে গেছে। এবং রোগী সাধারণভাবে চলাফেরা, কাজকর্ম করে এই অবস্থায় অন্ততঃ দুটি বছর কাটিয়েছেন।

(২) 'অ্যাবেস্টেড্‌"।

রোগের আর কোনও লক্ষণ নাই ; থুতু, যদি থেকেও থাকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত ; এক্স-রে পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে ক্ষতস্থানগুলি ক্রমে কমে আসছে এবং আর বাড়ছে না। এই অবস্থাটা রোগীর বজায় রাখতে হবে অন্ততঃ ছ মাস এবং শেষের দুমাস রোগীর এক ঘণ্টা ক রে দৈনিক দুবেলা হাঁটা-চলার উপযুক্ত হতে হবে।

(৩) আপাত-দৃষ্টিতে—"অ্যারেস্টড্‌"।

রোগের কোনও লক্ষণ আর নাই, থুতু থাকলেও তা আণুবীক্ষণিক

পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত; এক্স-রে পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে বুকের ক্ষতগুলি কমছে এবং আর বাড়ছে না। রোগীর এই অবস্থায় থাকা চাই অন্তত তিনমাস, এবং শেষের দু' মাস রোগীর সক্ষম হওয়া চাই একঘণ্টা দৈনিক দুবেলা হাঁটা চলা করতে।

(৪) "কোয়ায়েসেণ্ট"।

ব্যাধির লক্ষণ নাই; থুতু যদি থাকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তার ভিতর জীবাণু পাওয়া নাও যেতে পারে বা যেতেও পারে; এক্স-রে পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে বুকের ক্ষত কমছে এবং আর বাড়ছে না। অন্তত দুটি মাস রোগীর এই অবস্থায় থাকা চাই, এবং শেষের মাসটাতে রোগীর পারা চাই আধ ঘণ্টা করে দৈনিক দুবেলা হাঁটতে।

(৫) "ইম্‌প্রুভ্‌ড্‌"।

রোগের লক্ষণ কমে এসেছে বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়েছে; থুতু যদি থাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তার ভিতর জীবাণু পাওয়া নাও যেতে পারে বা যেতেও পারে; এক্স-রে পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে বুকের ক্ষতগুলি কমে আসছে অথবা আর বাড়ছে না।

(৬) "আন্‌ইম্‌প্রুভ্‌ড্‌"।

আসল উপসর্গগুলি কমে নাই, বা আরও বেড়ে গেছে। এক্স-রে পরীক্ষায় দেখা গেছে রোগ সক্রিয় অবস্থায় আছে; বা ক্ষত আরও বেড়ে গেছে।

(৭) "ডায়েড্‌"।

অর্থাৎ—রোগী পটল তুলেছেন।

ভারতবর্ষীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতিও কয়েকজন বিশেষজ্ঞের একটি কমিটি গঠন করে এই ধরনের একটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তবে আদত ব্যাপারগুলি প্রায় একই বলে সেটিকে আলাদাভাবে এখানে আর দেবার প্রয়োজন নাই।

রোগটা যখন টি. বি.—

রোগ অ্যারেস্টেড অর্থাৎ রুদ্ধ হবার পরেও রোগীর দীর্ঘকাল অবধি অত্যন্ত সাবধানে থাকবার দরকার হয়। আর, যাঁদের রোগ বেশী ছিল বা চিকিৎসার পরেও রোগের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় নাই, তাঁদের দীর্ঘকাল কেন, চিরকালই বেশ সাবধানতার সঙ্গে কাটাতে হবে। স্যানাটোরিয়াম থেকে মুক্তিলাভ করে বহু রোগীই স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করে শুরু করতে গিয়ে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। আরোগ্যলাভকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে স্যানাটোরিয়াম থেকে ছুটি পাবার পরে বুকের অবস্থা অনুযায়ী দুই থেকে পাঁচ বছর রোগীকে অপেক্ষা করতে হবে। বুকের জখম বেশী থাকলে এই সময়কে আরও দীর্ঘ করে দিতে হবে। কিন্তু তার মানে মোটেই এ নয় যে এ সময়টা একেবারেই কিছু না করে রোগী আলস্যে অতিবাহিত করবেন; যে জিনিসটা তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা শুধু হচ্ছে এই: তাঁকে এই সময়টা বিশেষভাবে একটি নিয়মিত জীবন যাপন করতে হবে এবং যখন যে রকম বিশ্রাম নেবার দরকার সেটি ঠিক মতন নিতে হবে। স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুবার পরে প্রথম দুবছরের ভেতরেই 'রিল্যাপস্' হবার অর্থাৎ অসুখের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা যদিও বেশী থাকে, কিন্তু পাঁচ, সাত, দশ, এমন কি পনের বছর পরেও 'রিল্যাপস্' হতে দেখা যায়। কাজেই এই সব সতর্কতা। কোনও প্রসিদ্ধ স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষগণ স্যানাটোরিয়াম থেকে মুক্ত রোগীদের পরবর্তী জীবন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যারা নাকি স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে টি. বি.র দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তারা সাধারণতঃ প্রথম দু' বছরের ভেতরেই মরে; কিন্তু যারা স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করবার পরে পাঁচ বছর বেশ ভালোভাবে কাটাতে পারে তাদের ভিতর খুব কম ব্যক্তিই পরে টি. বি.তে মরে। এই সময়টা "ভালোভাবে কাটাতে পারাটা"ই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়।

স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনর পরে রোগীর সর্বদা ডাক্তারের সংস্রবে থাকবার প্রয়োজন। মাসখানেক বা মাস দুই পর পর নিয়মিত বুক পরীক্ষা করতে হবে। কখনও গয়ের উঠতে থাকলে সেটা পরীক্ষা করান দরকার—যক্ষ্মাজীবাণু সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন করে নেবার জন্যে। রক্ত, থুতু ইত্যাদি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করাতে অন্যথা করা তাঁর উচিত নয় এবং পুনরায় তিন থেকে ছ'মাস পর পর বা ডাক্তার যে রকম বলেন, বুকের আবার এক্স-রে ফটো নেওয়া উচিত। স্যানাটোরিয়ামে রোগী যেভাবে ছিলেন ভবিষ্যতেও তাঁকে ঠিক সেই ভাবেই থাকতে হবে—মুক্ত এবং বিশুদ্ধ আলো-বাতাসযুক্ত ঘরে শয়ন, নিয়মিত সময়ে সব রকম উপাদান-মিশ্রিত পুষ্টিকর আহার্য গ্রহণ, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে প্রচুর বিশ্রাম—ইত্যাদি। কিছুকালের জন্যে থিয়েটার, সিনেমা, সভা-সমিতি ইত্যাদি এড়িয়ে চলা ভালো। এমন নতুন কোনও যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শেও আর তাঁর আসা উচিত নয় যাঁর অসুখ সক্রিয় অবস্থায় আছে এবং যিনি নাকি অসতর্ক, অপরিচ্ছন্ন এবং যিনি তাঁর জীবাণুপূর্ণ থুতু সম্বন্ধে কোনও-রূপ সাবধানতা অবলম্বন করেন না বা অপরের মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করতে জানেন না। রাত্রে বেশ শীগ্‌গীর করে শুতে হবে এবং ৮।১০ ঘণ্টা বেশ ভালভাবে ঘুমুতে হবে। ধূলি ধোঁয়া দ্বারা দূষিত এবং জনাকীর্ণ স্থানে রোগীর বাসস্থান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অন্য কোনও ব্যাধি—যথা সর্দি, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা—ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত না হতে হয়—সেদিকে রোগীর খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। রোগীর নিজের জন্য একখানা ঘর থাকবে এবং তিনি একাকী এক শয্যায় শয়ন করবেন।

দেখা যাচ্ছে যে স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনর দিনটি শুভদিন হলেও আবার ঠিক এই কারণেই দুর্দিনও বটে যে, বাইরের সমাজে রোগীকে মিশতে হবে প্রতি পদে পদে নিজের সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা নিয়ে,

পরাজিত ব্যাধি রোগীর কোন্ অবস্থা বিপর্যয়ে কোন্ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় করে নিজ মূর্তি ধারণ! এই সময় থেকে আরেকভাবে রোগীর দায়িত্ব আরও অনেক বেড়ে গেল। এতদিন তিনি যে রকম আব্‌হাওয়ার ভিতর ছিলেন, বাইরের আব্‌হাওয়া সে রকম নয়। হাসপাতালে ছিল শুধু তাঁকে সারিয়ে তুলবার আয়োজন এবং তাঁর নিজের সমস্ত চিন্তাও ছিল প্রধানতঃ সেই দিকেই নিবদ্ধ; কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরুনর পরে তাঁর নিজের সম্বন্ধে, পরিবারের সম্বন্ধে অথবা আরও দশটি বিষয়ে সহস্র চিন্তা তাঁকে করে তুলবে উদ্বাস্ত, হয়ত প্রধানতঃ আর্থিক কারণেই চিকিৎসকের উপদেশ যথাযথভাবে মেনে চলা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে। ফলে শরীর তাঁর আবার ভাঙবে। কতকগুলি অদ্ভুত, অনিবার্য অবস্থার ভিতর দিয়ে এতদিনকার চিকিৎসা, এতদিনকার তপস্যা, এতদিনকার বিপুল কৃচ্ছ্রসাধন সব যাবে ব্যর্থ হয়ে। রোগী যেন স্বপ্নেও না মনে করেন যে, হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চিকিৎসা অথবা আরোগ্যলাভ সমাপ্ত হল। স্যানাটোরিয়াম তাঁকে কেবল একটা 'ইকুই-লিব্রিয়াম' বা সাম্যের অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, এবং জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই কথা বলছেন যে রোগীর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবার বা টি. বি. কে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা স্যানাটোরিয়ামের কতখানি, চিকিৎসার শেষ ফলাফল দ্বারা এটা নির্ণয় হয় না; বস্তুতঃ নির্ণয় হয় স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা দ্বারা লব্ধ প্রতিরোধ-ক্ষমতাটাকে বা সাম্যাবস্থাটাকে সেই পারিপার্শ্বিকের ভাঙবার ক্ষমতা—যে পারিপার্শ্বিকের ভিতর স্যানাটোরিয়াম থেকে মুক্ত হবার পরে রোগীকে বাস করতে হয় এবং কাজ করতে হয়।

এই ব্যাধিগ্রস্তের এমন সব শোচনীয় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অনেক

সময় চলতে হয় যে তাঁর মনে এ রকম চিন্তা আসা স্বাভাবিক যে এই রোগ সত্যি সত্যিই সারে কি না। আগেকার দিনে এটা ছিল "শিবের অসাধ্য ব্যাধি" বলে খ্যাত। বর্তমানেও বহু লোকের ধারণা এর চাইতে অন্য রকম নয়। মনে হয় উপযুক্ত সময়ে ধরাও পড়ত না এবং ধরা পড়লেও চিকিৎসা সুষ্ঠুরূপে হত না, এবং ফলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য; তাইতেই লোকের মনে গড়ে উঠেছিল ঐ ধারণা। এই রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়াদি এবং এই রোগে চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্তমান কালে যতদুর অগ্রসর হয়েছে তাতে আধুনিক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞগণের মত হচ্ছে এই যে যক্ষ্মা একটা খুবই সেরে যাবার মতন রোগ। এটা পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, রোগ যদি উপযুক্ত সময়ে ধরা পড়ে এবং রোগী যদি উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে ধৈর্য ধরে যত দীর্ঘ দিন প্রয়োজন—কাটাতে পারেন তবে ১০০-করা ১০০টি রোগীরই ভাল হয়ে যেতে পারবার সম্ভাবনা থাকে! টাইফয়েড বা ডিপ্‌থেরিয়া বা অন্যান্য বহু রোগ সম্বন্ধেই যেমন একথা বলা যেতে পারে যে যথা সময়ে ধরা পড়লে এবং যথারীতি চিকিৎসা হলে এগুলিও সম্পূর্ণরূপে সাধ্য ব্যাধি, কিন্তু তার অন্যথা হলেই অসাধ্য—তেমনি টি. বি. সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যেতে পারে। যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার যে এত বেশী তার কারণ এটা মোটেই নয় যে না-সারাটা যক্ষ্মার একটা প্রকৃতিগত দোষ; বাস্তবিকপক্ষে যক্ষ্মারোগের আরম্ভটা এবং অগ্রসর হওয়াটা এমন নিঃশব্দে অনেক সময় হতে থাকে যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এর সন্ধান, রোগ-নির্ণয়, উপযুক্ত চিকিৎসা—ইত্যাদির ব্যবস্থায় বহু বিলম্ব ঘটে যায়। যে সব যক্ষ্মারোগী দীর্ঘকাল ভুগে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎক বলছেন যে, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও সময়ে এমন অবস্থা থেকে থাকে যখন সুব্যবস্থা হলে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারতেন!

রোগটা যখন টি. বি.—

যাঁদের কম অসুখ শুধু তাঁদের কথাই নয়, অধুনা সমস্ত বিশেষজ্ঞগণের মতই কম-বেশী এই ধরনের যে, যাঁদের অসুখ অনেকদুর এগিয়ে গেছে—এমন বহু রোগীকেও আধুনিক চিকিৎসা দ্বারা বেশ সুস্থ করে তোলা যেতে পারে—যদি নাকি বহুমূত্র অথবা অন্য কোনও ক্ষয়কারী এবং কঠিন ব্যাধি সঙ্গে যুক্ত হয়ে রোগীর অবস্থাটি জটিল না করে তোলে। এটা যে একটা কঠিন ব্যাধি তা কেউই অস্বীকার করেন না, কিন্তু হলেই যে অমনি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে রাম নাম জপতে হবে—এটাও অধুনা কেউ মানতে রাজী নন। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে এই রোগ থেকে সেরে যাওয়াটা অনেক সময়েই একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কোনও যক্ষ্মা-মুক্ত পালোয়ান যদি এই বলে আক্ষেপ করেন যে এর পরে আর হাতী বুকের উপর নেওয়া তাঁর পক্ষে যখন সম্ভবপর হবে না, তখন আবার এ অসুখ থেকে কিসের সারা, তা' হ'লেই অবিশ্যি মুস্কিল। নিয়ম-নির্দিষ্ট কাজকর্ম, অর্থোপার্জন করে সাধারণ সামাজিক জীবন যাপন এবং অন্য কাউকে আক্রান্ত না করে পূর্ণ জীবন-যাত্রার পরে স্বাভাবিক মৃত্যু—এইটেই আমি সেরে যাওয়ার মাপকাঠি ধরছি। যত শীঘ্র রোগ ধরা পড়বে এবং যত শীঘ্র ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, তত শীঘ্র কম অর্থব্যয়ে সেরে উঠবার সম্ভাবনা থাকবে এবং শারীরিক পঙ্গুতাও তত কম আসবে। যাঁদের অসুখ অত্যন্ত বেশী এগিয়ে গেছে এবং চিকিৎসাও যাঁদের আর ভালমত চলবার উপায় নাই—তাঁদের কথা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। সারার অনুপাতটা বাস্তবিক পক্ষে এই সব অবস্থার উপরেই নির্ভর করে: রোগীর বয়স, অসুখের অবস্থা এবং প্রকৃতি, রোগী চিকিৎসায় কি রকম সাড়া দিচ্ছেন এবং চিকিৎসা ঠিকমতন চলছে কিনা, তাঁর প্রতি তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহার, তাঁর আর্থিক সঙ্গতি, এবং তাঁর আপন

মনোবৃত্তি। (অসুখের "স্টেজ" সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে রোগ অল্পদূর অগ্রসর হলেও একেবারে নিশ্চিতই সেরে যাবে এমন নয়; এবং অসুখ খানিকটা বেড়ে গেলেও তার অর্থ নিশ্চয়ই এটা নয় যে রোগীর আর কিছুতেই ভাল হবার সম্ভাবনা নাই।)
সুচিকিৎসায় এবং যথা-নিয়মে থেকে বেশ ভাল হয়ে গেছেন, ভাল আছেন এবং ভাল কাজকর্মও করছেন—এমন অনেককেই আমরা ব্যক্তিগতভাবে জানি; অন্যের মুখেও অনেকেরই কথা শুনেছি; বইতেও অনেকের কথা পড়েছি। এঁদের জীবন থেকেই সব রোগীর আশান্বিত হতে হবে। যাঁরা ভাল হলেন না, যাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, যাঁদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সার্থক হল না, তাঁরাই সব নন, এবং শুধু তাঁদের দিকে তাকিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টাও নিতান্ত অযৌক্তিক ছাড়া আর কিছু নয়। এটা সত্যি কথা যে খাঁটি রকমের ষোল আনা আরোগ্যলাভ হয়ত সকলের জন্যে নয় এবং ঐ তথাকথিত "মাচ-ইম্প্রুভ্ড্"-এর অবস্থায় বহু অসন্তোষের ভাব নিয়ে যে অনেক রোগীকে দিন যাপন করতে হয় তাও সত্যি; কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা যে অনেক রোগীকেই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে তাঁদের জীবনকে অনেকটাই দীর্ঘ করে দিচ্ছে, তাঁদের বাইরেকার অনেককে আবার আরও খানিকটা ভাল করে যথেষ্ট কাজকর্মের উপযুক্ত করে দিচ্ছে এবং বিশেষজ্ঞেরা যে বলছেন অনেককে বেশ স্বাভাবিক অবস্থায়ই ফিরিয়ে আনা হচ্ছে—এসব দ্বারা এই-ই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই উন্নতিকে আর উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা চলবে না এবং অদূর ভবিষ্যতের জন্যে এর ভেতর বহু সম্ভাবনা যে নিহিত রয়েছে একথা সর্বাংশে স্বীকার্য। সব অসুখেই লোক মরে; টি. বি.তেও মরবে! অনেক অসুখ ভালও হয়, টি. বিও

তাই হচ্ছে এবং যতটা আপাততঃ হচ্ছে, ভবিষ্যতে তার চেয়ে আরও হবে!

বহু তথা-কথিত "সুস্থ" লোকের (পূর্ণ জীবন-যাত্রার শেষে মৃত্যুর পরে) দেহ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাঁদের শরীরে সেরে যাওয়া টি. বির চিহ্ন রয়েছে। তাঁদের জীবনে কখন যে তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, কখন যে তাঁরা ভাল হয়ে গিয়েছিলেন—কিছুই তাঁরা জানতেন না! তাঁরা আগাগোড়া সাধারণ জীবনই যাপন করে গিয়েছেন। টি. বির ক্ষত যে বেশ ভালভাবেই সারতে পারে এটা তার প্রমাণ। কিন্তু এ-রকমটা যাঁদের ঘটেছে তাঁদের কপাল ভাল। যাঁরা পীড়িত হয়ে পড়লেন তাঁদের নিয়েই গোল!

আরোগ্যলাভের পথ দীর্ঘ হতে পারে, মনের দৃঢ়তা এবং সাহসের কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা হতে পারে, কিন্তু এইটেই জেনে রাখা সব চেয়ে ভাল যে, রোগী অবশ্যই তাঁর সাধনার পুরস্কার পাবেন—কম বা বেশী।

রোগ আবার বেড়ে পড়াটাকে 'রিল্যাপ্স্' বলা হয়ে থাকে। এই রিল্যাপ্স্ যাতে না ঘটে, চিকিৎসার পরে তার জন্যে রোগীকে সর্বদা খুব সতর্ক থাকতে হবে। কখনও যদি সর্দিটর্দি করে বসে অথবা কাশির উপদ্রব শুরু হয়, তবে সেটা সম্পূর্ণ চলে না যাওয়া পর্যন্ত রোগী যেন বিশ্রামের ত্রুটি না করেন। সর্দিকে অবহেলা করা কখনই ঠিক নয়। সর্দি করলেই তাকে সারিয়ে ফেলবার জন্যে সব রকম চেষ্টা করতে হবে—অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা নিয়ে। সর্দি-রোগগ্রস্ত লোককে এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ সর্দি সংক্রামক ব্যাধি। সামান্য সর্দিকেই অবহেলা করলে পরে সেটা শেষে বহু অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—রোগীর জানা উচিত। বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ কখনও বৃষ্টি এলে রোগী যেন ভুলেও কখনও দৌড়

না মারেন—ভিজতে হয় ভিজবেন। রাস্তায় বেরুবার সময় রোদ থাকলে ছাতা নিতে কখনও ভোলা উচিত নয়, রোদে ঘোরা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফুসফুসের আক্রান্ত স্থান যখন সেরে আসতে থাকে তখন স্থিতিস্থাপকতাহীন নতুন তন্তু উৎপত্তির অর্থাৎ স্কার-টিস্যু দ্বারা নতুন ক্ষেত্র-গঠনের অবস্থাকে "ফাইব্রোসিস" বলে। চলন্ত বাস বা ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়া বা তাতে দৌড়ে ওঠা, অথবা প্ল্যাট-ফরমের উপর দিয়ে ছুটে ট্রেন ধরতে যাওয়া—ইত্যাদি ধরনের ছুটো চারটে অবিবেচনার কাজ এই ফাইব্রোসিসকে ফাটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট এবং এসব করতে গিয়ে বহু রোগী দীর্ঘ দিনের উপকার এক মুহূর্তে নষ্ট করে ফেলে রোগকে আবার বাড়িয়ে তুলেছেন।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্র—এমন কি আমাদের দেশেও এরোপ্লেনে যাতায়াত বিশেষভাবে শুরু হ'য়ে গিয়েছে। টি. বি. রোগীর পক্ষেও এরোপ্লেনে যাতায়াতের কথা অনেক সময়েই উঠতে পারে বা প্রয়োজনও হ'তে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এই কথাগুলি রোগীর জানতে হবে: যে রোগী এ. পি. নিচ্ছেন, ৪,০০০ থেকে ৬,০০০ ফিটের ওপরে উঠতে গেলে তাঁর কষ্ট হতে পারে, এবং ৯,০০০ ফিটে বুকে বিশেষ চাপ-বোধের সঙ্গে বেশ শ্বাসকষ্ট অনুভব ক'রতে পারেন। যাঁদের বুকে 'অ্যাটিশান' রয়েছে, ৬,০০০ ফিটের ওপর দিয়ে ভ্রমণ তাঁদের পক্ষে মোটেই উচিত হবে না বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ ক'রেছেন। প্লুরার ভেতর জল জমা অবস্থার রোগীদেরও এরোপ্লেন-ভ্রমণ উচিত নয়। তবে চিকিৎসা দ্বারা জল শুকিয়ে যাবার পরে অন্য স্বাভাবিক লোকের মতই তাঁরা "এয়ার-ট্রাভ্‌ল" ক'রতে পারেন। যাঁদের ফ্রেনিক বা থোরাকোপ্ল্যাস্টি অপারেশান হ'য়েছে এ. পি. চলবার রোগীদের মত তাঁদের পক্ষে অত কড়াকড়ির দরকার

এ বিষয়ে হয় না। একটি থোরাকোপ্ল্যাস্টির আর. এ. এফ. পাইলটকে ৩০,০০০ ফিট ওপরে নিয়েও তাঁর কোনও কষ্ট দেখা যায় নি। সাধারণ বিশ্রাম নিয়েই যাঁরা সুস্থ হ'য়েছেন তাঁরাও যে কোনও স্বাভাবিক লোকের মতই বিমান ভ্রমণ ক'রতে পারেন—যতটা ইচ্ছা উঁচু দিয়ে। তবে দীর্ঘ ভ্রমণে যেখানে অত্যন্ত ক্লান্তি বা অবসাদ আসে সেই ধরনের বিমান-ভ্রমণ সকলের পক্ষেই পরিত্যাজ্য। ঝড়-বাদল, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদিকে এড়িয়ে চলবার জন্যে সব বিমানকেই ৬,০০০ ফিটের অনেক উঁচু দিয়েই অনেক সময় চলতে হয়। কাজেই এ. পি.র রোগী বা সিক্ত-প্লুরিসিগ্রস্ত রোগী বিমান-ভ্রমণের আগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশ নিতে কখনই যেন অন্যথা না করেন। যে বিমানে "নর্মাল প্রেসার" ক্যাবিনের ব্যবস্থা আছে, সেটা অবিশ্যি নিরাপদ, এবং এই ক্যাবিনে এ. পি.র রোগীর ভ্রমণ চলতে পারে।

স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার পরে অনেক সময় রোগীর চেহারা এত ভাল হয় এবং তিনি এত ভাল বোধ করেন যে, সে রকম হয়ত আগে তাঁর জীবনে কখনই ঘটেনি। কিন্তু শরীরটা তাঁর যতখানি ভাল 'লাগে', আসলে তা ঠিক ততখানি 'ভাল' নয়। রোগী যেন সর্বদা স্মরণ রাখেন যে, যে সব পরিশ্রম অথবা 'ছোটখাট' যে সব অসুখ-বিসুখ, বা কোনও মানসিক অশান্তি বা দুর্ঘটনা একজন সুস্থ লোকের পক্ষে কিছুই নয়, তা বহু সময়েই তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন সুস্থ লোকের চেয়ে শরীর সম্বন্ধে অন্ততঃ একশ গুণ বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তাঁকে। কোনও কোনও যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ তাঁদের রোগীদের এই কথা বলেছেন যে, এমনভাবে তোমরা সতর্ক থাকবে যেন তোমাদের শরীরটা কাঁচের বাসনের মত ঠুন্‌কো! অপর একজন প্রসিদ্ধ যক্ষ্মাবিদের মত হচ্ছে এই যে রোগী

এবং তাঁর চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই সব চেয়ে নিরাপদ নিয়ম হচ্ছে—যক্ষ্মারোগের সক্রিয় হয়ে উঠবার প্রবণতা সর্বদাই বর্তমান থাকে—এইটে সব সময়ে মেনে নেওয়া। একথা প্রায় বলা চলতে পারে যে একবার 'ইন্‌ফেক্‌টেড্' হওয়া মানে সর্বদা 'ইন্‌ফেক্‌টেড' !

নিজেকে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত করে তোলাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর অসুখ পুনরায় বেড়ে পড়বার কারণ। রোগী যা-ই কিছু করুন না কেন, সেটা কাজকর্মই হোক, কথাবার্তা, গল্প-গুজোব-হাসি-আড্ডাই হোক অথবা অন্য কোনও রকম আমোদ-প্রমোদই হোক, তিনি যেন সর্বদা খেয়াল রাখেন যে, নিজেকে তিনি ক্লান্ত এবং অবসন্ন করে তুলছেন কি না। নিজেকে খুব বেশী পরিশ্রান্ত করতে থাকলে কিছু দিনের ভিতরেই শরীর আবার ভেঙে পড়বে। কোনও কিছু করার পরে ক্লান্তি বা অবসাদের ভাব আসে এটা লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব কাজের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে এবং নিয়মিত বিশ্রাম নিতে হবে। মাত্রা ছাড়িয়ে রোগীর কোনও কাজই চলবে না; শরীর বা মনের উপর কোনও রকম অত্যাচারই খাটবে না তাঁর। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের আপেক্ষিক মূল্য নিয়ে যখন তাঁর মনে দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত হবে, তখন যদি ভুলই করতে হয় তাহলে বেশী ব্যায়ামের চেয়ে বেশী বিশ্রাম নেবার দিকেই ভুল করা ভাল।

তবে একটা কথা না বলে পারা যায় না যে কতকগুলি রোগী আছেন যাঁরা খামখা বড় খুঁতখুঁতে হয়ে ওঠেন। দুনিয়ার অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে, সব কিছু থেকে আগ্রহ হারিয়ে তাঁরা কেবল সারা দিন রাত বসে বসে আর শুয়ে শুয়ে নাড়িই টিপছেন আর পঞ্চাশ বার থার্মোমিটারই মুখে গুঁজছেন। এই পাল্‌স্ ঘাটের জায়গায়

একষটি হয়ে গেল, এই টেম্পারেচার আটানুব্বুই পয়েণ্ট এক-এর জায়গায় আটানুব্বুই পয়েণ্ট দুই হয়ে গেল—এই নিয়েই দিন রাত ঘামাচ্ছেন মাথা। আর, কেউ কাছে এলেই শুধু তাদের প্রত্যেকের কাছে ওই-ই বলছেন দিনরাত—আর কোনও কথা নাই! অথচ বাস্তবিক-পক্ষেই হয়ত তাঁদের বুকের অবস্থা চমৎকার, চিকিৎসকও বেশ বেড়াতে-টেড়াতে বলেছেন; কিন্তু তাঁদের দুশ্চিন্তা আর যাচ্ছেই না! এসবও ভাল নয়। সর্বদা বেশ শান্ত ও সংযত মনে চলতে হবে, অথচ অকারণ এবং অন্যায় খুঁতখুঁতিকেও দিতে হবে না প্রশ্রয়। অবিশ্যি মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর দিন রাত রোগের কথা ভেবে ভেবে আর ভুগে ভুগে অনেক রোগীর এরকম বিভীষিকাগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও এ অবস্থাটাকে কাটানর প্রয়োজন।

রোগীর যদি সুস্থ হয়ে যাবার পরে পুনরায় সেই সব লক্ষণ কখনও প্রকাশ পায় যেগুলি নাকি রোগের সূত্রপাতে আবির্ভূত হয়েছিল তবে রোগী আর কালবিলম্ব না করে ডাক্তারকে দিয়ে বুক পরীক্ষা করাবেন। এমন হতে পারে যে, যে কোনও কারণেই হোক তাঁর অসুখ পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বেশী বাড়াবাড়ি কিছু হলে অবিলম্বে পুনরায় কোনও স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হওয়া সঙ্গত কিনা সেকথা ভাবতে হবে। ব্যাধির লক্ষণের কোনওটির পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে সতর্ক হতেই হবে—নতুবা তিনি অবিলম্বে নিজের গুরুতর ক্ষতি করবেন। হয়ত কোনও স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রয়োজন আদৌ না-ও হতে পারে। হয়ত কয়েকটি দিন বা সপ্তাহের সম্পূর্ণ বিশ্রাম বা সাধারণ একটু চিকিৎসা (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা) কিম্বা সাবধানতাতেই সাময়িক উপসর্গটি চলে যেতে পারে। কিন্তু যাই হোক না কেন, উপেক্ষা করা চলবে না কিছুই, এবং যথাসময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করতে হবে—

নিজের মঙ্গলাভিলাষী হলে। এই সময় বুকের একটা এক্স্-রে ফটো তুলবার ব্যবস্থা হয়ত বিশেষজ্ঞ নিশ্চয়ই দেবেন।

কিন্তু এ কথাগুলি বলবার পরেও আরও কথা বলবার আছে। অনেক সময় রোগ বেড়ে পড়বার সঙ্গে এই সব লক্ষণগুলির আদৌ কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। ফুসফুসে অতিরিক্ত 'ফাইব্রোসিস্' হয়ে যাবার ফলে 'এ. পি.' চিকিৎসার রোগীর অল্পেতেই হাঁফ ধরবার একটা অবস্থা দীর্ঘদিন অথবা চিরদিন থেকে যেতে পারে। 'থোরাকোপ্ল্যাস্টি' অপারেশান দ্বারা সুস্থ হ'য়ে যাওয়া কোনও কোনও রোগীর থুতুতে মাঝে মাঝে একটু আধটু রক্ত বা রক্তের ছিট্ দীর্ঘদিন থাকতে দেখা গিয়েছে। 'ব্রংকিয়েক্টেটিক্ কন্‌ডিশান' বলে নতুন একটি অবস্থার উৎপত্তির দরুন এক একটি ক্ষেত্রে এ রকম হ'তে দেখা যায়। এই অবস্থায় হঠাৎ কখনও একটু বেশী রক্তও হয়তো রোগীর মুখ দিয়ে উঠে যেতে পারে। কিছু বিশ্রামেই এটা আবার ঠিক হয়ে যায়। রোগের শুরুতে এবং সক্রিয় অবস্থায় যে সব লক্ষণ রোগীর দেহে প্রকাশ পেয়েছিল, রোগ ভালো হ'য়ে যেতে থাকবার অবস্থায় বা সেরে যাবার পরে, এবং বিশেষ ধরনের কয়েকটি চিকিৎসার পরিণতি হিসাবেও রোগীর দেহে সেই সব লক্ষণের কোনও কোনওটির আবির্ভাব বা উৎপাত যে কখনও কখনও লেগে থাকতে পারে এবং তা'তে রোগীর ভয় পাবার যে কিছুই নাই এবং রোগীর সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবারও যে কিছু নাই, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কর্তব্য এটা রোগীকে এবং তাঁর লোকজনকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া। কিন্তু পূর্বলক্ষণগুলির যে কোনওটিরই হোক না কেন—পুনরাবির্ভাব কেন ঘটলো সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা কর'তেই হবে।

বারে বারে রিল্যাপ্‌স্ ঘটনাটিকে রোগী যেন বেশী 'মজা' বলে ধরে

না নেন। দীর্ঘদিন অসুখে ভুগবার ব্যবস্থা করলে কপালে যে শেষে কত দুঃখ জমে থাকবে—তা রোগী প্রথমটা বুঝতেই পারবেন না। নিজের অর্থ শেষ হবে, ধৈর্য শেষ হবে, আত্মীয় স্বজনের সমস্ত সহানুভূতি শেষ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিরও ক্রমবিস্তৃতির ফলে সুস্থ হবার সম্ভাবনা ক্রমেই যাবে দূরে সরে। প্রথম বার সুস্থ হবার পরেই রোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, আপ্রাণ চেষ্টায় কি করে সেই সুস্থতাকে বজায় রাখা যায়। অসুখের শুরুতেও যেমন অনেক সময় অল্পেতে সন্দেহ আসে না, অনেক সময় অসুখের গতিকে রোগী বা তাঁর চিকিৎসক ধরতে পারেন না, রিল্যাপ্‌স্‌-এর বেলাতেও অনেক সময় এ ব্যাপার ঘটে। বাইরে কোনও লক্ষণের প্রকাশ না করে বা অনুভবযোগ্য কোনও অসুবিধার সৃষ্টি না করে চাপা অসুখ ধিকি-ধিকি করে ক্রমে ধূমায়িত অবস্থা থেকে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে, এবং অনিয়ম অত্যাচারের ফলাফল ধীরে ধীরে হলেও একদিন না একদিন নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়। প্রথমটা কড়াকড়ির ভিতর কাটিয়ে শেষে রোগী ভালভাবে একটু শক্ত হতে পারলে অনেক কাজই করতে পারেন জীবনে—ভবিষ্যতের জন্যে এখন তাঁকে তৈরী হতে হবে ধীরে ধীরে। এটা স্বাভাবিক যে দীর্ঘ অসুস্থতা ভোগ এবং এই অসুখের নানা রকম বিশ্বাসঘাতকতার চেতনা এবং অনেক সময় একটা অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কল্পনা রোগীকে বড় বেশী দমিয়ে দেয়। কিন্তু রোগীকে মনে রাখতে হবে যে মানুষের সমস্তটা জীবনই একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম। সমস্ত ব্যর্থতাগুলিকে তাঁর চলতে হবে ক্রমাগত ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে, যেটুকু হারিয়ে গেল তার জন্যে মনের খেদ না রেখে করতে হবে তাঁর নতুন প্রচেষ্টা। নিজেই টি. বি. গ্রস্ত মার্কাস্‌ অরেলিয়াস্‌-এর এই কথাটির ভিতর একটি গভীর অর্থ নিহিত আছে ঃ (আমার অনুবাদ) ঃ "যখন কোনও কিছু বড় বেশী কষ্ট-

দায়ক হয়ে ওঠে, এই কথাটি মনে রাখবেন—এই সব বিরুদ্ধ ঘটনা দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু নয়; একে ভালভাবে সহ্য করতে পারলে একটা সুবিধাজনক অবস্থার দিকেই মোড় ঘুরবে।"

বলেছি, অনেক সময়ে চিকিৎসার পরে রোগীকে ভারি স্বাস্থ্যবান বলে মনে হয়—যদিও ফুসফুসের অবস্থা এখনও হয়ত ততদূর সন্তোষজনক অবস্থায় এসে পৌছায় নাই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং বাইরের লোক রোগীর বাইরের চেহারা (যা নাকি অনেক সময়েই চোখ-ঠকান)—দেখে নিশ্চিতভাবে ধরে নেন যে, তিনি যে কেবল বিপদ থেকেই মুক্ত হয়েছেন তাই নয়, তাঁর অসুখ 'একেবারেই' ভাল হয়ে গেছে। তাঁরা চান যে, তিনি এখন লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপি করুন, সকলের সঙ্গে মিশে দল বেঁধে হল্লা করুন, আড্ডা দিন, প্রাণ হয়ে যাক একেবারে গড়ের মাঠ! তাঁরা চান—কাজকর্ম তিনি শুরু করে দিন পুরোদমে, পালন করুন সর্ববিধ সংসারধর্ম, সমাজে বাস করে সকলের সঙ্গে রক্ষা করুন বিভিন্ন সামাজিকতা। তিনি যখন চট্ করে এগুলিকে রাজী হন না, তিনি যখন সুস্থ লোকদের নানা রকম প্রচণ্ড অস্থিরতাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এড়িয়ে চলতে, তখন কেউই তাঁকে দেখেন না ক্ষমার চোখে। তিনি হয়ত একটা ভারী জিনিস তুলতে বা নামাতে অস্বীকার করেন, তিনি হয়ত দুপুর বেলাকার বিশ্রামের অবহেলা করে তাঁর তরুণী বৌদির সঙ্গে বসে বসে খোস-গল্প করতে সব সময় রাজী হন না, হয়ত তাঁর মেসোমশায়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গ্রামোফোনে দম লাগাতে প্রচুর ইতস্তত করেন, অনেক মিষ্টি অনুরোধ বা অভিমান সত্ত্বেও হয়ত তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে প্রতিদিন থিয়েটারে অথবা সিনেমায় যেতে প্রবল আপত্তি তোলেন, খানিকক্ষণ বেড়িয়ে টেড়িয়ে এসে অথবা অন্য কোনও পরিশ্রমের কাজ করবার পরে তিনি

হয়ত ঘণ্টাখানেক কি আধ ঘণ্টা বিশ্রাম না নিয়ে খেতে চান না, এক একদিন তিনি বিকেলের দিকে থার্মোমিটারটা মুখে গোঁজেন বা পাল্‌সটা একটু টেপেন, সর্দি-কাশির ভাব হলে হয়ত দু'চার দিন একেবারে বিছানা থেকে নড়তে চান না—এগুলি তাঁদের মনে করে প্রচণ্ড বিরক্তির উদ্রেক। তাঁরা বিদ্রূপের সুরে বলেন : ওসব ম্যানিয়া, আর কিছু নয়। কখনও হয়ত করেন আরও কঠোর মন্তব্য ; এমন একটা সুস্থ, জোয়ান লোক, এ রকম নড়তে-চড়তে চায় না, সব সময়ে কেমন-কেমন করে—এটা তাঁদের মনে জাগিয়ে তোলে ঘৃণার ভাবও। কেউ মন্তব্য করেন : ওসব মনের ব্যাধি। কেউ বা বলেন : ওসব প্রেমের ব্যাধি! তাঁরা মনে করেন -- আল্‌সেমি করে দিন কাটানর লোকটি পেয়েছে একটি ছুতো, তাঁর বিশ্রামকে বা শরীরের জন্যে অতিরিক্ত কোনও যত্নকে তাঁরা বিবেচনা করেন হাস্যকর বলে, করেন ভ্রূকুটি এবং নিন্দা। সকলের সহানুভূতি তিনি একে একে থাকেন হারাতে, এবং সকলের নানা ভুল-বোঝাবুঝির মাঝখানে তাঁর অবস্থা দস্তুরমত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বাইরের লোকে, এমন কি অনেক অজ্ঞ চিকিৎসকও এই ব্যাধির সূচনা থেকে আগাগোড়া এটাকে "মানসিক" আখ্যা দিয়ে (যখন রোগীর প্রচুর যত্ন এবং চিকিৎসা দরকার) রোগীর অবস্থা যে কি নিদারুণভাবে শোচনীয় করে তুলতে পারেন, তা নিউ ইয়র্কের জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত (অধুনালুপ্ত) আউটডোর লাইফ জার্নাল নামক পত্রিকায় এ. এম. পি. বলে একজন রোগী নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপূর্ণ "ফ্রম দি ফ্রাইং প্যান অব টি. বি. ইনটু দি ফায়ার অব নিউরাসথেনিয়া" নামক প্রবন্ধে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পড়লে শিউরে উঠতে হয়।

আরেক দল রোগীর, খুব সম্ভবত: অধিকাংশের, বিপদ আসে আরেক দিক থেকে। স্যানাটোরিয়াম-প্রত্যাগত রোগী হামেশাই এক শ্রেণীর লোকের

সংস্পর্শে আসেন—যাঁরা নাকি তাঁকে শেয়াল-কুকুরের চাইতেও বেশী হীন করে দেখবেন, এবং তাঁকে এড়ানর জন্যে তাঁরা কোনও রকম চেষ্টারই ত্রুটি করবেন না। টি. বি. হওয়ার দরুন সমাজে তাঁকে সাজতে হল একঘরে! কত আত্মীয় স্বজনের দ্বার যে এই রোগীর কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তা বলবার নয়। এঁরা শুধু একটা কথা জানেন যে, এই ব্যাধিটা ভীষণ রকমের একটা ছোঁয়াচে ব্যাধি এবং হয়ত বা এই রোগীর চোখে চোখ পড়বা-মাত্রই এই ব্যাধি এসে দেহে আশ্রয় নেয়। স্যানাটোরিয়ামে যাঁরা যান নি, তাঁরা বরঞ্চ কতক ভাল; কিন্তু স্যানাটোরিয়াম-ফেরতা রোগী মানে একেবারে দাগী রোগী ("দাগী" চোর বলে না? সেই রকম) —এবং সে রোগীকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়, তাকে আদর-আপ্যায়ন করা তো দূরে যাক! স্যানাটোরিয়াম-ফেরতার চলা-ফেরাকে যে তাঁরা কি ভীষণ সংশয়ের চোখে দেখেন, তাঁর সংস্পর্শে আসতে তাঁরা ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে যে কি রকম কানা-ঘুষো শুরু করেন তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। রোগী অনেক সময়েই বিড়ম্বিত হবেন—বিনা কারণে এবং বিনা বিচারে। যখন অসুখ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, থুতুতে দোষ নেই, তখন রোগী যে আর ইনফেক্‌শান ছড়ান না, নিজের এবং অপরের যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে স্যানাটোরিয়ামে তিনি বিশেষভাবে যা শিক্ষা করেছিলেন তা যে তিনি মেনে চলেন, তাঁর প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা, বুকের অবস্থা…যাই হোক না কেন, এঁরা সে সব কিছুই দেখবেন না, শুনবেন না, এমন কি বুঝতেও চেষ্টা করবেন না। একথা অবিশ্যি খুবই সত্যি যে, প্রত্যেক স্যানাটোরিয়াম-ফেরতা রোগীই একই রকম বিবেচক এবং বুদ্ধিমান নন এবং এটা অবশ্যই মানতে হবে যে বাস্তবিকই এমন অনেক রোগী আছেন, যাঁদের থুতুতে দোষ আছে অথচ অন্য সবাইকে নিরাপদ রাখতে তাঁরা কোনও রকম সহযোগিতাই করেন না এবং কোনও রকম কথায় বা

উপদেশে কর্ণপাত না করে তাঁরা ইচ্ছে করে এবং অত্যন্ত অসতর্কভাবে ইনফেক্‌শান ছড়াবেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকেই ভীতিপ্রদ বলে বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত? সর্বসাধারণের এটা জানবার দরকার যে, যে সব যক্ষ্মারোগীর থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু থাকে এবং তাঁরা যখন কেশে যেখানে-সেখানে গয়ের নিক্ষেপ করেন এবং সর্বদা অত্যন্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁরাই হন ঐ ব্যাধি-বিস্তারের জন্যে দায়ী। কিন্তু যে সব রোগী বিশেষ কোনও পাত্রে থুতু ফেলেন, সেই থুতু যথারীতি নষ্ট করে ফেলে দেন এবং সব সময়ে অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন তাঁদের থেকে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা নেই কিছুমাত্র। একজন রোগী যখন জোরে হাঁচেন বা কাশেন তখন ফুসফুসের গভীর তলদেশ থেকে নাক বা মুখ দিয়ে ছিটকে আসা জীবাণুপূর্ণ থুতুর কণা নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে কোনও সুস্থ লোক টি. বি. দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু যখন রোগী স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করেন, তখন তাঁর ব্যাধি যথেষ্ট দূর অগ্রসর হলেও, দেখা গিয়েছে তাঁর পরিত্যক্ত প্রশ্বাসে টি. বি.র "জন্তু" নিক্‌লায় না। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা না করে টি. বি. রোগীর নাম শুনেই তিড়িং ক'রে লাফিয়ে ওঠাটাকে হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না—বিশেষ করে উপযুক্ত চিকিৎসার পরে যখন তাঁর রোগ নিষ্ক্রিয় এবং থুতু অণুবীক্ষণের পরীক্ষায় জীবাণুশূন্য হয়ে যায়। উনুন থেকে রান্না ঘরে আগুন লাগবার সম্ভাবনা যতখানি, বাস্তবিক একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিমান রোগী থেকে একজন সুস্থ লোকের যক্ষ্মাক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও ততখানিই। অসতর্ক না হলে উনুনের আগুনে কখনই রান্নাঘর পোড়ে না; ঠিক সেই রকম নিতান্ত অসতর্ক না হলে কোনও রোগী দ্বারা অপরের দেহে কখনই ব্যাধি-বিস্তার ঘটে না। অধিকাংশ স্যানাটোরিয়াম-প্রত্যাগত রোগী এই জন্যেই সর্বদা নিরাপদ যে,

তাঁরা এই ব্যাধি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছেন, থুতু সম্বন্ধে যে যে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন—তা তাঁরা উত্তমরূপ আয়ত্ত করেছেন এবং স্যানাটোরিয়াম-জীবন তাঁদের ভিতরে জন্মিয়ে দিয়েছে একটি গুরুতর রকমের দায়িত্ব-বোধ। তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অথবা সমাজের কোনও লোকের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন—তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। তা ছাড়া স্যানা-টোরিয়াম, হাসপাতালে থাকবার ফলে তাঁদের অভ্যাসটাই এমন অনেক সময় দাঁড়িয়ে যায় যে, যেখানে সেখানে থুতু ফেলতে অথবা নিজেরা কোনও রকম নোংরা হয়ে থাকতে সর্বদাই তাঁরা কুণ্ঠিত হন। অবিশ্যি আমি আগেই বলেছি—একথা আমি কিছুতেই বলতে চাই না যে, স্যানা-টোরিয়াম, হাসপাতালের বা বাইরের কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা সব রোগীই এক ধাঁচের, সব রোগীই উপযুক্ত বিবেচনা-শক্তি এবং দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন; কিন্তু তাঁদের ভিতরকার অন্ততঃ কতক রোগীও যে এগুলি অন্যান্য অনেক রোগীর চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে অর্জন করে থাকেন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অভিজ্ঞতার ফলে এটা বোঝা গিয়েছে যে একজন রোগী সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা বহু রকমেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে এবং এই রকম পারি-পার্শ্বিকের মাঝখানে চিকিৎসার সুফল নষ্ট করে রোগীর নতুন করে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যের পুনরায় ভেঙে পড়া কিছুই বিচিত্র নয়! রোগী কতজনকে তাঁর অবস্থা বোঝাবেন? কতজনের কাছে বকে বকে কতজনকে তিনি আলোকিত করতে পারবেন? কখনও বা তিনি এমন মজার লোকও দেখতে পাবেন যাঁরা এদিকে বলবেন যে তাঁর অসুখটা একটা ম্যানিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তিনি একটু মিশবার চেষ্টা করবামাত্র তাঁকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে কোনও চেষ্টারই কসুর

করবেন না। অর্থাৎ নিজেদের মাঝখানে তাঁরা তাঁকে ফিরেও নিতে চাইবেন না, অথচ তিনি তাঁদের মাঝখানে ফিরে আসছেন না অথবা তাঁদের সঙ্গে সাধারণ সামাজিক জীবের মতন খাপ খাওয়াতে পারছেন না বলে তাঁকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়বেন না! একদল হয়তো জোর করেই রোগীটিকে নিজেদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন, কিন্তু বাড়ীতে কখনও যদি এক-আধটু সর্দি কাশি পরে কারুর হয়, তৎক্ষণাৎ তার টি. বি.র ইনফেকশান হয়েছে ধরে নিয়ে সব দোষ চাপাবেন রোগীটিরই ঘাড়ে! যাই হোক, রোগীকে বহু সময়েই এই দেখে বিস্মিত হতে হবে যে, তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে যে কত অদ্ভুত এবং বীভৎস ধারণা আছে—অথচ তাঁরা তাঁদের অজ্ঞতা চান না স্বীকার করতে। কতোভাবে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে, কিন্তু নিজের দিকে চেয়ে তাঁকে সংযত হতেই হবে—উত্তেজিত হলে চলবে না। মুষড়ে না পড়বার মতন সৎসাহস তাঁর অন্তরে রাখতেই হবে।

কখনও কখনও অবিশ্যি রোগী নিজের দোষেও নিজের ক্ষতি করে বসেন। বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্যানাটোরিয়াম, হাসপাতালে দীর্ঘদিন আটকে থাকাটা তাঁর মনের উপর একটি বিরুদ্ধ ক্রিয়া করে এবং এ সব জায়গা থেকে বেরুনর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সুস্থ লোকেদের সঙ্গে মহোৎসাহে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবার অদম্য আকাঙ্খা জন্মে তাঁর মনে—এই জীবনের পরিশ্রম এবং উত্তেজনার পরিণামের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে। স্যানাটোরিয়ামের বা হাসপাতালের একঘেয়ে আবহাওয়া থেকে যেই নাকি রোগী পা বাড়ান বাইরের মনোহর, কর্মব্যস্ত জগতে—অমনি সব সংযম আরম্ভ করেন তিনি হারাতে। কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে সব কিছু অতিরিক্ত রকম উপভোগ করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই ডেকে আনেন তিনি নিজের ধ্বংস—শীগগিরই হোক বা

একটু দেরিতেই হোক। কিন্তু বার বার যদি তাঁকে অসুস্থ হতে হয় তবে নানা দুর্গতি উঠবে তাঁর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে- এবং প্রত্যেকটি "রিল্যাপস্" তাঁর উপর অধিকতর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আর্থিক ক্ষতির ছাপ যাবে রেখে। স্যানাটোরিয়ামে যে ভয়ানক রকম কড়াকড়ির ভিতর দিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন, স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরোন-মাত্র অনেক রোগী আর্থিক অবস্থাঘটিত কারণেও (পূর্বে যার উল্লেখ একবার করেছি) সেই কড়াকড়িগুলির প্রতি উদাসীন হতে শুরু করেন—যেগুলি নাকি তাঁর কঠোরভাবে মেনে চলবার দরকার—স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরোঁবার পরে বহুকাল অবধি। পরিবার প্রতি-পালনের গুরু দায়িত্ব এই সময়ে এসে পড়তে পারে তাঁর উপর, অথবা তাঁর নিজের ব্যবস্থাও নির্ভর করতে পারে তাঁর নিজেরই পরিশ্রমের উপর —যা নাকি তাঁর ভাল থাকবার পক্ষে এখন অনুকূল না হওয়াই সম্ভব।

এবারে এই প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক। সুস্থ হয়ে উঠবার পর রোগীর নানা প্রকার ভাবনার ভিতরে অন্যতম প্রধান ভাবনা যে বিষয়ে এসে জোটে, সেটি হচ্ছে তাঁর কাজ-কর্ম সম্বন্ধে। যাঁর অর্থের কোনই অপ্রতুল নেই এবং খেলা-ধুলা, আমোদ-প্রমোদ, নভেল-নাটক নিয়ে যতকাল খুশি কাটাতে যাঁর কোনও অসুবিধা নেই, তাঁর কথা আপাততঃ এখানে আমি বাদ দিচ্ছি। কিন্তু যাঁর অবস্থা সে রকম নয়, সুস্থ হবার পর কাজ না করলে যাঁর চলবে না সেই রকম রোগীই সমস্যাস্থল এবং অবস্থাক্রমে সেই রকম রোগীর সংখ্যাই সকল দেশেই পূর্বোক্তদের চাইতে বহুগুণে বেশী।

কোন্ রোগী যে কি কাজের এবং কতখানি কাজের উপযুক্ত হবেন, তা তাঁর বুকের অবস্থাই যে সর্বদা নির্দেশ করে দেবে—একথা বলাই বাহুল্য। চিকিৎসার অব্যবহিত পরে রোগীর নিজের জন্য এমন কোনও কাজ বেছে

নেওয়াই ভাল বা নিজের কাজকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে নেওয়াই ভাল যাতে নাকি তাঁর খাটুনিটা অতিরিক্ত বা অনিয়মিত না হয়ে পড়ে। যে কাজে অতিরিক্ত রকম শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম নেই অথবা মুক্ত এবং বিশুদ্ধ আলো-বাতাসে থাকবার পক্ষে যে কাজ বিঘ্নের মতন এসে দাঁড়াবে না, রোগী সে রকম সমস্ত কাজেরই উপযুক্ত হতে পারেন, কিন্তু কাজে ঢুকবার পরে প্রথম প্রথম রোগীকে যে কত সতর্ক হয়ে থাকবার দরকার হয়, তা বলবার নয়; কারণ কিছুকাল কাজ করবার পরেই শরীর আবার খারাপ হতে শুরু করেছে, অথবা কমে-যাওয়া-রোগ আবার বেশ ভালমতন বেড়ে পড়েছে—এমন ঘটনা যে না ঘটে তা নয়। কিন্তু একজন সুবিখ্যাত যক্ষ্মাবিদ্ চিকিৎসক এই কথা বলেছেন যে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে "রিল্যাপস্‌টা" কাজের দরুন যতটা ঘটে তার চেয়ে বেশী ঘটে দিনের কাজের শেষে খেলাধুলো আর আমোদ-প্রমোদের দ্বারা। এই চিকিৎসকের কথাটি প্রত্যেক রোগীর খেয়াল রাখবার দরকার। যে সব রোগী কাজ-কর্ম শুরু করবেন, কাজ-কর্মের সময়টুকু বাদে দিনের অন্য অংশ সম্পূর্ণ বিশ্রামে অতিবাহিত করবার পক্ষে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। রবিবার অথবা এ রকম অন্য কোনও ছুটির দিনের সদ্ব্যবহার সর্বদাই সম্পূর্ণ বিশ্রাম দ্বারা করতে হবে। রোগী যেন কিছুতেই একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের এই কথা না ভোলেন যে, একজন আরোগ্যলাভকারী রোগী হয় কাজ করতে পারেন, না হয় খেলতে পারেন; কিন্তু দুটো একসঙ্গে করতে পারেন না!

অসুস্থ হবার আগে যাঁরা লেখা সংক্রান্ত কাজ করতেন, স্যানাটোরিয়ামে থাকতে থাকতেই স্যানাটোরিয়াম থেকে ছুটি পাবার কিছুদিন আগে থেকে তাঁদের অল্পে অল্পে খানিকটা করে লেখা অভ্যাস করা উচিত।

অসুস্থ হয়ে যাঁরা ছুটি নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে, এবং হাসপাতাল ছাড়বার ঠিক পরেই যাঁদের কাজে গিয়ে ভর্তি হতে হবে, তাঁদের পক্ষে ত এটা করা খুবই উচিত। স্যানাটোরিয়ামে সাধারণতঃ "ওয়াকিং এক্সারসাইজ-ই" দেওয়া হয়। হয় ত রোগী দু আড়াই মাইল হাঁটতে কোনই অসুবিধা বোধ করেন না এবং শরীরও তাঁর বেশ ভালই থাকে। কিন্তু আপিসে গিয়ে যখন কয়েক ঘণ্টা তাঁকে লেখার কাজ করতে হয়, তখন শরীর চট করে খারাপ হতে শুরু করে। হাঁটা-চলা এবং লেখাপড়া এ দুটো এক ধরনের পরিশ্রম নয়। যে ধরনের কাজ রোগীকে ভবিষ্যতে করতে হবে চিকিৎসা দ্বারা ক্রমে সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে দশ-পনের মিনিট থেকে শুরু করে ক্রমে সময় বাড়িয়ে সেই কাজটা খানিকটা অভ্যাস করে গেলে শেষে অতটা বেগ পেতে হয় না।

এখানে এই বিষয়টি একটু ভাল করে বোঝাতে চাই যে, বিশ্রামের অবস্থা থেকে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যাবার সময়ে রোগীকে সব সময়েই ধাপে ধাপে এবং একটা নির্ধারিত সময়ের ভিতর দিয়ে নিয়মিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। এটা বেশ ভাল রকম সহ্য হয়ে যাবার পরে শ্রমের সময়ের বা পরিমাণের কিছুটা এদিক ওদিক হলে, এবং সাধারণ জীবন যাপন করবার কালে তা হবেই, শরীর আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। শ্রম আরম্ভ করবার সময়ে যদি সেটা যখন তখন যেভাবে সেভাবে করতে থাকা যায় সেটার ফলও খারাপ হবে এবং সেটা উপযুক্ত পরীক্ষাও হবে না।

অনেক রোগী দীর্ঘকাল বিশ্রাম নেবার ফলে এবং নিষ্কর্মা হয়ে থাকবার ফলে খানিকটা কর্ম-পরাঙ্মুখ হয়ে ওঠেন—এমন কি অনেক সময়ে দস্তুরমতন কুঁড়ে হয়ে যান। আবার কেউ কেউ বা অসুখের

প্রকৃতি বুঝতে পেরে অথবা দীর্ঘকাল নানা রকম বাধা-নিষেধের ডোরে বাঁধা থাকার ফলে হয়ে ওঠেন খানিকটা ভীতু। মনে যেন থাকে যে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও কর্মানুরক্তি এক জিনিস নয় এবং সতর্কতা ও ভীরুতাও এক জিনিস নয়। রোগীকে কাজ করতে হবে, কিন্তু কোনও রকম মাত্রা ছাড়ান বাড়াবাড়ি নিষেধ; রোগীকে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্ববিধ যত্ন নিতে হবে, কিন্তু তাই বলে সত্যিকারের "ম্যানিয়া"তে সেটা গিয়ে না দাঁড়ায়—তা খেয়াল রাখতে হবে। "বিশ্রামের" সঙ্গে যেন "কুঁড়েমির" কেউ খিচুড়ি না করে ফেলেন। নিজের সীমা মেনে নিয়ে আপন কাজে রোগীকে লিপ্ত থাকতে হবে এবং শরীরের যত্ন ও কাজ দুটোই একসঙ্গে বেশ বিবেচনা করে চালাতে হবে। রোগী পূর্বে যে কাজ করতেন, তা যদি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হয় এবং যে পারিপার্শ্বিকের ভিতর কাজ করতেন, তা যদি তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনও ভাবেই অনুকূল না হয়, অথবা যে কাজের জন্যে তাঁকে হয়ত এই ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয়েছিল, সে কাজে আর তাঁর ফিরে যাওয়া সঙ্গত নয়। অর্থ উপার্জন কিছু কম হয় সেও ভাল তবুও এমন কাজ নিজের জন্যে বেছে নিতে হবে. যাতে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ আর কোনও মতেই না ঘটতে পারে। তবে আবার এ-ও দেখা গিয়েছে যে অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য কাজ করে রোগীর উপার্জন বেশ ভালো হবার দরুন তিনি খাওয়া-দাওয়া, থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে নিজের সম্বন্ধে বেশ ভালো বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন এবং অভাবের তাড়না না থাকায় মনের শান্তিও তাঁর অক্ষুণ্ণ আছে। অনবরত অভাবের কবলে থাকলে হয়তো তিনি শীগ্‌গীরই ভেঙে পড়তেন!

যে সব জিনিস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে এবং ফুসফুসে প্রবেশ লাভ করে নিশ্বাসের সঙ্গে, সে সব জিনিসের কাজ ক্ষয়-রোগীর পক্ষে ভাল নয়। ছুরি কাঁচি ইত্যাদি শান

দেওয়া বা তৈরি করা, চীনেমাটির বাসন প্রস্তুত করা, সোনা, কয়লা, অভ্র—এসবের খনিতে কাজ করা, চুন বা সুরকির গুদামে, ধুলো-ধোঁয়াময় মুক্ত-বায়ুহীন অন্ধকার কোনও ফ্যাক্টরিতে কাজ করা, পাটের আঁশ ছাড়ান, তুলো ধোনা, পাট বা শনের গুদামে, চাউলের কলে কাজ করা, শহরের রাস্তা, হাসপাতাল, আপিস ইত্যাদি ঝাঁট দেওয়ার কাজ করা, বিশেষ ক্ষেত্রে দরজীগিরি বা তাঁতের কাজ—ইত্যাদিও টি. বি. রোগীর পক্ষে মঙ্গল-জনক নয়। মুক্ত-বায়ু-শূন্য এবং অন্ধকার ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে ষ্টেশন-মাস্টারি বা ছাপাখানার কম্পোজিটারি বা কেরানীগিরি, ইত্যাদিও সমর্থনযোগ্য নয়।

অনেক ডাক্তারের মতে সুস্থ হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকা খুবই উচিত, যাঁদের সঙ্গতি আছে তাঁদেরও। নিষ্কর্মা অবস্থায় থাকবার ফলে মনে আসে নানা-রকম খাম-খেয়ালির ভাব—"অলস মস্তিষ্ক"টা ক্রমে পরিণত হয় শয়তানের কারখানায়। এবং নিজকে সুস্থ করে তুলবার পথে সে অবস্থাটা খুব অনুকূল নয়। কোনও ডাক্তার কর্মক্ষম টি. বি. রোগীদের সম্বন্ধে এমন কথাই বলেছেন যে বেতন না নিয়ে কাজ করাও ভাল তবুও একেবারে নিষ্কর্মা থাকা উচিত নয়। টি. বি. সংক্রান্ত একখানি বইতে একজন ডাক্তার লিখেছেন যে, তাঁর স্যানাটোরিয়ামের একজন রোগিণী—যাঁকে নাকি অত্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় রাখতে হয়েছিল—ক্রমে ক্রমে পড়েছিলেন বড় বেশী মন-মরা হয়ে। দিনরাত কি সব দুশ্চিন্তা করতেন, নানা রকম স্নায়বিক বিপর্যয়ও দেখা দিয়েছিল এসে। এই অবস্থায় ডাক্তার তাঁকে একটু একটু করে এটা-ওটা-সেটা হালকা কাজ করবার অনুমতি দিলেন। ক্রমে ক্রমে কাজে তিনি এমনি রস পেয়ে গেলেন, আর অল্প দিনের ভিতরেই তাঁর শরীর-মনের এত উন্নতি সাধিত হল যে, সবাই আশ্চর্য

বোধ না করে পারেননি। জনৈক সুবিখ্যাত যক্ষ্মা-তত্ত্ববিদ্‌ও বলেছেন যে নিয়মিত একটা কাজের ভিতর না থাকলে শারীরিক ক্রিয়ার কতকগুলি অবনতি পরিলক্ষিত হয়—এবং সেটা সাধারণভাবে সকলের বেলায় যেমন, যক্ষ্মারোগীর বেলাতেও তেমন। যে সব রোগী বেশ একটা নিয়মের ভিতর দিয়ে শারীরিক শ্রম-ঘটিত কাজ আরম্ভ করে চলতে থাকেন তাঁরা শীগগীরই বুঝতে পারেন যে তাঁদের দৈহিক বল আস্তে আস্তে কেমন বেশ ফিরে আসছে এবং তাঁদের এই বুঝতে পারাটার সঙ্গে থাকে আরেকটি মনোরম চেতনা—যা নাকি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে একটা নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে এবং দৈনিক কর্মপদ্ধতির ভিতরে শরীরকে থাপ খাইয়ে নেবার সঙ্গে। এবং একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রোগীর উপর এই রকমের দৈনিক কর্মপদ্ধতি একটা বিশেষ রকম অনুকূল নৈতিক এবং মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে সকলে জেনে বোধ হয় আমোদ পাবেন—পৃথিবীর বহু বড়লোক, বহু বিখ্যাত লোক, বহু কর্মী, গুণী লোক যক্ষ্মাগ্রস্ত ছিলেন। রোগীদের অনেককে একটু বেশী আবেগ-প্রবণ এবং মনীষাসম্পন্ন বলে দেখা গিয়েছে এবং অনেকে যক্ষ্মারোগের সঙ্গে প্রতিভার নিকট সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

শুধু এক সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে বেছে নেওয়া এই নামের তালিকাটি থেকেই দেখা যাবে যে এই ব্যাধি এবং সৃষ্টি-প্রতিভা, ও সেদিক থেকে পূর্ণতা-প্রাপ্তি কেমন পাশাপাশি চলেছে।

মিলটন, পোপ, হুড, কীটস্‌, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ফ্র্যানসিস্‌ টম্‌সন, গ্যেটে, শিলার, মলিয়ার, চ্যানিংস্‌, মেরিমি, থোরো, ডেকার্টে, লকি, কাণ্ট, স্পিনোজা, বোমণ্ট, স্যামুয়েল জনসন, স্টার্নি, ডি-কুইন্‌সি, স্কট, জেন অস্‌টেন, শার্লোটি, এমিলি এবং অ্যানি ব্রন্‌টি, স্টিভেনসান,

ব্যালজাক, ভলটেয়ার, রুশো, ওআশিংটন আরভিং, হথর্ন, গিব্সন, কিংস্‌লে, রাসকিন, ইমারসান, কার্ডিনাল ম্যানিং, সিড্নী লেনিয়ার, মেরি ব্যাশকার্টসেফ, রবার্ট সাউদি, ওয়েস্‌টকট্, জর্জেস্ ডি গুঁই, ডেভিড গ্রে, এমিয়েল, জন আর্. গ্রীন, রবার্ট পোলক, হানা মোর, জেম্‌স্ রাইডার র‍্যানডাল, এন. পি. উইলিস, জন অ্যাডিংটন সাইমণ্ড্‌স্, স্টিফেন ক্রেন, ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্‌ড, পল লরেন্স্ ডানবার, এবং ইউজীন ও' নীল।

এই তালিকার সঙ্গে সিসারো, ডেমস্থিনিস্, গ্যালেন, মার্কাস অরেলিয়াস, এড্গার এলান পো, শেকভ, ডস্‌টয়েভ্স্কি, শোপাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি—ইত্যাদির নামও যুক্ত হতে পারে।

হাড্সন, শ্লেটোব্রায়াণ্ড, মোজার্ট, রিউকার্ট, নোভালিস, ওআল্ট হুইট্‌ম্যান, আর্নেস্ট ডাউসন, ডি. এইচ. লরেন্স, হ্যাভ্‌লক্ এলিস, হেনলী, নোভালিস, বেরাঞ্জার, গিবন, গোল্ডস্মিথ—এঁরাও ছিলেন যক্ষ্মাগ্রস্ত।

পাঠক পাঠিকা জেনে বোধ হয় আমোদ পাবেন যে গোর্কির দেহে টি. বি.র উৎপত্তির কাহিনী তাঁর নিজের রচিত কাহিনীগুলির চেয়েও রোমাঞ্চকর। অনেক বছর আগে তিনি নিগ্নি নভগোরোড্ গভর্নমেণ্টের অধীন এক ক্ষুদ্র গ্রামে এসেছিলেন—এক ভবঘুরের বেশে। একদিন তিনি দেখতে পেলেন একখানা গাড়ির চারধার ঘিরে কতকগুলি গ্রাম্য লোক জটলা করছে। সেই গাড়ির সঙ্গে মাথার চুল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে একজন স্ত্রীলোককে। ঐ অবস্থায় তাকে হিঁচ্ড়ে টেনে নেওয়া হচ্ছে গ্রামের রাস্তাগুলিতে। কোনও নারী ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধিনী হলে তার প্রতি ছিল এই সুপরিচিত শাস্তির ব্যবস্থা। এই বীভৎস দৃশ্যে গোর্কির হৃদয় হয়ে উঠল আন্দোলিত, তিনি লোকগুলিকে থামতে বললেন। যখন তারা অস্বীকার করল, তিনি চালাতে থাকলেন তাদের

উপর ঘুষি। ক্রুদ্ধ গ্রামবাসী তাঁকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে ফেলে গেল চলে। তাঁর একটি দিককার বুককে তারা ভীষণভাবে জখম করে দিয়েছিল। সেই দিককার ফুসফুসেই যক্ষ্মা করল আত্মপ্রকাশ। বহু বছর তিনি কাটিয়েছেন মাত্র একটি ফুসফুস নিয়ে।

যখন তাঁর মৃত্যু হল, সেই গ্রামেরই সমস্ত লোক মিলে একখানা এরোপ্লেন ভাড়া করে তখন থেকে চল্লিশ বছর আগেকার উক্ত ঘটনা যারা চাক্ষুষ দেখেছিল এমন দুইটি ব্যক্তিসহ একদল প্রতিনিধিকে পাঠাল—গোর্কির মৃতদেহের সামনে অনুতাপ জানিয়ে আসবার জন্যে !

এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং গুরুতর শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে শুধু যে অবিরত লেখায় এবং পড়ায় অত্যদ্ভুত মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়, এবং প্রতিভাশালিনী কবি বলেই যে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাই নয়, দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর যক্ষ্মারোগকে শরীরে বহন ক'রে—এবং এই অবস্থায়ই প্রেমের গাঢ় পরিণতির ফলে কবি রবার্ট ব্রাউনিংকে বিবাহ ক'রে—সাংসারিক দিক থেকেও তিনি পত্নী ও মাতৃরূপে নিজেকে সুন্দর করে তুলেছিলেন ফুটিয়ে।

ডস্টয়েভ্স্কি আজীবন যুদ্ধ করে গেছেন বিপুল দারিদ্র্যের সঙ্গে, আর এই দুরন্ত যক্ষ্মারোগের সঙ্গে রাশিয়ায় বিপ্লবের আগুন উঠল জ্বলে, তাতে যোগ দিলেন ডস্টয়েভ্স্কি। সাইবেরিয়ায় হল তাঁর নির্বাসন। সেখানে তাঁর শারীরিক কষ্ট উঠেছিল চরমে। কিন্তু তাঁর মনের জোর ছিল অসাধারণ, তেজ ছিল তাঁর দুর্দমনীয়। আগেই তিনি বই রচনা করতে শুরু করেছিলেন, কারাগার থেকে বেরিয়ে আরও মরিয়া হয়ে লাগলেন সেই কাজে—একদিকে ক্ষুধার তাড়না, আরেক দিকে পাওনাদারদের তাগিদে উন্মাদ-প্রায় হয়ে। বিয়েও তিনি করেছিলেন

দুবার। প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরে যাঁকে বিয়ে করেন তাঁর দ্বারা তাঁর অনেক সহায়তা হয়েছিল। শেষের দিকে আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁর এসেছিল; এবং সমগ্র পৃথিবীতে অসামান্য খ্যাতির মাঝখানে করতে পেরেছিলেন তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত। ভীষণ রকম রক্তবমি করে একদিন তিনি শয্যা নিলেন, এবং সেই-ই হল তাঁর শেষ শয্যা নেওয়া।

জার্মানির অমর নাট্যকার জন ফ্রেডরিক শিলারও ছিলেন দীর্ঘকাল যক্ষ্মাগ্রস্ত। নাটক রচনায়, পত্রিকা পরিচালনায় তিনি করতেন কঠিন পরিশ্রম। বিদ্যা, জ্ঞান, অর্থ উপার্জনের জন্যে তিনি করেছিলেন কঠোর সংগ্রাম, অবস্থার ভ্রূকুটির প্রতি ছিল তাঁর অসীম উপেক্ষা। তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং হয়েছিলেন সন্তানেরও জনক।

ইংল্যাণ্ডের কবি জন কীটস্‌ও পড়েছিলেন এই ব্যাধির কবলে এবং অল্প বয়সেই হয় তাঁর জীবনান্ত। তাঁর মা এবং ভাইয়ের মৃত্যুও এই ব্যাধিতেই হয়। কিন্তু কীটস্‌এর ক্ষণস্থায়ী জীবনেই তাঁর প্রতিভা উঠেছিল বিকশিত হয়ে; তিনি জগৎ-কবি-সভার মাঝখানে গ্রহণ করেছিলেন একটি শ্রেষ্ঠ আসন!

কবি শেলীও যক্ষ্মাগ্রস্ত ছিলেন বলে অনেকেই জানেন। ১৮১৫ সালে ডাঃ ক্রুস্‌টোফার রবার্ট পেমবার্টন এমন কথাই বলেছিলেন যে ক্ষয়রোগে শেলী দ্রুতগতিতেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু আবার তেমনি দ্রুত "আশ্চর্যকর আরোগ্যলাভ"ও তাঁর হল। অনেকের মতে তাঁর রক্ত বমি করবার কাহিনীগুলি সবই কাল্পনিক, এবং শেলীর অনেক বন্ধুরা মনে করেন শেলী তাঁর অসুখের যে সব লক্ষণের জলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন, তার অধিকাংশই কল্পনা-প্রসূত ছাড়া আর কিছু নয়।

রোগটা যখন টি. বি.—

কেউ কেউ এমন কথাই বলেছেন যে অনেক চিকিৎসকের মতে যক্ষ্মাব্যাধি মনে একটা প্রেরণা আনে, এবং এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত না হলে খুব সম্ভবতঃ এড্‌গার এলান পো এবং রবার্ট লুই স্টিভেন্সান তাঁদের অপূর্ব, বিখ্যাত পুস্তকগুলি মোটে রচনা করতেই পারতেন না!

(স্টিভেন্সানের স্ত্রী ছিলেন বড় বুদ্ধিমতী এবং স্বামী সম্বন্ধে সতর্কতাও ছিল তাঁর প্রচুর। একবার তিনি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলেন যে স্টিভেনসানকে যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের কারুর সর্দি-জাতীয় কোনও ছোঁয়াচে অসুখ থাকলে তাঁর স্বামীরও সেই উপদ্রব এসে জোটে। একদিন তিনি দেখলেন যখন তাঁর স্বামীর চিকিৎসক ঘরে এসে ঢুকবেন তখন তিনি হাঁচছেন এবং তাঁর নিজেরই সর্দি করেছে। দেখবামাত্র মিসেস্ স্টিভেন্‌সন্ চিকিৎসককে কিছুতেই আর তাঁর কৃতী, সুবিখ্যাত রোগীর কক্ষে দিলেন না প্রবেশ করতে!)

কেউ বলছেন যে, বেশ ভাল করে গুছিয়েই একথা বলা যেতে পারে যে যক্ষ্মার বিষ নিশ্চিতভাবেই একটা মানসিক সজীবতার সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্কশালী ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রকারের উত্তেজনা এমন একটি জিনিসের জন্ম দান করে যা হয়ে থাকে একেবারে অভিনব, অপূর্ব। যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এটা নিঃসন্দেহরূপে কখনও প্রমাণিত হয় যে, যক্ষ্মার মতন ভয়ঙ্কর ব্যাধি মানব-প্রতিভার উচ্চতম দানের কাজে সুনির্দিষ্টরূপে সহায়ক হয়ে থাকে তা হলে আমাদের সামনে এই অদ্ভুত সমস্যা এসে দাঁড়াবে যে, সঙ্গীত বা সাহিত্যজগতের কতকগুলি প্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টিকে হত্যা করে এই ব্যাধিকে নির্মূল করবার চেষ্টায় আমরা সত্যিই লাভবান হব কিনা!

(যতদূর মনে পড়ছে, জার্মানির শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পী বিঠোফেনও ছিলেন একজন যক্ষ্মারোগী।)

সাহিত্যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান "নোবেল পুরস্কার" প্রাপ্ত ইউজীন ও' নীলের ভবিষ্যতও গড়ে উঠেছিল যখন তিনি একটি টি. বি. স্যানা-টোরিয়ামে ছিলেন চিকিৎসার্থে। তিনি নোবেল প্রাইজ পাবার পরে তাঁর সম্বন্ধে বেরিয়েছিল যে তাঁর স্বাস্থ্য, যা নাকি কোনকালেই সে রকম মজবুত ছিল না, এক সময়ে ভেঙে পড়ে পথ করে দিল জ্বর এবং যক্ষ্মার। ইচ্ছার ঘোরতর বিরুদ্ধে তাঁকে যেতে হল একটা স্যানাটোরিয়ামে এবং যক্ষ্মাব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে থাকতে হল সেখানে ছ'মাস। বাধ্য হয়ে এই যে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হল—ছদ্মবেশে এটা এল তাঁর জীবনে আশীর্বাদের মত। তিনি ভীষণ রকম পড়তে শুরু করে দিলেন—একধার থেকে একেবারে লোভীর মত। অবশেষে স্থির করলেন তিনি হবেন একজন নাট্যকার !······

উনিশশো পঞ্চাশ সালের একুশে জানুয়ারি যক্ষ্মারোগে মারা গিয়েছেন সুবিখ্যাত প্রগতিবাদী লেখক জর্জ অরওয়েল। জর্জ অরওয়েল দীর্ঘকাল যক্ষ্মাগ্রস্ত ছিলেন, তাঁর নানা রচনা বেরিয়েছে অসুস্থতার ভেতরেই। জীবনের শেষ বছরটি কাটাতে হয়েছিল তাঁর হাসপাতালে, আর এই হাসপাতালে থাকার অবস্থাতেই তিনি "হরাইজন্" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদিকা সনিয়া ব্রনওয়েলকে বিয়ে করেন।

প্রকৃতপক্ষে যক্ষ্মাব্যাধির ফলে অন্য কিছু থেকে এই অবসরের সুযোগে অনেক ব্যক্তির ভিতরেই যে প্রতিভা ও সামর্থ্য আবিষ্কার করা গেছে—তা আগে থাকতে হয়ত কল্পনাই করা যায়নি! এই সব রোগী তাঁদের জীবনকে দেখেছেন একটি নতুন দৃষ্টি দিয়ে; এবং যখন তাঁদের বন্ধু-বান্ধবেরা এখানে-ওখানে বাজে দৌড়োদৌড়ি করে অকারণ বহু সময়, সুযোগ এবং শক্তির অপব্যয় করেছেন তখন তাঁরা করেছেন তাঁদের শক্তিকে সাবধানে রক্ষা এবং নিয়ন্ত্রিত।

রোগটা যখন টি. বি.—

যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে অনেক রোগীই নিজেদের মনে করেন অসহায় বলে এবং হয়ে ওঠেন দুঃখবাদী ; কিন্তু অন্য অনেকে এঁদের দলে না ভিড়ে নিজেরা চেষ্টা করেছেন প্রফুল্ল থাকতে এবং নিজেদের ভেতর খুঁজে পেয়েছেন অনন্ত সম্ভাবনা ! হোমার বলেছেন— বিশ্রামটাও অতিরিক্ত হলে পরে সেটা একটা বেদনাদায়ক ব্যাপার হয়ে ওঠে। অনেক রোগীই হোমারের পক্ষ সমর্থন করে নিজেদের অসুস্থ অবস্থার মুণ্ডপাতই দিন রাত করবেন। কিন্তু অনেক রোগীই ইচ্ছা করলে নানাভাবে এই সময়টার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। জীবনের ব্যস্ততার মাঝখানে চারিপাশের অনেক জিনিসই তাঁরা লক্ষ্য না করে চলে গেছেন, কিন্তু এই অবসরের মুহূর্তে তারই কোনওটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে—হয়ত সামান্য একটি জিনিসের ভিতর দিয়েই তাঁরা সহসা পেতে পারেন একটি বৃহত্তর রহস্যের সন্ধান—যা নাকি তাঁদের চালনা করতে পারে নিজের জীবনকে নতুন ক'রে আবিষ্কারের পথে !

এমন কোনও কোনও রোগীর কথা জানা গেছে, যাঁরা অসুস্থতার সময়ে মাসিক পত্র, দৈনিক পত্র বা অন্যান্য নানা কাগজ বা বই থেকে অনেক প্যারাগ্রাফ বা ছবি কেটে কেটে সংগ্রহ করেছেন বা কোনও কোনও বিষয়ের নোট্ নিয়েছেন। অবশেষে একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংগ্রহকে তাঁরা নানা বিচিত্র উপায়ে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ বা তাঁদের এমন অবস্থারই মাঝখানে অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নিয়ে এমন কিছু গড়ে তুলবার দেখছেন স্বপ্ন, যা নাকি মানবকল্যাণে ভবিষ্যতের দরবারে একটি স্থায়ী আসনে হবে প্রতিষ্ঠিত !

অনেক মনোসমীক্ষণবিদ্-যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ যক্ষ্মারোগীর মানসিক প্রতিক্রিয়া-

গুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন যে অধিকাংশ যক্ষ্মারোগীর ভিতরে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলে ভাববার একটা প্রবণতা দেখা যায় এবং এই হীনতাটাকে ঢাকবার জন্যে এবং নিজেদের ক্ষতিগুলিকে পূরণ করে নেবার জন্যে তাঁরা অতিরিক্ত রকম চেষ্টা এবং কাজ আরম্ভ করে দেন। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের ভেতরে যক্ষ্মারোগের আধিক্য বিশেষভাবেই দেখা যায়। কে জানে এই সব বহু বিখ্যাত ব্যাক্তিগণের অসামান্য প্রতিভা নিজেদের হীনতার চেতনাকে অতিরিক্ত চাপা দেবার প্রতিক্রিয়ারই পরিণাম কিনা! কেউ কেউ বলেছেন যে অনেক রোগীর ভেতর বেজায় রকম একটা ফুর্তিবাজ হবার এবং জীবনটাকে বেশ সহজভাবে নিয়ে সবার সঙ্গে মিলে আনন্দ উপভোগ করবার যে প্রবল প্রচেষ্টা দেখা যায় সেটাও আর কিছু নয়, সেটা শুধু তাঁদের অবচেতন মনের একটা গভীর নিরাশা এবং আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে আপ্রাণ চেষ্টায় দমন করবার চেষ্টারই একটা অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া মাত্র। যক্ষ্মাগ্রস্তদের ভেতরে বহু বড় বড় চিকিৎসকও আছেন। ফিরিস্তি বাড়াবার আর প্রয়োজন দেখি না। অনন্যসাধারণ কর্মী এঁদের সকলেই। স্টেথোস্কোপের আবিষ্কর্তা ল্যেনেক স্বয়ং ছিলেন যক্ষ্মাগ্রস্ত। যক্ষ্মা-জীবাণুর সন্ধানদাতা রবার্ট কখ-ও ছিলেন তাই! অ্যামেরিকায় স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার প্রবর্তক, য়ুনাইটেড্ স্টেট্স্এর ন্যাশ্নাল টিউবারকিউলোসিস্ অ্যাসোসিয়েশানের সর্বপ্রথম সভাপতি, প্রত্যেক অ্যামেরিকানের কাছে অমর এবং চিরস্মরণীয় ডাক্তার লিভিংস্টোন ট্রুডো যক্ষ্মাগ্রস্ত অবস্থায় এমন কথাই লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীতে : (আমার অনুবাদ) : "যক্ষ্মাব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম আমাকে এমন সব অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে এবং আমার ভিতর এমন সব

স্মৃতি রেখে গিয়েছে, যা অন্য কোনও প্রকারেই আমি কোনও দিন লাভ করতে পারতাম না এবং যা নাকি আমি ইন্‌ডিজ্‌-এর সমস্ত ধন সম্পদের সঙ্গেও বিনিময় করতে প্রস্তুত নই!" (এবং বর্তমানেও এই অ্যাসোসিয়েশানের কয়েক জন সুবিখ্যাত কর্মী ও যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এক কালে নিজেরাই এই রোগগ্রস্ত ছিলেন!)

বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, চিকিৎসা, রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের দেশেরও অনেক সুপরিচিত লোক যক্ষ্মাব্যাধির কবলে পড়েছেন; কিন্তু ব্যাধিকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে রেখে নিজেদের কাজ এবং সার্থকতার পথেই চলেছেন তাঁরা এগিয়ে।

যে সব কথা লেখা গেল এগুলির নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে এবং এই ব্যাধির এই বিশেষ দিকটা নিশ্চয়ই আমাদের যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে। যাঁদের কথা উল্লেখ করা গেল এঁদের জীবন থেকে (এবং আমাদের জানা স্বদেশ এবং বিদেশের আরও অনেক অপেক্ষাকৃত অল্প-বিখ্যাত, মৃত বা জীবিত, এবং জীবনের বিভিন্ন পথে কর্মনিরত ব্যক্তিগণের অথবা যক্ষ্মাগ্রস্ত অন্যান্য অবিখ্যাত সাধারণ সংসারী ব্যক্তিগণের জীবন থেকে) আমরা এটা অবশ্য বুঝতে পারি যে যক্ষ্মা মাত্রেই যে জীবকে অকর্মণ্য ক'রে ফেলে তা ঠিক নয়, এবং পৃথিবীর বহু লোক যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়েও গুরু কার্য সম্পন্ন করে গিয়েছেন ও এখনও যাচ্ছেন। অনেকেরই সংবাদ হয়ত আমরা রাখিনা—যাঁরা এই রোগের কবলে পড়েও কিছুমাত্র না দমে এবং এবং এই রোগের ভ্রূকুটিকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে তাঁদের অপূর্ব কীর্তি দ্বারা মরণকে গিয়েছেন জয় করে। কিন্তু তত্রাচ এঁদের জীবন সব সময়ে যে সাধারণ লোকের মনে তেমন আশা এনে দেয়না এটা স্বীকার না করে উপায় নাই। আমাদের সমস্ত সমস্যাটাকে সব দিক থেকে একত্র করে দেখতে হবে এবং

তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে নানাভাবে। দুঃখের সঙ্গে একথা বলতেই হবে যে, মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি যক্ষ্মারোগী এমন কর্মময় জীবন যাপন করে গিয়েছেন, চিন্তা জগতে যাঁদের দান অসামান্য এবং যাঁরা চিরকালের জন্যে হয়ে রয়েছেন জগদ্‌বরেণ্য, তাঁদের তুলনায় শোচনীয়ভাবে অক্ষম, অসহায় এবং নিরুপায় হয়ে ও চিরব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর বহুজনের দেহে এই ব্যাধির বিষ সঞ্চারিত করে দিয়ে যে সব যক্ষ্মারোগী অকালে শুকিয়ে ঝরে গেছে, তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। এক ধরনের মুষ্টিমেয় জনকতক লোকের দিকে তাকিয়ে অবস্থাবিশেষে সাময়িক এক রকমের সান্ত্বনা হয়ত পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে আসল সমস্যাকে কোনও মতেই উপেক্ষা করা চলেনা। এ ছাড়া, যে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের উল্লেখ এই মাত্র করা হয়েছে এঁদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাধির অবস্থাটাকে বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে পেরেছিলেন কিনা অথবা সব রকম অবস্থাতে সকলের কাছেই এই ব্যাধিটি সব দিকে সব সময়ে সুবিধাজনক ছিল কিনা এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ রয়েছে। মনে হয় যক্ষ্মাগ্রস্ত না হয়েই এঁদের বড় হওয়াটা সকলের কাছেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় হত !

এবারে বুকের টি-বির চিকিৎসায় "ক্লাইমেট" সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা যাক। আমরা জানি, এই বিষয়টি নিয়ে অনেকের মনে অনেক রকমের ধারণা আছে।

জনৈক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ বলছেন :

"সভ্যতার আদিম যুগ হইতেই যক্ষ্মারোগ বর্ত্তমান। হয়ত পুরাকালে রোগের মাত্রা এত অধিক ছিল না। রোগী বেশী বয়সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইত—বেশী বয়সের ব্যাধি হঠাৎ প্রাণঘাতী হইত না।

"সেই সময় হইতেই স্থান পরিবর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে এবং সে ধারণা আজও অবিকৃত অবস্থায় চলিতেছে। প্রাচীন গ্রীসের যক্ষ্মারোগীরা মনে করিত ঈজিপ্টে প্রস্থান করিলে রোগমুক্ত হইব। ঈজিপ্টের লোকদের ধারণা ছিল—গ্রীসই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর স্থান—যক্ষ্মারোগ নিরাময় করিতে হইলে সেইখানেই যাওয়া প্রয়োজন। দূর প্রদেশের একটা মোহ আছে এবং দূরে থাকিতে পারিলে রোগমুক্ত হওয়া যাইবে, এ ধারণা অন্য ব্যাধি সম্বন্ধেও ঘটে তবে যক্ষ্মারোগে বিশেষ করিয়া এ ধারণা প্রচলিত।"

বাস্তবিক, জনসাধারণের শতকরা নিরেনব্বই জন লোকের মনেই এই ধারণা আছে যে, যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট জল হাওয়াযুক্ত স্থান অত্যাবশ্যক এবং তার চিকিৎসা যে সাধারণ রকমের একটা ক্লাইমেটে হতে পারে অনেকে একথা শুনেই নাক সেঁটকান! তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, টি-বি হলেই "চেঞ্জে" চলে যেতে হবে খুব ভাল একটা জায়গায়। এবং ক্লাইমেটকে তাঁরা "পূজো" করবার যোগ্য বলে মনে করেন। অধিকাংশ ডাক্তারও বুক পরীক্ষা করে দোষ দেখবামাত্র এ যাবৎ ফট্ করে এই কথাই বলে আসছিলেন—যান চলে মশাই দেওঘর, মধুপুর, সিমলে অথবা পুরী। যেন যক্ষ্মারোগীর পক্ষে সবচেয়ে এইটাই আগে কর্তব্য—আর সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে; এবং সচরাচর এই-ই দেখা গিয়েছে যে জমান টাকা না থাকলে ভূসম্পত্তি বিক্রি করে, গহনা বন্ধক দিয়ে অথবা বিভিন্ন বীভৎস উপায়ে টাকা ধার করতে হলেও তাই করে রোগী চলে গেছেন দেওঘর, মধুপুর, সিমলে অথবা পুরী! কিন্তু একজন টি-বি রোগীর চিকিৎসা বা একটি স্যানাটোরিয়াম নির্মাণ একেবারে "স্পেশাল" রকমের কোনও ক্লাইমেটেই করতে হবে—এ মত আজকাল একেবারে

উল্টে গিয়েছে। বস্তুতঃ যে কোনও "ক্লাইমেট"-এই রোগীর উন্নতি হতে পারে যদি নাকি সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য, আরাম, মনের পরিমিত শান্তি, যথোপযুক্ত চিকিৎসক এবং চিকিৎসা—ইত্যাদির অভাব না ঘটে এবং অন্যান্য অবশ্য-পালনীয় নিয়মগুলির প্রতি তিনি কখনও অবহেলা প্রদর্শন না করেন। প্রকৃতপক্ষে টি-বির চিকিৎসায় ক্লাইমেটের প্রয়োজন শতকরা পাঁচভাগের বেশী নয়—আর খুব বেশী হলেও বড় জোর দশ ভাগ। যাঁরা এই অসুখ থেকে ভাল হবার জন্যে অন্যান্য সমস্ত বিষয়গুলিকে উপেক্ষা ক'রে শুধু "ক্লাইমেট" ধরে করেন টানাটানি, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে তা দ্বারা তাঁরা অন্নের মোহে ভূমাকে দিচ্ছেন বিসর্জন এবং করছেন মারাত্মক রকমের একটা ভুল। বাস্তবিকপক্ষে রোগী পাহাড়ে থাকুন, সমতল প্রদেশে থাকুন, বা যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকুন, আসল চিকিৎসা কোথাও তাঁর ঠেকে থাকবে না। হাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে "ওজোন" থাকবার দরুন সমুদ্রের ধারে থাকা বিশেষ উপকারী, বহুর মনে আছে এই ধারণা। কিন্তু এটা জানা গিয়েছে যে, 'ওজোন'-এর টি-বি সারাবার আদপেই কোনও ক্ষমতা নাই। এই রোগের কোনও কোনও অবস্থায় সমুদ্রবায়ু রোগীর উন্নতির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল বলেও অনেক চিকিৎসক মন্তব্য করেছেন।

"ওজোনের" আলোচনা করতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় অক্সিজেনের মূল্য এবং উপকারিতার উপর বহু যক্ষ্মা-চিকিৎসক দীর্ঘকাল ধরে বিশেষ জোর দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আসলে দেখা গিয়েছে যে যক্ষ্মারোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের একটুখানি উন্নতি-বিধান করা ছাড়া এই ব্যাধিকে সারাবার বিশিষ্ট কোনও ক্ষমতা অক্সিজেনের কিছুমাত্র নাই। অধিকন্তু এও অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে অক্সিজেন-সঞ্চালন বেশী হবার দরুন ফুস্‌ফুসের "টিস্যু"গুলির ভিতরে

অবস্থিত নির্জীব যক্ষ্মাজীবাণুগুলি বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং আপনা-দিগকে বর্ধিত করবার সুযোগ পেয়েছে। এটা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে এই জীবাণুগুলির পক্ষে বাঁচবার এবং শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে অক্সিজেনের অবশ্য প্রয়োজন—অক্সিজেন ছাড়া এদের জীবন চলেনা। কাজেই সম্পূর্ণ শয্যা-বিশ্রাম দ্বারা অথবা আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা ফুসফুসের পতন ঘটিয়ে এই রোগের চিকিৎসা, অন্যান্য কারণ বাদেও এইজন্যেও একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে, এই সব প্রক্রিয়া দ্বারা ফুসফুসে অক্সিজেন-সরবরাহকে অনেক কমান বা রুদ্ধ করা যায়।

পাহাড়িয়া জায়গায় বেড়াতে গিয়ে অনেক রোগী কোথাও ব'সে হাঁ ক'রে ক'রে "অক্সিজেন" গিলে খাচ্ছেন এমন কৌতুকাবহ ব্যাপারও অনেক সময়ে চোখে পড়ে যায়।

কেউ আবার অতিরিক্ত শুক্‌নো, খট্‌খটে আবহাওয়ার খোঁজে পাগল হয়ে ফেরেন। কিন্তু অ্যামেরিকার সারানাক বা অ্যাডিরন্‌ডাক্‌স্‌-এর স্যানাটোরিয়ামগুলির চিকিৎসকেরা দেখতে পেয়েছেন যে, সেখানকার মেঘলা, কুয়াসাচ্ছন্ন, বরফ এবং বৃষ্টিভরা, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও রোগীদের উন্নতি অন্য কোনও জায়গায় স্থাপিত কোনও স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের চেয়েই কম সন্তোষজনক নয়। একজন বিশিষ্ট অ্যামেরিকান যক্ষ্মারোগী একবার যা বলেছিলেন এখানে তার অনুবাদ করে দিচ্ছি: "কানেক্‌টিকাট ক্লাইমেট—যেখানে নাকি আমি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছি—কোনক্রমেই অনবদ্য নয়। এখানকার আবহাওয়াটা কি রকম যেন খেয়ালী আর পরিবর্তনশীল, গরমের দিনে বিশ্রী এবং স্যাঁতসেঁতে, এবং চারিদিকে কেমন একটা বদ্ধ, গুমোট ভাব। শীতের দিন-গুলোও বড় ঠাণ্ডা আর চট্‌চটে রকমের। যে স্যানাটোরিয়ামে এখন আমি "পড়ুয়া" হয়ে রয়েছি এটি যখন প্রথম স্থাপিত হয়েছিল

(এই স্টেট্‌এ এইটিই সর্বপ্রথম স্যানাটোরিয়াম)—লোকে এই বলে নাসিকাকুঞ্চন করেছিল যে এমন "ক্লাইমেটেও" আবার টি. বি. ভাল হতে পারে! অথচ, এখানে রোগীদের আরোগ্যলাভের অনুপাত অনেক উচ্চ-প্রচারিত স্থানের অনুপাতেরই সমান—যদি তাদের অনেক-গুলিরই চাইতে বেশী না-ও হয়! গত ৩১ বছর ধরে এই স্যানা-টোরিয়ামে যত রোগীর চিকিৎসা হয়েছে, তাদের শতকরা ৮৪ জনই আজও বেঁচে আছে—যা নাকি একটা বিশিষ্ট রকমের রেকর্ড। অবিশ্যি একথা সত্যি হতে পারে যে অনেক ক্ষেত্রে যখন রোগীর অপর কোনও উপসর্গ (যথা হাঁপানি)—থাকে, তখন তার পক্ষে একটা ঠাণ্ডা রকমের শুষ্ক, অচঞ্চল ক্লাইমেট্‌ই ভাল হতে পারে; কিন্তু যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে শুক্‌নো খট্‌খটে হাওয়া বা পার্বত্য উচ্চতার চাইতে যেটার মূল্য অনেক বেশী তা হচ্ছে প্রত্যেক রোগীকে আলাদা-ভাবে বিচার করে তার অবস্থা এবং প্রয়োজনানুযায়ী বুদ্ধি, বিবেচনা এবং কৌশলের সঙ্গে তাকে নাড়াচাড়া করা।"…

এই আবহাওয়াতে রোগী সুস্থ হতে পারে আর এই আবহাওয়াতে পারে না, অথবা টি-বির চিকিৎসার জন্যে এই আবহাওয়াটা ওই আবহাওয়াটার পাশে দাঁড়াতেই পারেনা—এ সব বলা ভুল। যে কোনও আবহাওয়াতেই রোগীর উন্নতি বা অবনতি ঘটতে পারে। অন্য সব যদি সম্পূর্ণরূপে অনুকূল হয়, তবে রোগী সব চেয়ে খারাপ "ক্লাইমেট"-এও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, এবং অন্য বিষয়গুলি যদি সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল হয়, তবে সর্বোত্তম "ক্লাইমেট"-এও রোগীর সুস্থ হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। অবিশ্যি স্থান-পরিবর্তনের যে একেবারেই কোনও মূল্য নাই একথা স্বীকার করেন না কেউই। অনেক সময়ে নতুন জায়গার নতুন দৃশ্য, নতুন পরিবেশ মনের উপরে যথেষ্ট অনুকূল ক্রিয়া করে।

রোগটা যখন টি. বি.—

একথা সত্যিই অস্বীকার করা যায়না—এমন কতকগুলি "ক্লাইমেট" আছে যা শরীরকে বাস্তবিকই বেশ ঝরঝরে করে। প্রকৃত কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানকে কেউ যে ছোট করে দেখবে তা ঠিক নয় এবং রোগী এমন জায়গায় সব দিকে সুবিধাজনকভাবে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁকে নিরুৎসাহ করবারও অন্যভাবে কিছুই নাই। একটা গরম, স্যাঁতসেঁতে ধরনের আবহাওয়ায় অনেকে যে শরীরটাকে বড় বিশ্রী বোধ করেন এ কথা মিথ্যা নয়। যে সব জায়গায় দিনগুলো অনবরত মেঘলা থাকে এবং বৃষ্টি বাদলাও লেগে থাকে সর্বক্ষণ, সে সব স্থানও অনেকের কাছে প্রীতিকর না হওয়া স্বাভাবিক—যখন নাকি দিনের পর দিন তাঁকে ঘরের ভিতর এক বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করতে হয়। চারিদিক বেশ রোদে ভরা, শুকনো, ঠাণ্ডা—অথচ স্যাঁতসেঁতে নয়, মুক্ত বায়ু সেবনে কোনও অসুবিধা নাই—এমন একটি জায়গায় থাকা রোগী নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন এবং এ রকম একটা মনোহর আবহাওয়ার ভিতর থেকে টি. বি.র সঙ্গে লড়াই করাটাও তাঁর পক্ষে কম কষ্টকর হবে। শীতল, শুষ্ক হাওয়াযুক্ত পাহাড়িয়া স্থানের গুণ এই যে সেখানে চর্মের তাপ এবং জলীয়তা দূর হয়ে শরীরের বেশ একটা ঝরঝরে ভাব হয় এবং যক্ষ্মারোগে শরীরকে রক্ষা করবার কাজে "লিম্ফোসাইট" কোষগুলির সংখ্যা রক্তে বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া সমতল প্রদেশের অনেক স্থান ধূলি, ধোঁয়া দ্বারা দূষিত—কিন্তু পাহাড়ে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যালোক পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু রোগী যখনই "চেঞ্জ"-এ যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠবেন, অথবা যখনই একজন ডাক্তার তাঁকে "চেঞ্জ"-এ যাবার উপদেশ দেবেন, তখনই রোগী এই বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে দেখবেন: এক বছর বা ছয়

বছর "চেঞ্জ"-এ থাকবার টাকা তাঁর অনায়াসে সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা; যেখানে তিনি যেতে চান, সেখানে পুষ্টিকর, বিশুদ্ধ এবং রকমারি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের পক্ষে কোনও অসুবিধা হতে পারে কিনা; সেখানে তাঁর পরিচর্যার কোনও প্রকার ত্রুটি হওয়া সম্ভব কিনা; এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সন্ধান—যাঁর অধীনে তিনি নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারেন—সেখানে মিলবে কিনা; সেখানে বাসাবাটি উপযুক্তরূপ মিলবে কিনা, বাইরের কাজকর্ম করে দেবার জন্যে বিশ্বাসী এবং নির্ভরযোগ্য কোনও ব্যক্তিকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব হবে কিনা; নিজের স্থান এবং নিজের লোকজন থেকে দূরে থেকে সাংসারিক কোনও দুশ্চিন্তায় অথবা প্রিয়জনদের বিরহে অথবা অন্য কোনও ভাবে সর্বদা তাঁকে কাতর থাকতে অথবা মনের বহু রকম অশান্তি নিয়ে থাকতে হবে কিনা। যদি রোগী মনে করেন যে, এগুলির উত্তর তিনি সন্তোষজনকভাবে পাচ্ছেন না, তা হলে তিনি কোনও "আদর্শ"-স্থানীয় প্রদেশে "চেঞ্জে" যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে বাড়ীতে নিশ্চিন্ত মনে চিকিৎসা চালাতে পারেন—বাড়ীতেই তিনি ভাল হবেন। বস্তুতঃ রোগীর আর্থিক অবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য না রেখে তাঁকে ভাল, ব্যয়-বহুল কোনও স্থানে চলে যেতে বলা কোনও চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত অবিবেচনার কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। যাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করতে সক্ষম এবং যাঁদের পক্ষে চেঞ্জে গিয়ে নিজেদের সর্ববিধ আরামের মধ্যে রাখা এবং চিকিৎসার সর্ববিধ উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব—তাঁরা চেঞ্জে যেতে পারেন, আপত্তি নাই; কিন্তু যে রোগী প্রচুর অর্থব্যয় করে ভাল" কোনও স্থানে যাবার সামর্থ্য রাখেন না তিনি যে কোনও জায়গাতেই নিরাপদে থাকতে পারেন—যদি নাকি জায়গাটিতে ধুলো-ধোঁয়ার উৎপাত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ না থাকে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্য কোনও

ভাবে অস্বাস্থ্যকর, অপরিচ্ছন্ন না হয়। স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে যেতে হলেও এই ধরনের জায়গায় যে সব টি-বি স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতাল স্থাপিত, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত থাকলে সেখানে ইতস্তত: না করে চলে যেতে পারেন। ভাল একটা "ক্লাইমেটে" যাওয়া মাত্র রোগী সুস্থ হবেন—এ-রকম ম্যাজিক টি. বি.তে ঘটে না! "ক্লাইমেট"—তা সে যত খ্যাতিসম্পন্নই হোক—সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলা যায় যে হলে ভাল, না হলে ক্ষতি নাই এবং রোগীর এই ভেবেও আফসোস করবার দরকার নাই যে তিনি এমনতর একটি স্থানে বাস করবার সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। চিকিৎসার অপর অঙ্গগুলি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য এবং দেখতে হবে সেগুলি বজায় থাকছে কি না।

কেউ কেউ এমন মত প্রকাশ করছেন যে, রোগীর যে "ক্লাইমেট"-এ সর্বদা অথবা অধিকাংশ সময় ভবিষ্যতে থাকতে হবে, তাঁর চিকিৎসা এবং আরোগ্যলাভ ঐ "ক্লাইমেট"-এই হওয়া উচিত। কেউ বা বলছেন, যে রকম "ক্লাইমেট"-এ থেকে রোগী সুস্থ হলেন, রোগীর উচিত সেই "ক্লাইমেটে"ই পরে আরও থাকতে চেষ্টা করা। এতে আরোগ্যটা অধিকতর স্থায়ী হবে।

গরম দেশে গ্রীষ্মকালে রোগীর বিশ্রাম নেবার বড়ই কষ্ট হয়। পাল্স, টেম্পারেচার অনেক সময় বেড়ে যেতে চায়, রাত্তিরে ঘুমও হয়ত ভাল হতে চায় না। ওজনও এই সময়ে বাড়তে চায় না। যে সব জায়গা বেশ ঠাণ্ডা, অতিরিক্ত গরমের সময়ে সে রকম কোনও জায়গায় গিয়ে রোগী থাকতে পারেন। কিন্তু এক উঁচু পাহাড় ছাড়া আমাদের দেশে সব স্বাস্থ্যকর জায়গাগুলিতেই বড় বেশী গরম—গ্রীষ্মকালে। বেশী জ্বরবিশিষ্ট বা রক্তবমনকারী রোগীর পক্ষে উঁচু পাহাড় ভাল নয়—এই ধারণা বহুর মনে আছে। কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞের মতে এটা সমর্থনযোগ্য

নয়। পেটের গোলযোগ, বহুমূত্র, হার্ট বা কিড্‌নীর ব্যাধিযুক্ত রোগীর পক্ষেও উঁচু পাহাড় সুবিধাজনক নয়, এ রকম মত আছে, কিন্তু এ মতও সর্বাংশে সত্য কিনা তাতে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। রোগীর বয়স, রোগের প্রকৃতি, বিস্তৃতি, আনুষঙ্গিক রোগ এবং শরীরের অন্যান্য যন্ত্রাদির অবস্থা বিবেচনা করে সুচিকিৎসকই পরামর্শ দিতে পারেন—কোথাকার জলবায়ু কোন রোগীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আবার সব রকম রোগীই যে স্থান পরিবর্তন পছন্দ করেন তাও নয়। এমন অনেক "নার্ভাস্" রোগী আছেন যাঁদের স্থান পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ একটা ভয়ের ভাব থাকে। কাজেই রোগীর ব্যক্তিগত প্রকৃতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার যে সেদিক থেকে স্থান পরিবর্তন তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর হবে কি না। কোনও কোনও সমুদ্রতীরে সব সময়েই প্রায় ঝড়ের মত হাওয়া বইতে থাকে। এই সব স্থানে যদি কোনও রোগী থেকে থাকেন, তবে এই ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা বিরক্তিকরভাবে সোজা এসে গায়ে না লাগে সে বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। যে সব জায়গার জলে পেট ভাল থাকে এবং ক্ষুধা বাড়ে, সে সব জায়গা নির্বাচন করাও রোগীর পক্ষে মন্দ নয়।

আর, নতুন কোনও আবহাওয়ায় গিয়ে প্রথম কিছুকাল রোগীর বেশ সতর্কভাবে থাকা উচিত—যতদিন পর্যন্ত না তাঁর সেটা বেশ সহ্য হয়ে আসে। একটা জলবায়ু থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম জলবায়ুতে এসে সেটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শরীরের একটু শক্তির ("রেজিস্‌টেন্‌স্") প্রয়োজন। নতুন স্থানে এসে অন্ততঃ প্রথম দু তিন সপ্তাহকাল একেবারে চুপচাপ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের ত্রুটি কোনোমতেই ঠিক নয়—বুকের অবস্থা বেশ ভাল হলেও। পাহাড়ে ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় বড় বেশী; গায়ে যেন সর্বদা বেশ গরম জামা-কাপড় থাকে। তাই বলে ঘরের এক

কোণে আগুন জালিয়ে দরজা জানালা একেবারে বন্ধ করে "আরামে" ঘুমুবার দুর্বুদ্ধি রোগীর যেন না হয়। ঘরের অগ্নি-রক্ষার স্থানকে ব্যবহার করতে হলেও উপযুক্ত বায়ু-চলাচল যাতে ঘরের ভিতরে হয় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে—হাজার শীত থাকলেও। নিজেকে রক্ষা করতে হবে উপযুক্ত শীত-বস্ত্র দ্বারা; দরজা জানালা বন্ধ করে নয়।

যদি কোনও রোগী নতুন জায়গা দেখবার জন্যে একেবারে বদ্ধ-পরিকরই হন অথবা একটা ভাল 'ক্লাইমেট'-এ চেষ্টা করবার জন্যে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হন, তবে নিয়মিত চিকিৎসাটা সুসঙ্গতভাবে শেষ করেই যেন তা করেন। স্যানাটোরিয়াম দ্বারাই অনেক সময় তাঁর সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। 'ক্লাইমেট' যদিও যক্ষ্মার চিকিৎসায় 'অমোঘ ঔষধ' গোছের কিছুই নয়, তা হলেও এটা অবিশ্যি সবাই মানছেন যে সাধারণভাবে এর একটা প্রভাব যক্ষ্মারোগীর উপর আছে। সুপ্রসিদ্ধ একজন যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞের মত এখানে অনুবাদ করে উদ্ধৃত করে দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করছি :

'ক্লাইমেটের পক্ষে এবং বিপক্ষে সব কিছু বলা হ'য়ে যাবার পর সাধারণ জ্ঞান দ্বারা এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে যে,, যক্ষ্মার চিকিৎসায় এর কিছু স্থান আছে। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় ক্লাইমেটের প্রাধান্যকে কিছুতেই স্বীকার করবার দরকার নাই; কিন্তু এটার সামান্য কিছু উপকারও যদি থেকে থাকে তবে তা থেকে কোনও রোগীকে বঞ্চিত করা উচিত নয়—যদি নাকি সে তার আরোগ্যলাভের জন্যে অপরাপর অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির সঙ্গে এটিকে সংযুক্ত করতে পারে"।......

এই ব্যাধিসংক্রান্ত নতুন বিষয় এই অধ্যায় লিখতে চেষ্টা করবার প্রারম্ভে এই কথা মনে আসছে যে, এই রোগের স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাই কি একমাত্র চিকিৎসা? অন্য কোনও পন্থা কি এ ছাড়া আর নাই?

বাস্তবিক, যখনই টি-বি হবে তখনই স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসায় অথবা যিনি স্যানাটোরিয়ামের নিয়মে বাইরে থেকে চিকিৎসা করেন এমন কোনও চিকিৎসকের পিছন পিছনই ছুটতে হবে কিনা অথবা অন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করাও একই রকম, অথবা অধিকতর সঙ্গত হবে কিনা—সেটা নিয়ে গোলোক-ধাঁধায় পড়া বিচিত্র নয়।

এই রোগের স্যানাটোরিয়াম পদ্ধতিতে চিকিৎসাই 'একমাত্র চিকিৎসা' এবং নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—এটা হয়ত সত্যি হতেও পারে হয়ত নাও হতে পারে। কতজনের কথা কানে আসে—কেউ সেরেছে কবিরাজীতে, কেউ হোমিওপ্যাথীতে, কেউ কোনও এক ভৈরবী ঠাকুরুনের টোট্‌কায়, কেউ দৈনিক অথবা মাসিকের কোনও এক পাতার সচিত্র, সাড়ম্বর বিজ্ঞাপনের এক আদি এবং অকৃত্রিম টনিকে, কেউ স্বপ্নাদ্য মাদুলি ধারণ করে, কেউ বাবা তারকনাথের সামনে হত্যে দিয়ে, কেউ বা তর্কপঞ্চানন অথবা বিদ্যেবাগীশ মশায়-কৃত ঊনপঞ্চাশ টাকা সওয়া পাঁচ আনা খরচের এক বিপুল শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জোরে, কেউ বা মানিক-পীরের সিন্নি চেটে।

তবে অনেক রকম চিকিৎসা বা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অনেক রকম সন্দেহ আসবারই যেমন কারণ আছে অনেক, তেমনি অন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসার চাইতে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসায় এবং অন্য

সর্বপ্রকার চিকিৎসকদের চাইতে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপরে আমাদের বিশ্বাস থাকবার কারণও আছে অনেক। একথা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে বলা যেতে পারে যে, সব চাইতে বেশী সংখ্যক লোকের সব চাইতে বেশী উপকার একমাত্র স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা দ্বারাই সাধিত হয়েছে এবং আমাদের এই প্রতীতি দৃঢ়ভাবেই জন্মেছে যে, অন্য 'সব রকম' চিকিৎসকদের চাইতে এই রোগ নির্ণয়ের দিক দিয়ে হোক, চিকিৎসার দিক দিয়ে হোক— অনেক অধিক কৃতকার্যতা লাভ করেছেন স্যানাটোরিয়াম-পন্থী চিকিৎসকগণ। রোগীর আরোগ্যলাভের ব্যাপারেও এঁদের মতামতের উপর যতখানি নির্ভর করা চলে, এতখানি অপর কারুর মতামতেরই উপর করা চলে না এবং অনেক সময়েই এঁদের মতামত যতখানি সুযুক্তিপূর্ণ, এতখানি অপর কারুরই নয়। বহু সুধী চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকের অসংখ্য বিষয়ে গভীর গবেষণাপ্রসূত অসংখ্য আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনা স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার ক্ষেত্রে যত কাজে লাগান হয়েছে এমন আর কোনটাতেই হয়নি।

যদিও কোনও রকম চিকিৎসা-প্রণালীর উপর বিদ্রূপের কটাক্ষ্যপাত ঠিক না হতে পারে, কিন্তু টি-বি থেকে ভাল হবার সোজা পথ সত্যি সত্যিই যে ক'টা আছে, তা বিচার করবার বিষয়। আমরা যখন কোনও টি-বি রোগীর সম্বন্ধে জানতে পাই যে, তিনি একেবারে ভালভাবে সেরে গিয়েছেন তখন অবিশ্যি তাঁর সেই 'সারা'টার উপরেই আমাদের মূল্য দেবার চেষ্টা বেশী হয়—সারবার 'উপায়'টা তাঁর যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, এবং অ্যালোপ্যাথী, হোমোপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী, ক্রোমোপ্যাথী, হেকিমী, কবচ, তাবিজ, তেল-পড়া, জল-পড়া, ফুস্‌মন্তর, অবধৌতিক— আছে অবিশ্যি অনেক কিছুই; কিন্তু কোনটা যে সত্যি করে কতটুকু

কার্যকরী, এবং কোন্‌টার আসল মূল্য যে কতখানি, সেটা যাচাই করে নেবার মতন শিক্ষা এবং ধৈর্য আছে ক'জনের? নিরাময় হবার জন্যে রোগী যে পথই বেছে নিন না কেন, তাঁকে শুধু একটি কথা বলবার আছে। তিনি যেন কখনই আত্মপ্রতারণা না করেন। তিনি যে ধরনের চিকিৎসকের কাছেই যান না কেন, তাঁর মতামতকে তাঁর কঠোরভাবে নিতে হবে যাচাই করে। রোগ-নির্ণয় সঠিকভাবে হল কিনা, চিকিৎসা-প্রণালীর ভিতরে সব দিকে সঙ্গতি থাকছে কিনা, বুকের উন্নতি যথেষ্ট সুস্পষ্ট কিনা, এগুলির প্রতি বুদ্ধিমান রোগীর তীব্রভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাতুড়ে এবং অসাধু লোকের অভাব নাই, তারা চারিদিকে রয়েছে ওৎ পেতে বসে। এদের হাত থেকে রোগীর নিজেকে বাঁচাতে হবে। নিজের অসুস্থ জীবনে যে সময়েই তাঁর যে খটকা উপস্থিত হবে, তা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই যেন তিনি সন্তুষ্ট না থাকেন এবং যে সে লোকের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, এবং নিশ্চিন্ত মনে একটি গুরুতর ব্যাধি নিয়ে ছেলেখেলা করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে না আনেন।

স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা-পদ্ধতির অনেক জিনিস বর্তমানে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকেরাও গ্রহণ করেছেন, এটা কোনও কোনও বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ হাসপাতালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

মাসিক বা দৈনিকের পাতা খুললেই আজকাল যক্ষ্মারোগের অসংখ্য অব্যর্থ মহৌষধের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। যে কোনও রোগীকে অথবা রোগীর আত্মীয়স্বজনকে এই সব মহৌষধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন আছে। যে ওষুধের গ্যারান্টির জোর যত বেশী রোগী যেন মনে রাখেন যে সেই ওষুধ অনেক সময়ে ঠিক ততখানিই বাজে এবং সে সব ওষুধ ব্যবহার করে শুধু যে কিছুমাত্র ফল হবে না

এবং বৃথা কতকগুলি পয়সা নষ্ট হবে তাই নয়, অনেক সময় হয়ত একটা অনিষ্টও ঘটে যেতে পারে।

যক্ষ্মারোগী তাঁর অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজনের মুখে মেলাই 'দৈব' এবং পেটেণ্ট্ ওষুধের খবর পাবেন অনেক সময়ে; এবং সে সব ব্যবহার করবার জন্যে উপক্রত হবেন। বহু শিক্ষিত এবং বিবেচক লোককেও অনেক সময় এই সব তথাকথিত 'দৈব' এবং অসার পেটেণ্ট্ ওষুধের মোহে পড়তে এবং অযথা সময়ক্ষেপ করতে হয়। এ সব সম্বন্ধে বিস্তারিত কোনও মন্তব্য আর না করে এইটুকু শুধু বলতে চাই যে, স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাটা আগে করে নিয়ে তারপরে ফলাফল দেখে যেন রোগী অপর যা হয় করেন। সারাটাই অবিশ্যি হল আসল—যিনি যেভাবে পারেন আপত্তি নাই; কিন্তু রোগী নিজের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে যেন সর্বদা থাকেন সচেতন এবং অগ্রসর হন যেন সব দিক বুঝে এবং বিচার করে।

হঠাৎ এক এক সময়ে আমরা অবিশ্যি কোনও কোনও ওষুধ বা কোনও কোনও চিকিৎসা-পদ্ধতি ক্ষেত্র বিশেষে কোনও কোনও রোগীকে ভাল করেছে—এটা দেখতে পাই বা জানতে পাই; কিন্তু সময়ের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এগুলির কোন্‌টা যে কতদিন টিকবে সেটা দেখবার বিষয়। এগুলি যেন অনেকটা আগাছার মত জন্মায়, মহীরুহের মহত্ত্ব এদের কোথায়?

স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাটা অ্যালোপ্যাথিক লাইনে হলেও এর একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে এবং যে কোনও অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এই লাইনের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এই রোগে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার যত দোষ ত্রুটিই থাক, বিশেষ একটা 'কেস্'-এ রোগের অবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা—ইত্যাদি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের ভেতর (রোগীকে বিব্রত করে) যত মতদ্বৈধই ঘটুক, এবং এখনও এই চিকিৎসা-পদ্ধতির

অবস্থা যত অপরিণতই হোক—আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলব যে, এই চিকিৎসাই বর্তমানে নিঃসন্দেহরূপে সাধন করছে 'প্রচুরতম রোগীর প্রভূততম হিত' এবং বিশেষভাবে আশা করা যায় যে, সুদূর ভবিষ্যতেও সে তাই-ই করবে—এই ক্ষেত্রের মনীষিগণের অশ্রান্ত গবেষণা এবং একাগ্র চেষ্টার ফলে। অস্ত্রচিকিৎসাদির কথা যা বলেছি তার ভিতরকার কোনও কোনওটি যথেষ্ট কার্যকরী হলেও তার প্রয়োগ এখনও অতিশয় বিপজ্জনক এবং রোগীর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। অনেকগুলি তো প্রাথমিক এবং পরীক্ষামূলক অবস্থাই এখনও উত্তীর্ণ হয়নি। এখনও সেগুলির সৃষ্ট নানাবিধ উপসর্গ নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা চিন্তান্বিত। সব চিকিৎসা সবার ক্ষেত্রে বহু কারণে চলেও না। কিন্তু আমরা সবাই-ই সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন এই রোগের চিকিৎসা সব দিকে হবে নিখুঁত এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতর সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা-বিধান দ্বারা সর্বশ্রেণীর রোগীদের এবং তাদের প্রিয়জনদের করবে আনন্দিত।

চিকিৎসক আক্ষেপ করে বলছেন: (আমার অনুবাদ): "রোগীরা—তা'দিগকে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং কি যে তাদের ভুগতে হয়েছে—এটা পরে এত চট্ করে ভুলে যায় যে চিকিৎসকেরা বিস্মিত না হয়ে পারেন না। রোগ আবার বেড়ে পড়লে তার প্রায়শ্চিত্ত বড় কঠিন মূল্যে হয়।"

কিন্তু এখানে চিন্তাশীল চিকিৎসকের কর্তব্য—রোগীর সমস্ত দুর্বলতা এবং মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলির সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণভাবে পরিচিত হওয়া। এটা তাঁকে ভেবে দেখতে হবে রোগীদের এই দুর্বল স্মরণশক্তির মূলে কি থাকতে পারে। 'রিল্যাপস্'-এর শাস্তি যে বড় কঠিন তা তারা ভুলে যায় এমন কতকগুলি বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়ে যে সব

অবস্থার কাছে কতকগুলি গালভরা উপদেশের কোনই মূল্য নাই এবং যার কাছে নাকি সমস্ত পরিণাম-চিন্তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়!

যাক।

এখন আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, এ নিয়ে এ যাবৎ যে কত রকম মতেরই সৃষ্টি হয়েছে তার অন্ত নাই। বিষয়টির গুরুত্ব যথেষ্ট এবং এ সম্বন্ধে কোনও রকম বিকৃত বা ভ্রান্ত ধারণা রোগী অথবা সর্বসাধারণের মনে থাকা আদৌ ঠিক নয়। বিষয়টি হচ্ছে, যক্ষ্মাপীড়িতের পক্ষে বিবাহ করা কতদূর সমীচীন। একথা বলা হয়েছে যে যুবক-যুবতীদের ভিতরেই এই রোগের প্রসার সব চেয়ে বেশী। এখন এই সব যুবক-যুবতীদের ভিতর হয়ত অধিকাংশই অবিবাহিত এবং যক্ষ্মাক্রান্ত হবার পরে বিবাহের কল্পনা নিশ্চয়ই অধিকাংশের মনেই একটি বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তারপরে, যাঁরা আগে থেকেই বিবাহিত, অসুস্থতা ঘটবার পরে দাম্পত্যজীবন যাপন নিয়ে তাঁদেরও দুর্ভাবনাগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ রোগ যখন সক্রিয় অবস্থায় থাকে অথবা শরীর যখন দুর্বল থাকে এবং রোগী যখন নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকেন, তখন বিবাহের কথা ওঠেই না (অবিশ্যি সেই সব ঘটনা বাদ দিয়ে যেখানে স্বার্থশূন্য প্রেম, অকৃত্রিম, শঙ্কাহীন নিষ্ঠা ও সেবাপ্রবৃত্তি অন্য সব কিছু অতিক্রম করে গিয়েছে—এবং বিরল হলেও যার দৃষ্টান্ত আছে)। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শরীর সুস্থ, সবল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মস্তিষ্কে যখন জাগতে থাকে এই সব কল্পনা, তখন দুটি জিনিস রোগীকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে: (১) বুকের অবস্থা কি রকম। এ কথা বলেছি যে, অনেক সময় রোগীর সাময়িক উন্নতি হয়; অথবা বুকের একটু উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর বাইরের চেহারা অনেক সময়েই বেশ ভাল হয়।

তিনি শরীরটাকে বেশই 'ভাল' বোধ করতে থাকেন—যদিও বুকের দোষ তখনও কাটে না। কাজেই এ সবের উপর নির্ভর না করে আসল ফুসফুসটির অবস্থা কি রকম, সে সম্বন্ধে সেই চিকিৎসকের মতামত বিশেষ ভাবে নিতে হবে যিনি নাকি রোগীকে তাঁর নিয়মিত চিকিৎসাধীনে পূর্বে রেখেছিলেন এবং যিনি নাকি রোগীর বিবাহ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করবার আগে তাঁর বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে, তাঁর শারীরিক অন্যান্য অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করে, এক্স-রে ফটো, থুতু, রক্ত ইত্যাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করে তাঁর সম্পূর্ণ অবস্থা অবগত হয়ে নেবেন। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা দ্বারা রোগ ভাল রকম 'গ্রেপ্তার' হবার পরে দুটি কি তিনটি বছরের মধ্যে রোগীর বিয়ে-পাগলা হয়ে না ওঠাই ভাল—এ সময়ে তাঁর পক্ষে আত্মসংযমই প্রশস্ত। এই সময়টা যদি রোগী খুব ভালভাবে থাকেন, কোনও রকম উপসর্গ আর না আসে, তখন চিকিৎসকের উপদেশ নিয়ে তিনি বিবাহ করতে সক্ষম হতে নিশ্চয়ই পারেন—অবিশ্যি এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন পণ্ডিত-মূর্খের দেশে তাঁর পাত্রী (বা পাত্র) মেলা যদি কঠিন হয়ে না পড়ে—বিশেষ করে পূর্বের ব্যাধি সম্বন্ধে সরল-স্বীকৃতির ফলে। রোগীর দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় হচ্ছে তাঁর আর্থিক অবস্থা। (অথবা তিনি যাঁকে বিবাহ করবেন—তাঁর ?) আমাদের নানা রকম অশান্তি, নানা মানসিক দুশ্চিন্তা, নানা দুঃখ ইত্যাদির মূলে রয়েছে গুরুতর আর্থিক অসচ্ছলতা। রোগীর আর্থিক অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, তবে তাঁর বিবাহিত জীবন যে বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে এবং তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ক্ষতির কারণ হবে, তাতে সন্দেহ নাই। অর্থের দিক দিয়ে রোগীর বিশেষ কোনও ভাবনা যদি না থাকে, বিবাহের পরে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্ন নিতে গিয়ে যদি স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে কোনও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, অথবা পরস্পরের

প্রতি কোনও অন্যায়, অসঙ্গত দাবি দ্বারা আবহাওয়াটা বিষাক্ত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাঁর বিবাহ না করবার পক্ষে কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

যৌন-সংসর্গ পুরুষ বা নারীর পক্ষে হানিকর একথা কোনও শারীর-তত্ত্ববিদ্‌ই বা মনস্তত্ত্ববিদ্‌ই স্বীকার করবেন না—বরং তাঁরা উল্টোটাই বলবেন—যৌন-সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা যে কোনও স্বাভাবিক লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেই স্বীকার্য। (এবং একজন সুস্থ যক্ষ্মারোগীকে 'অস্বাভাবিক' বলবারও কোনই হেতু নাই)। এ সম্বন্ধে নানারকম চিত্তাকর্ষক আলোচনা নানা দিক থেকে করা যেতে পারে, কিন্তু আপাততঃ আমি তা থেকে বিরত হলাম। প্রকৃতপক্ষে যৌন-সংসর্গ শরীরের ক্ষতি-বিধান করে তখনই—যখন নাকি তা ক্রমাগত যেতে থাকে মাত্রা ছাড়িয়ে এবং একজন যক্ষ্মারোগীর ভয় থাকা উচিত ঠিক সেইখানেই। যে কোনও কাজেই যেমন তাঁর নিজের সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে, তেমনি এ কাজেও। যে কোনও কাজে উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা তিনি যেমন নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারেন, ঠিক তেমনি এ কাজেও। যে কোনও কাজে উত্তেজিত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বার দরুন তিনি যেমন নিজের বুককে জখম করতে পারেন, তেমনি এ কাজেও। কাজেই যৌন চর্চা করতে হবে একটা শান্ত এবং সংযত ভাব নিয়ে, আর সর্বপ্রকার "বাড়াবাড়ি" সম্বন্ধেই রোগীকে থাকতে হবে সতর্ক। তবে "বাড়াবাড়ি" কথাটার কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই; প্রত্যেকের পক্ষে একই নিয়ম খাটবেও না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিচার হবে। নইলে কেবল "যৌন-সংসর্গ"ই শরীরকে ধ্বংস করে একথা ভাবা একান্ত ভুল। এ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় খোলাখুলিভাবে অন্ধ-সংস্কার-মুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করলে সুফলই

পাওয়া যায় এবং নিজের অবিবেচনাপ্রসূত ভুলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর, অনেকে হয়ত একথাটা জানেনও না যে, কোনও কোনও মনঃসমীক্ষণবিদের মতে অতিরিক্ত যৌন-সংযম অথবা অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা কতকগুলি অবস্থার ভিতর দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেহকে টি. বি. রোগ-প্রবণ করে তুলতে গৌণভাবে সহায়তাই করে থাকে।

একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান এত কম যে তা বলবার নয়। লোকে বিবাহই করে মাত্র, অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের মত সন্তান সন্ততিও উৎপাদন করে থাকে, কিন্তু যৌন-জীবন সম্বন্ধে তাদের অধিকাংশের অজ্ঞতা এত অধিক এবং বিবাহিত জীবনকে কি করে মধুর ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের চিন্তাশীলতা এত কম যে তার দরুন যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় তার প্রতিবিধান সহজে সম্ভব হয় না।

যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর পক্ষে গর্ভাধান যে অধিকাংশ সময়ে বিপদযুক্ত এটা অনেক বিশেষজ্ঞই বলছেন। কিন্তু সে বিপদটা গর্ভ-বহন কালে নয়, সেটা প্রসবের সময়ে এবং প্রসবের পরে। সেই সময়েই এই বিপদ সচরাচর গুরুতর আকার ধারণ করে। বরং গর্ভ যতদিন থাকে, ততদিন পর্যন্ত অনেক যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়েছে; কিন্তু প্রসবের পরেই তাদের শরীর ভেঙে পড়ে। মোটের উপর বুকে যদি দোষ খুব বেশী না থাকে, সেই দোষ উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা বেশ ভালভাবে সেরে যাবার পরে যদি নারী গর্ভিণী হয়ে থাকেন, এবং তাঁর স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থা যদি বরাবর ভাল থেকে থাকে তবে দুটি একটি সন্তানের জননী হবার পক্ষে তাঁর বাধা না থাকাই সম্ভব এবং এই সন্তান প্রসবের ফলে তিনি কাতর হয়ে না-ও

পড়তে পারেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ বা সন্তান-প্রসবকে একেবারেই নিরাপদ বলা চলেনা।

যাই হোক, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে—প্রয়োজন অনুযায়ী বার্থ-কণ্ট্রোল অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ। স্বামী এবং স্ত্রী কৃত্রিম ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান-জন্ম রোধ করবার প্রক্রিয়াগুলি উত্তমরূপে জানবার জন্যে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কেতাব পড়ে নেবেন। এ সব ক্ষেত্রে যাঁরা জন্ম-শাসনের বিষয় চিন্তা না করবেন, তাঁদের সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত, কুরুচি-সম্পন্ন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যায়ই শুধু অভিহিত করা যেতে পারে।

যক্ষ্মারোগের দিক থেকে গর্ভাবস্থাকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন আলোয় বিচার করেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে বহু মতদ্বৈধ বর্তমান। অনেকে অবিশ্যি এটা নিয়ে বেশ নিরাশার বাণীই শুনিয়েছেন—তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী। আবার কেউ কেউ বা অতটা হতাশ হবার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা জিনিসটিকে উৎসাহের দৃষ্টি দিয়েই দেখছেন এবং এ সম্বন্ধে আশাপূর্ণ মতামত প্রচার করছেন। এই সব অভিজ্ঞেরা এই মত প্রকাশ করছেন যে এই বিষয়ে যদি ধাত্রীবিদ্যাবিশারদগণ এবং যক্ষ্মাতত্ত্ববিদ্‌গণ একযোগে—পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করেন তবে যে এসব ক্ষেত্রে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যাবে তাই নয়, অধিকন্তু এমন অনেক জীবন রক্ষা পাবে যা নাকি অন্যথায় নষ্ট হয়ে যেত।

জনৈক বিশেষজ্ঞের একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ আমি এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি—যা থেকে তাঁর বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হবে :

"গর্ভবতী অথবা গর্ভবতী হবার অবস্থা যার আসন্ন এমন কোনও যক্ষ্মাক্রান্তা নারীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কর্তব্য এই যে, যদি সে গর্ভবতী হয়ে থাকে তবে তার অসুখের চিকিৎসা সুষ্ঠুরূপে চালিয়ে

যেতে হবে, আর যদি সে গর্ভবতী না হয়ে থাকে তবে চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ উপকার না পাওয়া পর্যন্ত গর্ভ স্থগিত রাখতে হবে। কতিপয় ক্ষেত্রে চিরকালের জন্যেই গর্ভ-সঞ্চার বন্ধ রাখতে হতে পারে। যতদূর অবধি অবস্থায় কুলোয়—সক্রিয় ব্যাধিগ্রস্তা গর্ভবতী স্ত্রীলোককে স্যানাটোরিয়ামের নিয়মে রাখতে হবে। অবিশ্যি ভিন্ন ভিন্ন রোগিণীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করতে হবে এবং সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে, যক্ষ্মার ক্ষতটা কি শ্রেণীর এবং সেটার বৃদ্ধি পাবার প্রবণতাটা কি রকম। খুব সহজভাবে যাতে প্রসব হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত এবং শিশুকে স্তন্যপান করতে না দিয়ে দূরে সরান উচিত। গর্ভকে নষ্ট করে ফেলবার প্রয়োজন খুব কদাচিৎই ঘটে থাকে। যে সব নিয়মের কথা বলা হল এগুলি যদি পালন করে চলা যায় তবে টি. বি. গ্রস্তা গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে একটা হতাশ-দৃষ্টি নিয়ে থাকবার কোনও কারণ থাকতে পারেনা।"

তবে কোনও কোনও চিকিৎসক যক্ষ্মাগ্রস্ত নারীর গর্ভগ্রহণকে এখনও কিছুতেই পুরোপুরি সমর্থন করে উঠতে পারছেন না এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আপত্তিই করছেন। একটি সুদীর্ঘ রচনার ভিতর অনেক কথাই বলে জনৈক চিকিৎসক একটি স্থানে বলেছেন: (আমার অনুবাদ):

"স্ত্রীলোকটির আর্থিক অবস্থা, তার সামাজিক জীবন, এ বিশ্বাস তার উপর রাখা যেতে পারে কিনা যে তাকে যে সব উপদেশ দেওয়া হবে সেগুলি সে যথাযথরূপে পালন করে চলবে, বুকের ক্ষতটির জাতি এবং প্রকৃতি কি রকম—সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়, ক্ষুদ্র না বিস্তৃত, প্রাথমিক অবস্থায় না আধিক্যের অবস্থায় * * *—ইত্যাদি অনেক বিষয়ই বিবেচনা করতে হবে। কোনও একটা মতামত নির্ধারণ করতে এত সব চেষ্টা

সত্ত্বেও এটা আগে থেকে বলা বড়ই শক্ত যে একটি যক্ষ্মাক্রান্তা গর্ভবতী নারীর অবস্থা শেষ পর্যন্ত কি গিয়ে দাঁড়াবে। • * * *"

গর্ভকে নষ্ট করবার চেষ্টাও সব সময়ে ঠিক নয়, কারণ গর্ভাবস্থা একটু এগিয়ে গেলে সে চেষ্টায় যে বিপদ আসতে পারে, পূর্ণ গর্ভান্তে প্রসবের সময়ে তার চেয়ে বেশী বিপদ রোগিণীর আসে না, এইটাই অভিজ্ঞগণের মত। এক কথায়, জননী হবার ইচ্ছামাত্রেই বিশেষজ্ঞের নির্দেশ বা অনুমতির যে রকম প্রয়োজন, গর্ভাবস্থায় যে কোনও ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তার তেমনই প্রয়োজন।

যক্ষ্মারোগে বংশানুক্রমিকতা সম্বন্ধে এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের লালন-পালন সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কিছু আলোচনা আমি করেছি। এই পয়েণ্ট দ্বারা বিবাহকে সমর্থন না করবার কোনও হেতু নাই।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। বিবাহিত জীবনে সর্বদাই কি কেবল নানারকম ঝঞ্ঝাটই আসে? নানারকম অশান্তি এবং দুশ্চিন্তার বোঝাই কি বিবাহিত জীবনের সবটুকু? বিবাহিত জীবনকে যারা শুধু একটা স্থূল এবং বিকৃত দৃষ্টি দিয়ে দেখে তারা কোনমতেই পারে না সফলতার সঙ্গে এ জীবন যাপন করতে। বিবাহ তার সমস্ত মধুরতাকে উদ্‌ঘাটন করে শুধু তারই কাছে—যার আছে একটি মার্জিত রুচি এবং কিছু সৌন্দর্যবোধ। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের প্রতি যদি বিশ্বস্ত হন, যদি তাঁরা স্বার্থ-শূন্য, সেবাপরায়ণ প্রকৃতির হন, এবং প্রেমের জন্য যদি তাঁরা যে কোনও প্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকেন তবে তাঁরা সব কিছুই ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন, এবং সেই সব ভয়ানক রকম মানসিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতাও তাঁদের হবে না—যা নাকি অসুন্দর বিবাহের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ এবং যা নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে নিশ্চিতরূপে হানিকর। এ কথা বলেছি যে, অধিকাংশ সময়ে

অর্থাভাবই আমাদের বহু অশান্তি এবং দুশ্চিন্তার মূল কারণ। কিন্তু রোগীর নিজের যদি আর্থিক সচ্ছলতা থাকে, অথবা সম্পূর্ণ বেকার না থেকে তিনি যদি এমন একটি কাজের সুবিধা করতে পারেন যার দ্বারা তাঁর অর্থাগম হবে এবং তাঁর হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যদি মৃত হয়ে না গিয়ে থাকে, তবে বিবাহিত জীবন যে তাঁর শুধু সুখের হবে তাই নয়, সুস্থ থাকবার পক্ষে তা তাঁর সম্পূর্ণরূপে সহায়ক হবে। অবিবাহিতের চাইতে বিবাহিতরা এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অধিকতর সততা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে করে থাকেন—এ সম্বন্ধে প্রমাণও আছে। বিবাহিত রোগীদের সাধনার ভিতরে অনেক সময়ে বেশী নিষ্ঠা থাকবার কারণ আর কিছুই নয়—তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব মনে এলে তাঁদের চলেনা, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এবং কর্তব্যপরায়ণতা হৃদয়ে রাখতে হয় তাঁদের অক্ষুণ্ণ। (এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে—অবিশ্বাসী এবং নির্মম প্রকৃতির স্বামী বা স্ত্রীর কথা এখানে আমি তুলছি না)।

জনৈক মরমী যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞের একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক থেকে কয়েকটি সুন্দর লাইনের অনুবাদ করে এখানে আমি তুলে না দিয়ে পারলাম না:

"বিবাহ সহানুভূতির, স্নেহ এবং ভালবাসার, আনন্দ এবং সুখের সমস্ত কোমল আবেগকে জাগিয়ে তোলে, রোগীকে জীবনের একটা উদ্দেশ্য, বাঁচবার একটা অবলম্বন এনে দেয় এবং সবগুলি মিলে তার মনের কতকগুলি বিশিষ্ট সম্পদ এবং শক্তিকে তোলে ফুটিয়ে—যা দিয়ে তার স্বাস্থ্য ওঠে গড়ে। প্রেম একটি সক্রিয় শক্তি যা নাকি জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং সব রকম পরীক্ষায় এবং আকস্মিক প্রয়োজনে মানুষকে উন্নীত করে।"

যক্ষ্মারোগীর বিবাহ, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব সম্বন্ধে এই চমৎকার কথা কয়েকটি

বলে এই বিশেষজ্ঞটি তাঁর গ্রন্থখানি শেষ করেছেন: (আমার অনুবাদ):

"পার্থিব বিজ্ঞতা আর স্বার্থের চোখে যক্ষ্মারোগীর পক্ষে এসব নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু প্রেম দেবে যক্ষ্মারোগীকে প্রত্যেক মানবীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সত্য পথে চলবার সৎসাহস, সহ্যশক্তি এবং জ্ঞান, এবং প্রিয়জনের ভাগ্যে দুঃখ বহন করে আনবার আগে করবে আত্ম-বিসর্জন। কারণ সে জানে একটি শস্যের কণা মাটিতে প'ড়ে যে ধ্বংস হয় সে শুধু আবার বাঁচবার জন্যেই এবং মৃত্যু বিলীন হয়ে চলেছে একটি বৃহত্তর জীবন ও জয়ের ভিতরে!"—(মনে রাখতে হবে এই চিকিৎসকটি কেবল "প্রকৃত" ভালবাসারই উল্লেখ করছেন; তার অসংখ্যপ্রকার "মেকী" সংস্করণের নয়!)

যক্ষ্মারোগীকে কতকগুলি ব্যাপারে খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে চলতেই হবে। যে কোনও কাজে কিছুটা ঝুঁকি ঘাড়ে নেবার সাহস যদি না থাকে তা হলে যক্ষ্মারোগী ত দূরের কথা—সুস্থ লোকেরই কখনও চলে কি? সুখ, দুঃখ, বিপদ, আপদ, উন্নতি, অবনতি—কার জীবনে কখন কি রকম আসবে বলা চলেনা। সুস্থ যক্ষ্মারোগীর নিজেকে নিয়ে নিরর্থক একটা কোনও হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করবার বিশেষ কারণ থাকতে পারে না। শরীরের উপযুক্ত যত্ন নেবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা নিজের আয়ত্তে যথাসম্ভব এনে রোগীকে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ লোকই হোন আর একজন 'সুস্থ' যক্ষ্মারোগীই হোন, কারুর ক্ষেত্রেই, ঝুঁকি না নিলেই জিততে হবে এবং ঝুঁকি নিলেই ঠকতে হবে, একথা সত্য নয়। কার জীবন যে কোন পথে সার্থক হয়ে উঠবে, এ কথা আগে থেকে কেউই বলতে পারে না—তা সে লোকটির জীবন-ধারা যেমনই হোক না কেন বা সে যে শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন। জীবনের যে কোনও

পথে যক্ষ্মারোগীর ভীরু হবার কোনই মানে হয় না। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে মূর্খতা ত্যাগ করে সমাজকেও সুবিবেচনার সঙ্গে আসতে হবে এগিয়ে।

স্বামী অথবা স্ত্রী—যিনিই যক্ষ্মাক্রান্ত হোন না কেন, একে অপরকে সংক্রামিত করতে পারেন একত্র থাকবার ফলে—এ ভয়টাকেও অনেক সময় একটু অতিরঞ্জিতই করে তোলা হয়। স্বামী এবং স্ত্রী যদি নির্বোধ না হন, এবং গভীর একটা স্নেহ ও সহানুভূতির ভাব নিয়ে রোগ-নিবারণী ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগিতা করেন তা হলে পরস্পরের কাছে পরস্পরের নিরাপদে থাকা কিছুমাত্র কঠিন হবে না। অসুখ যদি 'ভাল'ভাবে 'ভাল' হয়ে যায় এবং থুতু যদি আর না আসে, অথবা এলেও তাতে যদি যক্ষ্মাজীবাণু বর্তমান না থাকে তা হলে সংক্রমণের ভয় কি? একথা অবিশ্যি অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় থাকলে স্বামী-স্ত্রী তাঁদের বিবাহিত জীবনকে যতখানি হুটোপুটি করে উপভোগ করতে পারেন, এমন অবস্থায় ঠিক অতটা হয়ত নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভিতর প্রীতি, অনুরাগের শিথিলতা যদি না ঘটে, তাঁদের ভালবাসা যদি একটু উন্নত ধরনের হয়, ও তাতে প্রকৃত উদারতা, গভীরতা এবং আন্তরিকতা থাকে তবে পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই যা নাকি তাঁদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের নিরাপদে থাকা কোনও প্রকারে অসম্ভব করে তুলতে পারে অথবা সত্যি করে তাঁ'দিগকে কোনভাবে অসুখী করতে পারে।

"কামসূত্রে" বাৎস্যায়ন যে রকম বলেছেন এবারে আমিও সে রকম বলতে চাই—এতগুলি অধ্যায় তো সবাই পড়লেন, এখন বিবাহিত জীবনে কখন কোন বিষয়ে কি রকম সাবধানতা অবলম্বন করবার দরকার, বুদ্ধিমান রোগী অথবা রোগিণী মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে বের করতে থাকুন!...

রোগটা যখন টি. বি. —

ইংল্যাণ্ডের জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিনের একটি সংখ্যায় জনৈক বিশেষজ্ঞের লেখা একটি কথোপকথন বেরিয়েছিল যা এখানে যদি আমি অনুবাদ করে দিই, সবাই পাঠ করে বেশ আমোদ এবং শিক্ষা পাবেন। কথোপকথনটির নাম হচ্ছে :

"ডাক্তারবাবু, আমি কি বিয়ে করতে পারি ?"

তারপরে আসল অংশ হল শুরু :

পুরুষ রোগী। ডাক্তার বাবু, আমি কি বিয়ে করতে পারি ?

স্যানাটোরিয়াম ডাক্তার। আপনি যখন আরোগ্য লাভ করেছেন, তখন কেন পারবেন না ?

রোগী। কিন্তু আমার সন্তান-সন্ততিরাও কি এই ব্যাধিগ্রস্ত হবে না তা হলে ?

ডাক্তার। না, তা হতে পারে না। তা ছাড়া স্যানাটোরিয়ামে বাস ক'রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা পাবার সুযোগ যাদের হয়নি তাদের চাইতে আপনার দ্বারা ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ভিতর দিয়ে এই রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনা ঢের কম।

রোগী। বিবাহ করব বলে আমার সঙ্গে যাঁর কথাবার্তা স্থির হয়েছে তাঁর পিতামাতার কি এ বিষয়ে আপত্তি করবার কোনও অধিকার আছে ?

ডাক্তার। আপত্তি করবার কোনও অধিকারই নাই যদি না আপনি আপনার ভাবী বধূর কাছে আপনার স্বাস্থ্যের বিষয় গোপন রাখেন, এবং যদি না আপত্তির অন্য কোনও ক্ষেত্র থাকে। বিবাহটা আপনাদের দুজনের ব্যাপার।

রোগী। কিন্তু আমার উপার্জন-ক্ষমতার বিষয় কি বলতে চান ? এই অসুস্থতা দ্বারা সেই ক্ষমতা কি আমার কমে যায়নি ?

ডাক্তার। যদি কমে গিয়েও থাকে, আমি আপনাকে বলছি যে এসব অসুবিধাগুলি ধরে নিয়েই সাহসের সঙ্গে আপনি তাদের সম্মুখীন হবেন।

রোগী। বিয়েটা কি আমার কিছু পিছিয়ে দেওয়া উচিত নয়?

ডাক্তার। আমি ধরে নিতে পারি যে আপনারা দুজনেই শীগ্‌গীর করে বিয়ে করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছেন। যদি তাই-ই হয়, তবে দেরি করবার কোনই কারণ নাই—অবিশ্যি এইটুকু যদি আপনি প্রথমে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে স্যানাটোরিয়ামের বাইরে গিয়ে আপনি আপনার সুস্থতাটাকে বেশ বজায় রাখতে পারবেন। কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবে আগে জানবার দরকার যে, মেয়েটি আপনার সঙ্গে বেশ বুদ্ধিমতীর মত সহযোগিতা করবেন। এর পরেও আপনাকে একটি শান্ত জীবন যাপন করেই চলতে হবে, ঠিক সময় মতন খেতে হবে, রাত্রে সুনিদ্রার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বেশ শান্তভাবেই সমস্ত সন্ধ্যাটা এবং সপ্তাহান্তে ছুটির দিনগুলি কাটাতে হবে। মেয়েটি তাঁর স্বভাব দ্বারা এসব বিষয়ে আপনাকে সাহায্যও করতে পারেন অথবা এসব পালন করা আপনার পক্ষে কঠিনও করে তুলতে পারেন।

রোগী। ওঃ ডাক্তারবাবু, আমি তার উপর খুবই নির্ভর করতে পারি বলে মনে করি। দেখুন সে নিজেই এক সময়ে রোগী হয়ে একটি স্যানাটোরিয়ামে ছিল। সে এখন বেশ ভালই হয়ে গিয়েছে। তার দেহে কি আমি পুনরায় কোনও জীবাণু-সংক্রমণ ঘটাতে পারি—?

ডাক্তার। এখানে আপনি যা শিখেছেন তা যদি ঠিক মেনে চলেন—না, তা হলে সে ভয় কিছুই নাই। বিশেষতঃ আপনার থুতুই যখন আর নাই—

* * *

স্যানাটোরিয়াম ডাক্তার। তা হলে আপনি বিয়ে করতে চাইছেন, কেমন

তো ? কিন্তু আপনি যাঁকে বিয়ে করতে চান সেই ছেলেটি আপনার স্বাস্থ্যের যে গোলমাল হয়েছিল সে সম্বন্ধে সব কিছু জানে ?

নারী রোগী। হ্যাঁ, জানে বলেই মনে করি। কিন্তু এ নিয়ে তার কিছুমাত্র খুঁতখুঁতি নাই।

ডাক্তার। বেশ ; কিন্তু এটা কি সে বুঝতে পারে যে আপনার সম্বন্ধে কোনও রকম খুঁতখুঁতির ভাব না রাখাটা তাকে ক্রমাগতই বজায় রাখতে হবে ? আপনি তাকে বলুন যে অন্ততঃ দু বছরের ভিতর আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ বলে বিবেচনা করা যাবেনা এবং তাকে এ-ও বুঝিয়ে বলুন যে কি কি ভাবে আপনার নিজের যত্ন আপনাকে নিতে হবে।

রোগিণী। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি কি সন্তানের মা হতে পারি ?

ডাক্তার। কিন্তু ঠিক এখনই নয়। আমার সঙ্গে, অথবা আপনাদের গৃহ-চিকিৎসকের সঙ্গে পুনরায় দেখা করবেন—যদি নাকি আপনি এবং আপনার ভাবী স্বামী বুঝতে না পারেন যে ঠিক কি ভাবে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

রোগিণী। গর্ভ কি খুব বিপজ্জনক ? কতদিনের ভিতর আমি একটি শিশুকে পেতে পারি ?

ডাক্তার। সাধারণতঃ গর্ভাবস্থাটা বিপজ্জনক নয়, কিন্তু ঠিক প্রসবের পর থেকেই বিপদের সম্ভাবনা। আপনার আরও দুটি বচ্ছর অপেক্ষা করা উচিত। আপনি আবার তখন এসে জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমরা দেখব যে আপনার অবস্থাটা ঠিক উপযুক্ত হয়েছে কিনা।

রোগিণী। আমি কি গৃহস্থালির কাজকর্ম করতে পারি ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, তবে রয়ে-সয়ে। নিজেকে কখনও পরিশ্রান্ত করে তুলবেন না, যথাসময়ে নিয়ম-মত বিশ্রাম নেবেন, এবং বেশী সময় যদি

আপনাকে গৃহে আবদ্ধ থাকতে হয়, একথা ভুলবেন না যে মুক্ত, বিশুদ্ধ বায়ু আপনার পক্ষে দরকার। কিন্তু তার জন্যে আপনি খোলা জানালার ধারে বসে বেশ কাটাতে পারেন, এবং আপনার যদি প্রচুর শারীরিক সামর্থ্য না থাকে, তাহলে ঘরের বাইরে গিয়ে হাঁটা-চলা করবার দরকার আছে একথা মনে করে আপনার কাজ নাই—যদি নাকি ঘরের ভিতরেই আপনি আপনার শক্তি খরচ করে ফেলে দেন।"...

* * *

এবারে রোগীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আমার কয়েকটি বিষয় বলবার আছে।

এটা বোধ হয় আর বেশী কথা বলে বোঝাতে হবে না কাউকে যে একজন টি. বি. রোগীর জীবন আগাগোড়া নানাদিক থেকে কতখানি বেদনায় পূর্ণ। অসুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থা হয় ঠিক জল থেকে ডাঙায় টেনে তোলা মাছের মত এবং নানারকম যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতা তাঁর মস্তিষ্ককে অল্প সময়ের ভিতরেই বিকৃত করে তুলবার উপক্রম করে। চঞ্চলতা এবং উৎসাহভরা জীবন থেকে হঠাৎ তাঁকে এসে পড়তে হয় একটা স্তব্ধতার ভিতরে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁকে অবিলম্বে করে তোলে ম্রিয়মাণ। এই রোগের রোগী জীবন সম্বন্ধে প্রায়ই হতাশ হন না, তিনি তাঁর অসুস্থতা নিয়ে বিষণ্ণ থাকেন না, মনে একটা খুশি এবং আশার ভাবই তাঁর বেশী থাকে—অধিকাংশ সময়ে সাধারণ লোকের, এমন কি বহু বিশেষজ্ঞেরও এসব ধারণা একটা মিথ্যা ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রোগের বিষের ক্রিয়ার জন্যে খারাপের দিকে যেতে থাকলেও কখনও কখনও তিনি মনে করেন বটে যে তিনি উন্নতি লাভই করছেন অথবা করবেন—কিন্তু বেশী সংখ্যক রোগীর পক্ষেই ঘটে ঘোরতর মানসিক অবসাদ।

রোগটা যখন টি, বি.—

তাঁর বেদনা আরও সহস্রগুণ তীব্র হয়ে ওঠে, যখন তিনি কোনও ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন—তাঁর আপন জন, তাঁর প্রিয়জন তাঁর প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাঁকে একটা উৎপাতের মত বা তাঁকে ঘৃণা ও পরিত্যাগের যোগ্য বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছেন অথবা অন্য কোনও প্রকারে তাঁর সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে উঠেছেন। শারীরিক এবং মানসিক নানা যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ, দীর্ঘ ব্যাধি-জীবনে তাঁর সমস্ত অন্তর একান্তভাবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সবার স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি পাবার জন্যে; তাঁর সমস্ত মন একান্তভাবে উন্মুখ হয়ে ওঠে সকলের কাছ থেকে আশা, উৎসাহ, শক্তি পাবার জন্যে, সকলের মাঝখানে তিনি কাতরভাবে খোঁজেন একটু শান্তি, একটু সান্ত্বনা। তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে তিনি খোঁজেন একটি কোমল, সকরুণ চোখের দৃষ্টি, তপ্ত ললাটে একটি শান্ত, সুগভীর স্নেহ-সিক্ত করস্পর্শ। এসব থেকে যদি তিনি বঞ্চিত হন, তবে তাঁর জীবন যে কতখানি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, এই দুরন্ত ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করা তাঁর পক্ষে যে কতখানি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তা কি প্রকাশ করে বলতে পারা যায়? একজন চিকিৎসক (নিজেই টি. বি. গ্রস্ত) তাঁর রচিত টি-বি সম্বন্ধে সুন্দর একখানা গ্রন্থে সুস্পষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে এই কথা কয়েকটি লিখেছেন: (আমার অনুবাদ):

"রোগের সঙ্গে সংগ্রামের দীর্ঘ, ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলিতে স্ত্রী, ভগিনী, অথবা বন্ধুর পক্ষে সেবা এবং আত্মত্যাগের যে মহান সুযোগ আসে, সম্ভবতঃ এরকম আর তাঁদের জীবনে কখনই আসে না, এবং জীবনে অন্য কোনও বিপদের সময়েই রোগীর কাছে একটি প্রকৃত সেবা এত অধিক সাহায্যজনক হয় না বা তার মূল্য তাঁর কাছে এত বড় হয়ে ওঠে না।"

যক্ষ্মা-সংগ্রামী

নরনারীর

স্বাস্থ্য ও মঙ্গল
কামনায়

দি

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯

কলিকাতার একটি সুপরিচিত মাসিকপত্রের একজন ভূতপূর্ব সম্পাদক কলিকাতার উপকণ্ঠাবস্থিত যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে এসে ঐ হাসপাতাল সম্বন্ধে অন্য কোনও সুপরিচিত মাসিকপত্রে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটির এক জায়গায় ছিল: "আমরা (আমি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সান্যাল) যেদিন যাদবপুর দেখিতে গিয়াছিলাম, সেদিন দেখিলাম রোগীদের মধ্যে কেহ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, কেহ চিঠিপত্র লিখিতেছেন, কেহ গ্রামোফোন বাজাইতেছেন। কাহাকেও বিমর্ষ বা চিন্তাক্লিষ্ট দেখিলাম না। যে রোগ 'শিবের অসাধ্য' (শিব একজন বড়দরের চিকিৎসক, একথা বোধ করি আমার হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত নাই) বলিয়া কথিত, যে রোগের নাম শুনিলেই শোণিত জল হইয়া যায়, সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াও যে রোগী প্রফুল্লমুখে বসিয়া গল্পগুজোব করে, আরোগ্য চিন্তা করে, ইহা দেখিয়াও সুখ! শুনিয়াও সুখ! "কেমন আছেন? শরীর ভালো বোধ করিতেছেন কি?" মাত্র এই দুটি প্রশ্নেই তাঁহাদের কত আনন্দ! "আমরা আপনাদের দেখিতে আসিয়াছি"—শুনিয়া সকলেরই মুখ অম্লান হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। * * আত্মীয়ের কথা বলি না, অনাত্মীয়ের ব্যবহারে আত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করিলে, এই রোগের তাপ অনেকখানি হ্রাস পায় বলিয়াই কথাটা এখানে বলিলাম।

"একটি সুন্দরী নারী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সীবন করিতেছিলেন—শিল্প-কার্য্যটি দেখিবার মত, বোধ হইল, একখানি রেশমী টেব্‌ল ক্লথ। আমরা নিকটে যাইতেই শিল্পকার্য্য রাখিয়া দিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছেন?" উত্তর হইল, "অনেক ভাল।" বাড়ীর লোক রোজ আসে কিনা,

বসিয়া গল্পগুজোব করে কিনা, জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি বঙ্গললনাসুলভ ব্রীড়ানম্রমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, আসে; ভাইয়েরা আসে, দেবর আসে, অর্থাৎ মনে হইল, 'একজন' ছাড়া সবাই আসে। বাহিরে আসিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা যেমন মর্ম্মন্তুদ, তেমনই করুণ! সেকথা প্রকাশ করিয়া লাভ নাই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা সমধিক।"

'অনাত্মীয়ের ব্যবহারে আত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করিলে' যদি এই রোগের তাপ অনেকখানি হ্রাস পায়, তাহলে আত্মীয়ের ব্যবহারে অনাত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করলে ঠিক সেই পরিমাণেই কি এই রোগের তাপ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক নয়? প্রিয়জনদের সঙ্গলাভের জন্যে এই রোগী যে কি রকম আকুল হয়ে উঠতে পারেন, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-ব্যথা এই রোগীর বুকে কি রকম বাজতে পারে, এখানে তার আর একটু উল্লেখ আমি করছি। জনৈক বাঙালী ভদ্রমহিলা কলকাতার একটি বিশিষ্ট ইংরাজী দৈনিকে একটি চিঠি লেখেন—"টি. বি. স্যানাটোরিয়াম: ইট্‌স্ ইমিডিয়েট্ নেসেসিটি ইন বেংগল" অর্থাৎ বাংলা দেশে টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের জরুরী প্রয়োজন—এই শিরোনাম দিয়ে—মাদ্রাজের মদনপল্লী স্যানাটোরিয়াম থেকে। ইনি নিজেই একজন টি. বি. পেসেণ্ট এবং উক্ত স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই মহিলাটি তাঁর চিঠিতে স্যানাটোরিয়ামের কয়েকটি অসুবিধার উল্লেখ করে এক জায়গায় এই মর্মান্তিক কথা কয়েকটি লিখেছেন: (আমার অনুবাদ):

"এসব অসুবিধা ছাড়াও তারা তাদের গৃহ থেকে হাজার মাইলের ওপর দূরে হয় নির্বাসিত, যার দরুন আপন-জনের পক্ষে মাঝে

মাঝে তাদের এসে দেখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অসহায় অবস্থায় রুগ্নশয্যায় শুয়ে গোঙাতে গোঙাতে যখন আমরা দেখতে পাই অন্য রোগীদের কাছে তাদের স্বামী, ভাই, বাবা, মা প্রভৃতি সবাই মাঝে মাঝে আসছেন এবং সেই রোগীদের মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তখন আমাদের হৃদয় ব্যথায় বিদীর্ণ হয়ে যায়।"...

এসব থেকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে, রোগীর প্রতি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের কোনও রকম উদাসীনতা, তাঁর প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং সব সময়ে যদি একটা ভেঙে-পড়া মনের অবস্থা নিয়ে তিনি থাকেন তবে যুদ্ধে জয়ী হওয়া কখনই তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবেনা। এটা সবার বুঝতে হবে যে, তাঁকে শীগ্‌গীর সুস্থ করে তুলতে হলে (তাঁর সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটিকে উপেক্ষা করে) তাঁকে সব রকম স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি দিয়ে সর্বদা এমন ভাবে রাখতে হবে আচ্ছন্ন করে, যাতে নাকি নিজের ব্যথা-বেদনা নিয়ে এতটুকু ম্রিয়মান হয়ে থাকবার সুযোগ তিনি কখনও না পান। কাছে না থেকে তিনি যদি দূরে থাকেন, একলা কোনও এক ভিন্ন দেশের হাসপাতাতালে পড়ে, তবে তাঁকে এমন চিঠি-পত্র লিখতে হবে যা নাকি তাঁর প্রতি অসীম স্নেহ, আশা, সান্ত্বনা, উৎসাহের বাণীতে থাকবে পূর্ণ। পৃথিবীটা যেন তাঁর কাছে না হয় "হোমিনিবাস প্লেনাম, অ্যামিসিস্ ভ্যাকুয়াম"—মানুষে ভরা কিন্তু আত্মীয়-বন্ধু-হীন!

অ্যামেরিকার জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ অ্যালফ্রেড্ হেন্‌রী তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন যে একজন লোককে যখন বলা হয় যে তাঁর টি-বি হয়েছে এবং তাঁকে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে কর্মজগৎ এবং সব রকম আমোদ-প্রমোদ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে

হাসপাতালে দীর্ঘকালের জন্যে বন্দী অবস্থায় তাঁকে এখন কি ভাবে নিজের চিকিৎসা চালাতে হবে, তখন সেটা তাঁর পক্ষে হয় একজন অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের চাইতেও বড় রকমের আঘাত। এই রোগের চিকিৎসা-সংক্রান্ত অন্য কথা বলে ডাঃ হেন্‌রী আফসোস করেছেন : (আমার অনুবাদ) :

"চিকিৎসার আর একটি দিককে বড় শোচনীয়ভাবে অবহেলা করা হয়। আমি রোগীর উপযুক্ত মানসিক অবস্থার কথা বলছি। 'রোগে'র চিকিৎসা করলেই কেবল হবে না, 'রোগী'র চিকিৎসাও করতে হবে। একটি অসুখ এসে লোকটিকে করেছে আক্রমণ, এবং সব অসুখের ভিতর এইটি এমন একটি অসুখ যাকে সর্বদা তিনি ভয় করে চলতেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবসাদ, অস্থিরতা এবং বহু ক্ষেত্রে স্নায়বিক বিপর্যয় এসে দেয় দেখা—যা নাকি আগে থেকেই আটকান যেতে পারে। একটি স্যানাটোরিয়ামের অধ্যক্ষ-পদপ্রার্থী জনৈক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—প্রতিষ্ঠানটির কার্য-পরিচালনা ব্যাপারে তাঁর কাছে কোন্ জিনিসটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী? তিনি উত্তর করলেন: "রোগীদিগকে সন্তুষ্ট এবং সুখী রাখা।"...এই ব্যাক্তিকেই নিযুক্ত করে সুফল পাওয়া গেল। যে চিকিৎসক কৃতকার্যতার সঙ্গে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করছেন—তিনি একটি নীতি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখছেন, মানব-জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ এবং প্রকৃত সন্ধান দিচ্ছেন, এবং এটা উপলব্ধি করেছেন যে মানুষটাই হচ্ছে আসল। অশান্তিঃ ভীতি এবং উদ্বেগ দ্বারা কোনই অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবেনা; কিন্তু আশা, স্থিরতা এবং আবেগের সংযমের স্থানই সুপ্রতিষ্ঠিত।"

অপর একজন চিন্তাশীল বিশেষজ্ঞও বলছেন: (আমার অনুবাদ),

"রোগীর মানসিক দিকটা হচ্ছে সমস্যাটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ

দিক। * * * চিকিৎসা-বিদ্যার যেমন একটা বিজ্ঞানের দিক আছে তেমনি আছে একটি শিল্পের দিকও। এবং এই শিল্প অভ্যাস করবার পক্ষে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কতকগুলি ব্যক্তিগত জিনিস—যার ক্ষেত্রে নাকি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ খাটে না। যে কোনও দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাধি, বিশেষ করে টিউবার্‌কুলোসিস্‌, এই শিল্প-চর্চার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করে। এই দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাধিতে যে কোনও রোগী কেবল যে শারীরিক, তাই নয়, একটি গুরুতর মানসিক এবং ভাবাবেগের সমস্যার সম্মুখীন হয়। বেশীর ভাগ সময়েই চিকিৎসকেরা এটা উপলব্ধি করতে পারেন না। নিজেদের রোগীদিগকে এই দিককার সমস্যা সম্বন্ধে উপযুক্ত সাহায্য করবার সুযোগ আছে তাঁদের যথেষ্ট; কিন্তু এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করবার উপযুক্ত শিক্ষা তাঁরা কমই পেয়েছেন। ব্যাধির চিকিৎসায় মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ভাবাবেগিক বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়ার অর্থই হচ্ছে এই রোগীদের প্রয়োজনকে সোজাসুজিভাবে উপলব্ধি করা, এবং এটা উত্তমরূপে উপলব্ধি না করার দ্বারা চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর অক্ষমতাই শুধু বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। যদি ভবিষ্যতের চিকিৎসক নিজেকে এইদিকে ঠিকমত গড়ে তুলতে চান, তাহলে আজকে যিনি ছাত্র, তাঁকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেকার এই সব সমস্যাগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে, এবং এই সব রোগীকে নাড়াচাড়া করবার পদ্ধতিগুলিকে আয়ত্ত করবার জন্যে অনেক অধিক চেষ্টা করতে হবে।"

যে সব চিকিৎসক কেবল একটা ধরা-বাঁধা নিয়মে নিজের কাজ সেরে চলেন এবং যাঁরা রোগীর মনের দিকটা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামান না, উপরি-উদ্ধৃত অংশগুলি তাঁদের চোখ ফুটিয়ে দেবে এবং এটা শিখিয়ে দেবে যে রোগীর পক্ষে সাহস ও মনের প্রফুল্লতা এই রোগের চিকিৎসায়

সব দিকে কতখানি সহায়ক হতে পারে। বাস্তবিক, শুধু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নয়, রোগীর চিকিৎসকেরও একটি বড় কর্তব্য রোগীর মনকে সব সময়ে হালকা এবং সুখী রাখতে চেষ্টা করা। এতে তাঁর 'পদমর্যাদা' ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং তাঁর মহত্বই প্রকাশ পাবে; এবং লোকসানও তাঁর এতে এমন বিশেষ কিছু নাই। রোগীকে যাঁদের উপর সর্বদা নির্ভর করতে হবে—এমন যে কোনও বন্ধু, আত্মীয় বা চিকিৎসকের প্রতিমুহূর্তে লক্ষ্য রাখা উচিত যে তাঁদের কথায় বা ব্যবহারে তাঁকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ বা আহত না হতে হয়, যাঁর নাকি নিজের ব্যাধি নিয়ে এমনিই নানাভাবে লজ্জা এবং সঙ্কোচের অন্ত নাই, এবং এটাও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তিনি ব্যাধিমুক্ত হয়ে পুনরায় সুস্থ, সুন্দর, সবল, কর্মক্ষম অবস্থায় তাঁদের মাঝখানে আসবেন ফিরে—এই সাহস এবং অভয় তাঁকে প্রদান করা হচ্ছে প্রতিমুহূর্তেই।

রোগীর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে রোগীর কোনও কোনও বন্ধু বা আত্মীয় এমন মূর্খতারও পরিচয় দিয়ে বসতে পারেন যা রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর। "সত্যি, কি যে কাল-ব্যাধিতে তোমাকে ধরলো, কি মহাপাপ যে ক'রেছিলে……ওঃ হো-হো-হো ·····" এই ধরনের কথা অথবা নিরাশাসূচক হা-হুতাশ রোগীকে শুনিয়ে যাঁরা "অতি দরদী" সাজতে চেষ্টা করবেন, রোগীর ঘর থেকে তাঁদের অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থাই করতে হবে।

যক্ষ্মার সঙ্গে সংগ্রাম কেবল 'ডাক্তারে'র ব্যাপার নয়; এ সংগ্রাম সমগ্র জনসাধারণের।
—স্যার ডব্লিউ. এম. ওস্‌লার।

—৬—

এদেশে কোথায় কোথায় কোন্ টি-বি স্যানাটোরিয়াম বা যক্ষ্মানিবাস আছে, এর খোঁজ অনেক সময়ে রোগীর পক্ষে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। এটা উপলব্ধি করে যতগুলি যক্ষ্মানিবাসের খোঁজ আমি নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি তার একটা ফিরিস্তি এখানে দিয়ে গেলাম। সঙ্গে ঠিকানাও দেওয়া থাকল। এগুলির কোন্‌টা কতো বড় বা বিখ্যাত, কোন্‌টায় কি রকমের ব্যবস্থা, কোন্‌টা কি রকম স্থানে অবস্থিত, কোন্‌টায় কত খরচা, কোন্‌টায় কি কি চিকিৎসা প্রচলিত, কোন্‌টা শুধুই স্থানীয় লোকেদের জন্যে অথবা শুধু শিশু বা নারীদেরই জন্যে—ইত্যাদি সংবাদ পূর্বে পত্রযোগে বা অন্য কোনও সুবিধাজনক উপায়ে উত্তমরূপে গ্রহণ করে তবে রোগী যেটাতে হয় যেন যাওয়া ঠিক করেন—তাঁর প্রয়োজন, ইচ্ছা বা সামর্থ্য অনুযায়ী। প্রত্যেকটি ক্লিনিক, হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামের প্রত্যেকটি সংবাদ এখানে সরবরাহ করতে হ'লে এই বই-এর আকার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে। তা' ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানেরই নিত্য-নতুন অদল-বদল হচ্ছে বলে এই সব সংবাদ যখনকারটা তখন নেওয়াই ভালো।

পশ্চিম বঙ্গ ঃ

১। কুমুদশঙ্কর টি. বি. হাসপাতাল, পোঃ যাদবপুর কলেজ, কলিকাতা-৩২

২। এস. বি. দে (S. B. Dey) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, কার্সিয়াং।

৩। ক্লার্ক (Clark) টি. বি. হাসপাতাল, দার্জিলিং।

৪। দি ন্যাশ্‌নাল্ ইনফারমারি, ১৮৯নং মানিকতলা মেইন্ রোড, কলিকাতা।

৫। কাঁচড়াপাড়া গভর্নমেণ্ট টি. বি. হাসপাতাল—কাঁচড়াপাড়া, ওয়েস্ট্ বেংগল।

৬। এম. আর. বাঙুর (M. R. Bangur) গভর্নমেণ্ট টি. বি. স্যানাটোরিয়াম—ডিগ্রি (Digri), মেদিনীপুর।

৭। গভর্নমেণ্ট টি. বি. হাসপাতাল, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা—১০

আসাম :

১। রীড্ (Reid) প্রভিন্সিয়াল টি. বি. স্যানাটোরিয়াম—শিলং।

বিহার :

১। টিউবারকুলোসিস স্যানাটোরিয়াম, পোঃ ইট্কি, (Itki), জেলা রাঁচি।

২। রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, রামকৃষ্ণ নগর, পোঃ হাতিয়া (Hatia), রাঁচি।

৩। রকি (Rocky) মাউণ্ট স্যানাটোরিয়াম, আরা (Ara), নামকুম (Namkum), রাঁচি।

উড়িষ্যা :

১। টি. বি. হাসপাতাল, ভবানীপত্না (Bhawanipatna).

মাদ্রাজ :

১। গভর্নমেণ্ট টি. বি. হাসপাতাল, টেম্প্ল্ গার্ডেন্স্, পোঃ রয়াপেটা (Royapettah)।

২। দি ইউনিয়ান মিশান টিউবারকিউলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, পোঃ আরোগ্যভরম (Arogyavaram), জেলা চিত্তুর (Chitteor), সাউথ ইণ্ডিয়া।

৩। গভর্নমেণ্ট টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, তাম্বারাম (Tambaram), পোঃ ক্রোমপেট (Chromepet)।

৪। বিশ্রান্তিপুরম (Visranthipuram) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, রাজমহেন্দ্রী (Rajah mundry), ঈস্ট্ গোদাবরি ডিস্ট্রিক্ট্।

৫। জুবিলী টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পেরুন্দুরাই (Perundurai), কোয়েম্বাটুর (Coimbatore) ডিস্ট্রিক্ট্।

৬। শকুন্তলা মেমোরিয়াল টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, গুণ্টুর (Guntur)।

৭। মাউণ্ট্ রোসারি (Rosary) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ মুদ্‌বিদ্রি (Moodbidry), সাউথ কানাড়া।

৮। সন্তোষপুরম (Santhoshapuram) স্যানাটোরিয়াম, তাম্বারাম (Tambaram)।

৯। রাজাজী টিউবারকিউলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, তিরুচিরাপল্লী (Tiruchirapalli)।

১০। গভর্নমেণ্ট ওয়েলেস্‌লি (Wellesley) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, বেলারি (Bellary)।

বম্বে ঃ

১। টার্নার (Turner) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, ভয়ওয়াদা হিল (Bhoiwada Hill), প্যারেল (Parel)।

২। মারাঠা টি. বি. হস্‌পিট্যাল, কনট (Connaught) রোড্।

৩। দি হিন্দু স্যানাটোরিয়াম ফর্ টিউবারকিউলোসিস, কারলা (Karla), জেলা—পুনা।

৪। দি বেল-এয়ার ("Bel-air") স্যানাটোরিয়াম ফর্ কন্‌সামটিভ্স্, ডালকিথ (Dalkeith), পাঁচগনি (Panchgani)।

৫। দি হিল-সাইড (Hill-side) স্যানাটোরিয়াম, পোঃ ভেনগুরলা (Vengurla), জেলা রত্নাগিরি (Ratnagiri)।

৬। সার উইলিয়াম ওয়ানলেস্ (Sir William Wanless) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ ওয়ানলেস্‌ওয়াড়ি (Wanlesswadi), জেলা সাতারা।

৭। দি মহারাষ্ট্র টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পঞ্চবটি (Panchvati), নাসিক।

৮। ডক্‌টর (Dr.) বাহাদুরজী মেমোরিয়াল স্যানাটোরিয়াম, দেওলালি (Deolali)।

৯। দি কর্ণাটক (Karnatak) হেল্‌থ্ ইনস্‌টিটিউট টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, হুকেরি রোড (Hukeri Road), বেলগাঁও (Belgaum)।

১০। দি স্যালভেশান আর্‌মি টি. বি. হাসপাতাল, আনন্দ (Anand), জেলা—কয়রা (Koira)।

১১। দি অ্যান্‌টি টিউবারকুলোসিস্ হাসপাতাল, অশ্বানিকুমার (Ashwani Kumar) রোড্, পোঃ কাটারগাঁও (Katargaum), জেলা—সুরাট (Surat)।

১২। তালেগাঁও (Talegaon) জেনেরাল হস্‌পিট্যাল অ্যাণ্ড কন্‌ভাল্‌সেণ্ট্ হোম, তালেগাঁও (দাভাদে—Dabhade), জেলা—পুনা।

১৩। এন. এম. ওয়াদিয়া (Wadia) চ্যারিটেব্‌ল্ হস্‌পিট্যাল, শোলাপুর (Sholapur)।

১৪। রমেশ প্রেমচাঁদ টি. বি. হসপিট্যাল, সিউরি (Sewri)।

ঈস্ট পাঞ্জাব :

১। কিং এড্ওয়ার্ড টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ ধরমপোর, সিমলা হিল্স্।

২। লেডী আরউইন (Lady Irwin) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ জুবার (Jubar), ভায়া সানোয়ার (Via-Sanawar), সিমলা হিল্স।

৩। ম্যাক্‌গয়ার (McGwire) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, ধরমশালা, কাংড়া—জেলা।

৪। গার্ডেন স্যানাটোরিয়াম, মেমোরিয়াল মিশন হসপিট্যাল, লুধিয়ানা।

৫। রাজা দুর্গা সিং টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, বাগহাট স্টেট (সোলান) (Baghat State, Solan), মানদো হিল্স (Mando Hills), পোঃ ধরমপুর আর. এস. (R. S.), সিম্লা হিল্স্।

৬। রায় বাহাদুর স্যার গুজারমল কেশরা দেবী (Gujjarmal Kesra-devi) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, বাটালা (Batala) রোড্, অমৃতসর।

৭। লেডী লিন্‌লিথ্‌গো টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, কসৌলি, সিমলা হিল্স্।

দিল্লী :

১। সিল্‌ভার জুবিলী টিউবারকিউলোসিস হস্‌পিট্যাল, কিংস্‌ওয়ে (Kingsway).

উত্তর প্রদেশ :

১। কিং এডওয়ার্ড টিউবারকিউলোসিস স্যানাটোরিয়াম, ভাওয়ালি (Bhowali), জেলা নাইনিতাল।

২। দি হিল ক্রেসট (Hill-Crest) স্যানাটোরিয়াম, পোঃ গেথিয়া (Gothia), জেলা নাইনিতাল।

৩। দি টিউবারকিউলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, আলমোড়া।

৪। শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ টিউবারকুলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, সারনাথ, বেনারাস।

৫। কারেলাবাগ (Karelabag) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, এলাহাবাদ।

৬। প্যাণ্টস্ হোম (Pant's Home) ফর্ কন্‌সাম্‌টিভস্, আলমোড়া।

৭। পাইন্ হিল্ স্যানাটোরিয়াম, আলমোড়া।

মধ্যপ্রদেশ :

১। টিউবারকিউলোসিস স্যানাটোরিয়াম, পেণ্ড্রা রোড (Pendra Road), জেলা বিলাসপুর।

আজমীর :

১। মেরী উইল্‌সন (Mary Wilson) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, তিলাউনিয়া (Tilaunia), ভায়া কিসেনগড় (Kishengarh)। (কেবল নারী ও শিশুদের জন্যে)।

২। মাদার (Madar) ইউনিয়ান স্যানাটোরিয়াম, মাদার, আজমীর মেরওয়ারা (Ajmer Merwara)।

জম্মু ও কাশ্মীর :

১। গভর্নমেণ্ট টিউবারকুলোসিস স্যানাটোরিয়াম, তাংমার্গ (Tang-marg), শ্রীনগর।

২। টি. বি. হাসপাতাল, বারজাল্লা (Barjalla), শ্রীনগর।

৩। টি. বি. হাসপাতাল, জম্মু (টাওয়ি) (Tawi)।

বরোদা :

১। শ্রীপদ্মাবতী দেবী টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, বরোদা সিটি (City)।

ভরতপুর ঃ

১। রাও রাজা গিরেন্দ্র (Girrendra) রাজ সিং টিউবারকুলোসিস হাসপাতাল।

বিকানীর ঃ

১। গঙ্গা গোল্ডেন জুবিলি টিউবারকুলোসিস হসপিট্যাল।

কাচ্ (Cutch) ঃ

১। শেঠ বল্লভদাস কারসনদাস (Karsondas) নাথা (Natha) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, ভুজ-ভারাপুর (Bhuj-Bharapur) রোড্, ভুজ।

হায়দেরাবাদ (ডেকান) ঃ

১। টিউবারকুলোসিস্ হস্‌পিট্যাল, লিঙ্গম্‌পল্লী (Lingampalli)।

২। টি. বি. হস্‌পিট্যাল, ইরুম্‌নুমা প্লেস্ (Irrumnuma Place), বেগমপেট (Begumpet), পোঃ আমিরপেট (Amirpet)।

ইন্দোর ঃ

১। শ্রী সাওয়াই তুকোজীরাও (Shri Sawai Tukojirao) স্যানাটোরিয়াম ফর (for) টিউবারকুলোসিস, পোঃ রাও (Rao)।

জয়পুর ঃ

১। কিং জর্জ V সোলেরিয়াম (Solarium)। (এই 'সূর্যভবন'টি স্যানাটোরিয়াম হিসাবে ব্যবহৃত হ'চ্ছে)।

মাইসোর ঃ

১। প্রিন্‌সেস কৃষ্ণরাজমন্নি (Krishnarajammanni) টি. বি স্যানাটোরিয়াম।

২। হানাগাভাডি মাথাডা মুরিগাপ্পিয়াস্ (Hanagavadi Mathada Murigappiah's) টি. বি. হাসপাতাল, দেবানগেরি (Devangere), জেলা চিতলদ্রুগ (Chitaldroog)।

৩। জেনানা মিশন (Zenana Mission) টিউবারকুলোসিস্ হস্‌পিট্যাল, বাঙ্গালোর।

পাতিয়ালা :

১। হার্ডিঞ্জ (Hardinge) টি. বি. হাসপাতাল, পোঃ ধরমপুর (Dharampore), সিম্‌লা হিল্‌স্।

ট্রাভাংকোর :

১। টিউবারকিউলোসিস্ হস্‌পিট্যাল, নাগেরকয়েল (Nagercoil)।

উদয়পুর (মেবার) (Mewar) :

১। মহারানাস্ (Maharana's) টি. বি. হাসপাতাল, বারি (Bari)।

দার্জিলিঙ্-এর লুইস জুবিলী স্যানাটোরিয়ামে স্বতন্ত্র ওয়ার্ডে ৮ জন টি. বি. রোগীর থাকবার ব্যবস্থা আছে। থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। যাঁরা অন্য হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামে থেকে বেশ সুস্থ হয়ে গিয়েছেন তাঁরা "চেঞ্জ" হিসাবে বা দার্জিলিং বেড়াতে গেলে এখানে থাকতে পারেন।

খবরের কাগজে অথবা অন্যান্য নানা সূত্রে বহু যক্ষ্মানিবাসই এখানে ওখানে স্থাপিত হবার সংবাদ অনেক সময়ে পেয়েছি, কিন্তু তার অনেকগুলি শেষ পর্যন্ত ধোঁয়াতেই শুধু পর্যবসিত হয়েছে।

কাগজে বিজ্ঞাপিত এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধেও ভালো করে খোঁজ নিতে চেষ্টা করছি :

১। ওস্‌মানিয়া টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, অনন্তগিরি হিল্‌স্‌, হায়দেরাবাদ (ডেকান)।

২। মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল টিউবারকিউলোসিস্‌ স্যানাটোরিয়াম, তাঞ্জোর, সেন্‌গিপটি (Sengippatti), সাউথ ইণ্ডিয়া।

৩। নাংকুম (Namkum) টি. বি. হস্‌পিট্যাল অ্যাণ্ড স্যানাটোরিয়াম, হরতাপ (Hortap), রাঁচি।

এ সব ছাড়াও পশ্চিম বাংলার সাগরদ্বীপে একটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম স্থাপনে জনৈক তরুণ কর্মী উদ্যোগী হয়েছেন ব'লে কাগজে পড়েছিলাম। মেদিনীপুরের গিড্‌নীতে "নিরাময়" বলে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপনেরও উদ্যোগ-পর্ব শুরু হয়েছে। হাজারিবাগের হার্লি (Harli) বলে একটি জায়গায় একজন ডাক্তার "দি লক্ষ্মী স্যানাটোরিয়াম" বলে একটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করেছিলেন—কিন্তু এখনকার খবর কিছুই জানি না এটি সম্বন্ধে। একটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম স্থাপনে রোটারি ক্লাবও উদ্যোগী হয়েছেন—ঈস্‌টার্ন রোটারি হুইল পত্রিকায় দেখা গেল। অমৃতসরে লালা রামশরণ দাস এবং তাঁর ভায়েদের অর্থে একটি টিউবার-কিউলোসিস্‌ ইনফারমারি স্থাপিত হয়েছে বলে কাগজ-মারফৎ সংবাদ পেয়েছিলাম। সিমলা হিল্‌স-এ ধরমপুর পোস্টাপিসের অধীনে জাবলি (Jabli)-তে "ডাঃ বর্মনস্‌ (Dr. Burman's) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম" —ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা কিছুই জানি না। ধরমপুর কিং এড্‌ওয়ার্ড স্যানাটোরিয়ামের ভূতপূর্ব চিকিৎসক ডাক্তার ডোংরে নাকি নিজে—সেখানকার কাছাকাছি কোথাও একটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম খুলেছেন। সঠিক ব্যাপার কিছুই জানি না। কানপুরে একটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম স্থাপনের উদ্যোগের কথা কাগজে পেয়েছিলাম। কাথিয়াওয়াড়—গুজরাটের জামনগরে একটা হয়েছে বোধ হয়। কাপুরথালায় "লেডী

লিন্‌লিথ্‌গো টি. বি. হাসপাতালে"র ভিত্তি স্থাপনের সংবাদ একবার পাওয়া গিয়েছিল।

সিমলা হিলস-এ ধরমপুর কিং এডওয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম থেকে এক মাইল দূরে "আর্কেডিয়া" (Arcadia) বলে একটি স্থানে কতকগুলি টি. বি. রোগীর থাকবার ব্যবস্থা আছে। এই সব রোগীরা তাঁদের চিকিৎসার জন্মে কিং এডওয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম বা হার্ডিঞ্জ হসপিট্যালের চিকিৎসকদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে থাকেন। মধ্যভারতের "দেওআস স্টেট সিনিয়র" (Dewas State Senior)-এ স্যার জেম্‌স আর রবার্টস ফুসফুসের আক্রান্ত স্থানে কার্বলিক অ্যাসিড, গ্লিসিরিন, নোভোকেইন ইত্যাদির এক সংমিশ্রণ ইঞ্জেক্‌সান দ্বারা টি. বি. রোগীর চিকিৎসা করতে শুরু করেছিলেন। আজকাল এঁর প্রতিষ্ঠানটির কি হয়েছে জানি না। অনেক কাল আগেই মসলার (Mosler) বলে এক ব্যক্তি কার্বলিক বুকের ভিতর ইঞ্জেকশান করে ফুসফুসের ক্ষত সারাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু জানা যায় যে তাঁর এ চেষ্টা সফল হয় নাই। জেমস রবার্টস-এর এই ইঞ্জেকশান সম্বন্ধেও ভালো রিপোর্ট কোনও ভাবেই পাওয়া যায় নাই।

পর্তুগীজ ভারতের একটি যক্ষ্মানিবাসের খোঁজ যা পেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে: হস্‌পিসিও স্যানাটোরিও ডি এস্‌ জোসে (Hospicio Sanatorio de S. Jose), মারগাও (Margao), সালসেট্‌ (Salsette), গোয়া। কোলাপুর স্টেটের জয়সিংপুর বলে একটি জায়গায় কয়েক বছর আগে ছোট একটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম গ'ড়ে উঠেছিল, এখনকার সংবাদ জানি না। নেপালের কাঠমাণ্ডুর একটি হিল-স্টেশনে একটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত হয়েছে (টোখা (Tokha) স্যানাটোরিয়াম, কাঠমাণ্ডু, নেপাল)। ভারতের সঙ্গে নেপালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্মে এটির উল্লেখ করলাম।

এ ছাড়া, ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই, বিশেষ ক'রে অপেক্ষাকৃত বড় শহরগুলিতে, সদর হাসপাতাল, সরকারী হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল, মিশনারী হাসপাতাল, মিলিটারী হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুল হাসপাতাল, সাধারণ হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটি বা ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌ বোর্ড হাসপাতাল—প্রভৃতিতে কিছু কিছু ক'রে যক্ষ্মা-বিছানা আছে। কলকাতায়ও মেডিক্যাল কলেজ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি হাসপাতালে কিছু যক্ষ্মা-বিছানা আছে। এই সব বেড্‌গুলির খবর স্থানীয় লোকেরা—যে প্রদেশেই হোক না কেন—একটু চেষ্টাতেই জেনে নিতে পারেন।

বিহারের দীঘা নামক স্থানে একটি আয়ুর্বেদ যক্ষ্মা হাসপাতালের সংবাদ পেয়েছিলাম। আরেকটিরও প্রস্‌পেক্‌টাস্‌ হাতে এসেছিল: ভূমিয়াধর (Bhumiadhar) আয়ুর্বেদিক টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ ভাওয়ালি (Bhowali) স্যানাটোরিয়াম, জেলা নৈনিতাল। আরও একটির সন্ধান পেয়েছিলাম: দি মারোয়াড়ী টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ গরখাল (Garkhal), কসৌলি হিল্‌স্‌। পশ্চিম বাংলার আয়ুর্বেদ যক্ষ্মা-নিবাসটির ঠিকানা হচ্ছে এই: দি যামিনীভূষণ টি. বি. হাসপাতাল, পাতিপুকুর, পোঃ দম-দম, জেলা চব্বিশ-পরগণা। পশ্চিম বাংলায় আরও একটি আয়ুর্বেদ যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্প্রতি হয়েছে কাগজে দেখলাম।

বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্গত পূর্ববঙ্গে নানা জায়গায় টি. বি. হাসপাতাল খুলবার উদ্যোগ-সংবাদ কাগজে দেখেছি মাঝে মাঝে, কিন্তু কোন্‌টির কাজ যে কি পরিমাণ এগিয়েছে তার সন্ধান নিতে পারিনি। কুর্মিটোলা (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, ফেণী, ফরিদপুর, সিলেট, সাপছড়ি পাহাড় (রাঙ্গামাটির কাছে) প্রভৃতি স্থানে এবং ছোট ক'রে বিভিন্ন

রোগটা যখন টি. বি.—

জেলায় টি. বি. হাসপাতাল খুলবার বা খোলা বিষয়ে পরিকল্পনার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে—মাত্র এর উল্লেখই আপাততঃ করতে পারা সম্ভব। পশ্চিম পাকিস্থানে মূলতান মিউনিসিপ্যালিটির অধীনেও বোধ হয় নতুন কোনও টি. বি. হাসপাতাল হয়ে থাকবে। আগেকার যে সব টি. বি. হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম ভারত-বিভাগের পরে পাকিস্থানের অন্তর্গত হয়েছে সেগুলির তালিকা এখানে দিলাম, কিন্তু বর্তমানে এর কোন্‌টি কি অবস্থায় আছে বা কিভাবে পরিচালিত হ'চ্ছে তা বলতে পারব না :

পশ্চিম পাঞ্জাব :

১। জুবিলী রেডক্রশ (মহম্মদ হোসেন) স্যানাটোরিয়াম, সামলি (Samli), জেলা রাওয়ালপিণ্ডি।

২। কৃষ্ণ ভগবান স্যানাটোরিয়াম, মূলতান।

৩। শ্রীমতী গুলাব দেবী (Gulab Devi) টিউবারকুলোসিস্ হসপিট্যাল, মডেল (Model) টাউন, লাহোর।

৪। রায়বাহাদুর অমরনাথ টিউবারকিউলোসিস ইন্‌সটিটিউট, মেয়ো (Mayo) হসপিট্যাল, লাহোর।

৫। কিং জর্জ V মেমোরিয়াল টি. বি. হাসপাতাল, রাওয়ালপিণ্ডি।

৬। ডাক্তার ধরমবীরস্ (Dr. Dharambir's) টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, গোলাপবাগ, লাহোর।

বেলুচিস্থান :

১। টিউবারকুলোসিস স্যানাটোরিয়াম, কোয়েটা (Quetta)।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ :

১। গভর্নমেণ্ট টিউবারকিউলোসিস স্যানাটোরিয়াম, দাদার (Dadar), জেলা হাজারা (Hazara)।

২। লেডী রেডিং (Reading) হসপিট্যাল, পেশাওয়ার।

সিন্ধু (Sind) :

১। পারপাতী আওয়াতসিং (Parpati Awatsing) স্যানাটোরিয়াম, ঝেরাক (Jherruck)।

২। মহারাজ দীপচাঁদ (Deepchand) তেজভান্দাস ওঝা (Tej-bhandas Ojha) স্যানাটোরিয়াম, আয়ুর্বেদিক টিউবারকিউলোসিস রিলিফ এসোসিয়েশান, করাচি। (গত যুদ্ধের সময় এটি মিলিটারির হাতে গিয়েছিল এবং আয়ুর্বেদীয় ও এলোপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসক সহ যুদ্ধের পরে স্যানাটোরিয়ামটির কাজ শুরু হবার কথা ছিল।)

উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরে যক্ষ্মাগ্রস্ত কয়েদীদের চিকিৎসার জন্মে "জেল হসপিট্যাল"-এ অনেকগুলি বিছানা আছে। এই ধরনের হাসপাতাল মাদ্রাজের বেলারী (Bellary) নামক স্থানেও একটি আছে বলে শুনেছিলাম। অন্যান্য প্রদেশেও যক্ষ্মাগ্রস্ত কয়েদীদের জন্মে কারাগার হাসপাতালগুলিতে রক্ষিত কিছু বিছানা আছে।

দক্ষিণ ভারতের ভেলোর ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাঃ বেট্‌স্ "নিউমোনেক্টমি" জাতীয় অস্ত্রোপচার কৃতকার্যতার সঙ্গে বর্তমানে এদেশে ক'রছেন ব'লে প্রকাশ।

একটি বিষয়ের উল্লেখ বিশেষভাবে এখানে প্রয়োজন। এটা যেন প্রত্যেকে খুব ভাল করে মনে রাখেন যে, যদিও আমি অনেকগুলি স্যানাটোরিয়াম, হাসপাতালেরই খবর দিলাম, কিন্তু এগুলির ভিতর

রোগটা যখন টি. বি.—

অল্প কয়েকটি বাদে, বিশেষতঃ অধিকাংশ সাধারণ হাসপাতালের টি. বি. ওআর্ডে, চিকিৎসার ব্যবস্থা অতীব অসন্তোষজনক বলেই জানি। স্যানাটোরিয়াম যা আছে তার অনেকগুলিতেই সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার কিছুমাত্র প্রচলন হয়নি। অস্ত্রচিকিৎসাদি তো তেমন নিয়মিতভাবে বা ভালোভাবে অল্প কয়েকটি স্থানেই করা হয়। আধুনিক চিকিৎসার যতটা উন্নতি হয়েছে তা দ্বারা খারাপ রোগীরও প্রাণ রক্ষা সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ স্যানাটোরিয়াম, হাসপাতাল এদিক দিয়ে বহু পিছনেই পড়ে রয়েছে। কাজেই রোগীদেরও চিকিৎসা হয় না ভালভাবে, কারুর কারুর যদি বা কিছু উন্নতি হয় তাও স্থায়ী হয় না। কতকগুলি স্বাস্থ্যনিবাসে এখনও এক্স্‌রে-টেকস্‌রের ব্যবস্থা কিছুই নাই, কতকগুলির বোধ হয় কেবল বাড়ী মাত্রই সার। টি. বি. বেশই একটা সেরে যাবার মত রোগ হলেও এটা ভুললে চলবে না যে উপযুক্ত চিকিৎসা হলেই শুধু তা সারতে পারে—নতুবা নয়। কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থার ভিতরেই যদি থেকে যায় প্রচুর ত্রুটি, তা হলে টি-বি রোগীর সুস্থতা কেমন করে আশা করা যায়? যাই হোক, সব সময়ে আমরা এই ইচ্ছাই করব, যাতে নাকি আমাদের দেশের সমস্ত যক্ষ্মা-হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামগুলির দ্রুত উন্নতি হয়, সেগুলিতে আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালীর সর্ববিধ সুবন্দোবস্ত থাকে, এবং সেগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাও রোগীদের পক্ষে যাতে সব রকমে সন্তোষজনক হয়। ব্যাপক এবং সুসংবদ্ধভাবে আমাদের দেশে যক্ষ্মানিবারণী আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে, কাজেই আমাদের ত্রুটিগুলি নিয়েই আমরা হতাশ হব না, সত্যিকারের কাজের ভিতর দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে চলব শুধু আমরা এগিয়ে। এই ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধে ক্রমেই হবে অধিকতর জ্ঞানের বিস্তার, সুযোগ্য কর্মীদের তত্ত্বাবধানে আমাদের দেশের সমস্ত

যক্ষ্মাপ্রতিষ্ঠানগুলি এমনভাবে ক্রমেই গড়ে উঠবে যাতে করে আমাদের আর কোনও অভিযোগ করবার থাকবে না অবকাশ এবং পীড়িতদের সুস্থতাবিধানের প্রয়াস সব দিকে দৃঢ়তর হবে, এই সব আশাই উৎসাহের সঙ্গে আমরা অন্তরে পোষণ করব।

স্যানাটোরিয়ামে রোগীদের বিশ্রাম এবং ব্যায়াম কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা এখানে বলছি :

শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী রোগীদিগকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন রঙের "চিহ্ন" বা "ব্যাজ" রোগীর বিভিন্ন অবস্থা সূচনা করে। যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে যে নিয়ম গ্রহণ করা হ'য়েছে সেটা এই রকম :

লাল ব্যাজ্ : বিছানায় পূর্ণ বিশ্রাম। কোনও কারণেই রোগী বিছানা থেকে উঠতে পারবেন না। বিছানায়ই তাঁকে খেতে হবে এবং "বেড্-প্যান্" ব্যবহার করতে হবে।

কমলা ব্যাজ্ : রোগী শুধু উঠে বসে খেতে পারেন, বাথ্রুম এবং পাইখানায় যেতে পারেন। অন্য সব সময়েই তাঁকে বিছানায় থাকতে হবে।

বেগুনী ব্যাজ : যতটুকু সময় চিকিৎসকের নির্দেশ থাকে ততটুকু সময় রোগী বারান্দায় এসে বসতে বা পায়চারি করতে পারেন এবং ঘরের ভেতরকার শ্রমবিহীন খেলাধুলোয় যোগ দিতে পারেন। তবে ওআর্ড ছেড়ে তিনি বাইরে যেতে পারবেন না, এবং বাকি সময়টা বিছানায়ই তাঁকে কাটাতে হবে।

সবুজ ব্যাজ্ : চার ফার্লং-এর অনধিক যাঁরা হাঁটবেন। হাঁটা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওআর্ডে ফিরে আসতে হবে।

নীল ব্যাজ্ : চার ফার্লং-এর বেশী যাঁরা হাঁটবার অনুমতি পেয়েছেন।

এই রোগীরা হাঁটার শেষে মাঠে কিম্বা প্রমোদাগারে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে পারবেন।

(রোগীকে যত ফার্লং হাঁটতে দেওয়া হবে, বুঝতে হবে, যাওয়া এবং আসা দুটো মিলিয়ে তত ফার্লং)।

যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল রোগীদের জন্যে যে টাইম-টেব্‌ল্‌ করেছেন সেটা হচ্ছে এই ঃ

সকাল ৫. ৩০ (শীতকালে ৬ টা)—বিছানায় শুয়ে টেম্পারেচার গ্রহণ।

৭-৩০ অবধি—পাইখানায় যাওয়া, মুখ ধোয়া, ব্যায়াম, স্পঞ্জিং, বা স্নান (যাঁর যে রকম ব্যবস্থা থাকবে)।

৭-৩০—৮—সকালের জলযোগ।

৮ —১১—বিশ্রাম ঃ ডাক্তারের রাউণ্ড্‌।

১১ —১১-৩০—সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং নীরবতা।

১১-৩০ —টেম্পারেচার গ্রহণ।

১১-৩০—১২-৩০—মধ্যাহ্ন ভোজন।

১২-৩০—৩-৩০—সম্পূর্ণ বিশ্রাম ঃ নীরবতা।

৩-৩০—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৩-৩০—৪—শ্রমহীন আমোদ প্রমোদ এবং বিকালের জলযোগ।

৪—৬ ; ৬—৬-৩০—আত্মীয়-বন্ধুর সাক্ষাৎ। ব্যায়াম।

৬-৩০—৭—পূর্ণ বিশ্রাম ও নীরবতা।

৭ —টেম্পারেচার গ্রহণ।

৭—৯-১৫—নৈশ ভোজন ঃ শ্রমবিহীন আমোদ-প্রমোদ।

৯-১৫—শয্যা গ্রহণ।

৯-৩০—দীপ-নির্বাণ ঃ পূর্ণ নিস্তব্ধতা।

সব স্যানাটোরিয়ামেরই "ব্যাজ" বা "টাইম-টেব্‌ল্‌" একেবারে একই

প্রকারের নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্যানাটোরিয়ামে একটু-আধটু এদিক-ওদিক অদল-বদল এগুলির ভিতর থাকে, তবে আদত নিয়মগুলি সর্বত্রই প্রায় এক ধরনের।

প্রত্যেক স্যানাটোরিয়ামেই, যাঁদের অসুখ অপেক্ষাকৃত কম—তাঁদের ভিতরেই চিকিৎসার ফলাফল সব চেয়ে বেশী সন্তোষজনক হয়েছে। অনেক রোগী বুকের অতি খারাপ অবস্থা নিয়ে অবশেষে যান স্যানাটো-রিয়ামে—যখন নাকি তাঁদের সুস্থ করে তোলা চিকিৎসকের অনেক সময়ে প্রায় সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। কাজেই অসুখ অল্প থাকতে থাকতেই স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রয়োজনীয়তা সকলেরই বিশেষরূপে উপলব্ধি করা উচিত। রোগীর পক্ষে চিকিৎসাব সুবন্দোবস্ত করবার প্রচেষ্টার অভাবের মূলে আমরা এই সব ব্যাপারগুলি দেখতে পাই: (১) যখন বাইরে কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না অথবা লক্ষণগুলি যদি তাঁকে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলবার মত প্রবল না হয়, তবে তাঁর পক্ষে বোঝাই দুষ্কর হতে পারে যে তাঁর এমন একটি অসুস্থতা ঘটেছে। তিনি হয়ত এই সময় কোনও যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। আপাত-দৃষ্টিতে সুস্থ এমন বহুলোক অনেক সময় যক্ষ্মারোগের বাহন এবং সংক্রমণ-বিস্তারকারী হয়ে থাকেন বলে বর্তমানে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলনের কর্মিগণ এই মত প্রকাশ করছেন যে কলেজ, আপিস, ফ্যাক্টরি—ইত্যাদিতে প্রবেশ করবার আগে রোগের লক্ষণ কারুর না থাকলেও প্রত্যেককে যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত। তাঁরা এই মত প্রকাশ করছেন যে যাঁরা একেবারে অসুস্থ তাঁদের নিয়ে থাকলেই চলবেনা, কোনও পরিবারে একটি যক্ষ্মাগ্রস্ত দেখা দিলে সেই পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যই পরীক্ষা করতে হবে, এবং যাঁদের টিউবারকিউলিন টেস্ট্ পজিটিভ্ অথবা যাঁরা কোনও না কোনও প্রকারে

সক্রিয় ব্যাধিযুক্ত যে কোনও যক্ষ্মারোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের বুক মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা ক'রে—দরকার হলে এক্স-রে ছবি তুলে—তাঁদের সদুপদেশ দিতে হবে। কোনও রকম লক্ষণের প্রকাশ না করে অনেক সময়ে এই ব্যাধির পক্ষে যথেষ্ট দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব বলে যক্ষ্মানিবারণী সমিতির কর্তৃপক্ষগণ তাঁদের কাছে কবে রোগী আসবে এই অপেক্ষায় না থেকে তাঁকে তাঁদের নিজেদের খুঁজে বের করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করছেন, এবং এ বিষয়ে প্রত্যেক 'সুস্থ' লোকের সহযোগিতা তাঁরা চাইছেন।

এই প্রসঙ্গে "ম্যাস্ রেডিওগ্রাফী" (Mass Radiography) অর্থাৎ সর্বজনীন রঞ্জনচিত্র পরীক্ষার উল্লেখ প্রয়োজন। ম্যাস্ রেডিওগ্রাফী যক্ষ্মানিবারণী আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত নতুন একটি অধ্যায় এবং অতি অল্প সময়ে ও অতি অল্প খরচায় শত শত লোকের ক্ষুদ্রাকৃতি এক্স্-রে ছবি তুলে পরে সেটি বড় করে দেখে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের কাজ এতে সম্পন্ন হয়। পাশ্চাত্যদেশে এর ব্যবহার বাপকভাবে শুরু হয়েছে এবং এর জনপ্রিয়তাও বেড়ে চ'লেছে। জনসাধারণের ভেতর, বিশেষ ক'রে ফ্যাক্টরি বা ওআর্কশপের কর্মীদের ভেতর যাঁদের বুকে যক্ষ্মার দোষ ঘটেছে, ম্যাস্-রেডিওগ্রাফীর সাহায্যে বিছানায় পড়বার অনেক আগেই তাঁদের খুঁজে বের করা ও তাঁদের সতর্ক করা আগের চাইতে অনেক সহজে সম্ভবপর হ'চ্ছে। (এই বই ছাপা হবার অবস্থায় কলকাতায় সর্ব-প্রথম ম্যাস্-রেডিওগ্রাফীর একটি ইউনিট্ এলো—এবং ভারতে এইটি দ্বিতীয় বলে জানলাম)। (২) আরেক ধরনের রোগী আছেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সতর্কতাসূচক বাণী শুনেও তাঁরা প্রবলভাবে তাঁদের ব্যাধিকে অস্বীকার করেন। তাঁরা ভুলে যান যে তাঁদের মত অসংখ্য সুস্থ ব্যক্তিই এই ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁদের সাবধান করতে গেলে তাঁরা

ওঠেন রুখে। আপন অজ্ঞতা নিয়ে তাঁরা থাকেন তুষ্ট এবং বাড়ীর অন্য সবার বা প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্যের মূল্যও তাঁদের কাছে কিছুই নাই! (৩) অনেক সময় রোগীর 'বিজ্ঞ' বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে বারণ করেন এবং এই মন্তব্য করে থাকেন—এই সব চিকিৎসকেরা লম্বা 'বুজরুগ' ছাড়া আর কিছুই নয়। (৪) রোগী যখন নিজের অসুস্থতার বিষয় ভালরকম বুঝতে পারেনও, আর্থিক দুরবস্থার জন্যেও তিনি হয়ত নিজের সুব্যবস্থা করে উঠতে পারেন না। তারপরে তাঁর আরও ভয় আছে—অসুখের কথা প্রকাশ পেলে চাকুরিটি হয়ত তাঁর যাবে; বাড়ীওয়ালা হয়ত দূর করে তাড়িয়ে দেবে; তাঁর সন্তানটির বিবাহ-ব্যাপারে হয়ত বহু বিপর্যয় ঘটবে; নানাভাবে নানালোকের কাছে হয়ত তাঁকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হতে হবে। সমাজচ্যুত হবার এবং স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে করুণভাবে তিনি চেষ্টা করেন নিজের ব্যাধিকে লুকোতে, ভীত হয়ে ওঠেন পাছে বহু কষ্টে গড়ে-তোলা ছোট্ট সংসারটি তাঁর ভেঙে যায়! (৫) আবার আরেক ধরনের রোগী বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন আছেন, যাঁরা এই রকম বলেন: "আরে মশায়, অমুক রক্ত-ওঠা নিয়েই কত কাজ করে বেঁচে গেল আশি বচ্ছর! ও সব কিছু না—ভয় করলেই চেপে ধরে, ভয় না করলেই সব উড়ে যায়।"... এঁরা ব্যাধিকে মেনেও মানেন না, হাস্যকর কতকগুলি মতামত প্রকাশ ক'রে এঁরা সাজেন এক ধরনের অজ্ঞ বীরপুরুষ—যদিও সংশয়ের হাত থেকে সব সময়ে এঁরা নিস্তার পান না। (৬) কেউ বা আগে থাকতেই এই ব্যাধি চিকিৎসার অসাধ্য ভেবে সহজে কোনও চেষ্টা করতে চান না। বা মরিয়া হয়ে উঠে নিজের অযত্ন করেন। (৭) রোগ অল্প থাকবার অবস্থায়ও স্যানাটোরিয়ামে যাবার চেষ্টা করলেই যে রোগী সেখানে একটা জায়গা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন তা না-ও হতে পারে।

রোগটা যখন টি. বি.—

আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় যে সামান্য ক'টি বিছানা ('বেড্') স্যানাটোরিয়ামগুলিতে আছে, তার একটি জোগাড় করতে অনেক সময়েই কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসও (অবস্থাবিশেষে বছর খানেক বা তারও বেশী) কেটে যেতে পারে। আর, রোগীদের অনেকদিন ধরে রাখতে হয় বলেও বেড্ তাড়াতাড়ি খালি হতে চায় না। এই সময়টা রোগীর অসুখ হয়ত চিকিৎসার অভাবে ক্রমাগতই বেড়ে চলে, কখনও বা তাঁর মৃত্যুও হয়---সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর আরও অনেককে সংক্রামিত ক'রে। এবারে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে টিউবারকুলোসিস্ ব্যাধিটি কি রকম সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই ভারতের অন্ধকারময় চিত্রটির আবরণ আমাকে উন্মোচন করতে হল। এই ব্যাধিটি এই দেশে যে রকম দ্রুত-পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে তাতে সমস্ত দেশটি এই ব্যাধির একটি "ডিপোতে" পরিণত হয়েছে—বলা যেতে পারে। প্রত্যেক প্রদেশে প্রতি বছরে এই এই ব্যাধি যে পরিমাণ লোকের জীবন হানি করে চলেছে, তার খবর নিলে দম আটকে আসতে চাইবে। প্রত্যেক ব্যাধিগ্রস্তের সংবাদ কর্পোরেশান, মিউনিসিপ্যালিটি বা অন্য কোনও স্বাস্থ্যসমিতিতে দিতে হবে—এমন কোনও বাধ্যতামূলক আইন আমাদের দেশে নাই, কাজেই স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই ব্যাধিতে ঠিক কতজন ভুগছে এবং কতজন মরছে এ বিষয়ে যথাযথ খবর রাখা বা হিসাবতালিকা তৈরি করা অনেক সময়েই অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকৃত সমাজ এবং স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি জেনে হয়ত শিউরে উঠবেন যে যত লোকের সংবাদ পাওয়া যায় তার চেয়ে ঢের বেশীসংখ্যক লোক এই কুটিল ব্যাধিতে এই দেশে শোচনীয়ভাবে ভুগছে। এই রোগীদের সম্বন্ধে যে সব সংখ্যা

এক এক স্থানের স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষ এক এক সময়ে প্রকাশ করেন, তা কোনপ্রকারেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। আমরা বেশ ভাল-রকমই জানি যে এই ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হলে এদেশে কম লোকেই তা সহজে স্বীকার করতে চায়, এবং প্রকৃতপক্ষে অল্পসংখ্যক রোগীর সংবাদই স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কাজেই যে সব বিবরণী তৈরি হয় তাও ভ্রান্তিপূর্ণ। পরিবারে কারুর যক্ষ্মা ব্যাধি হয়েছে এটা গোপন রাখবার জন্যে বহু যক্ষ্মাজনিত মৃত্যুকে শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটিত অন্য কোনও ব্যাধিতে মৃত্যু হয়েছে বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে, ভারতবর্ষে এই ব্যাধির প্রসার যে কতখানি সেটা সঠিকভাবে বোঝাই যায় না। বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যালিটির অধীন স্থানগুলিতে যদিও টি. বি. জ্ঞাপন-যোগ্য ব্যাধি ('নোটিফায়েব্‌ল্‌ ডিজিজ্‌') বলে আইনতঃ পরিগণিত হয়েছে, কিন্তু খুব কমসংখ্যক চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য-বিভাগের লোকেরাই ঠিকমত্‌ এই ব্যাধিগ্রস্তগণের সকলের সংবাদ যথাস্থানে জানিয়ে থাকেন। আর পল্লী-অঞ্চল তো এই আইনের এলাকারই বাইরে এখনও! তারপরে, মফঃস্বলে বহু চিকিৎসক সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারেনও না। এই ভাবেও আরও অনেক রোগীর খবরই বাদ যায়। অনেক স্থানে টি. বি. রোগীদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোনও রেকর্ডও রাখা হয় না। এবং ভারতবর্ষের বহু মিউনিসি-প্যালিটি বা ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ বোর্ডেই এখনও টি. বি. জ্ঞাপন-যোগ্য (নোটিফায়েব্‌ল্‌) ব্যাধি বলেও পরিগণিত হয় না। যে সব স্থানে বা এটা 'নোটিফায়েব্‌ল্‌', সেখানেও যে সংখ্যা উপস্থাপন করা হয় সে-গুলিকে বিশ্বাস করা যায় না। ভারতবর্ষে মৃত্যু সম্বন্ধে রিপোর্ট যা তৈরি হয় তা প্রায় সব সময়েই বাড়ীর কর্তার, বা ঝি-চাকরের (গ্রামে হলে বড় জোর অশিক্ষিত চৌকিদারের) প্রদত্ত সংবাদের

উপর নির্ভর ক'রে। এসব লোক যা বলে দেয়, তাই টুকে নিয়ে মৃত্যুর রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়। বিশেষ কোনও একটা প্রবল লক্ষণ দেখে অসুখটাকে আন্দাজী যা হয় একটা কিছু ধরে নেওয়া হয় এবং মৃত্যুর কারণও ধরে নেওয়া হয় তাকেই। কাসি যদি খুব বেশী থাকে—তবে সেটাকে রেকর্ড করা হয় নিউমোনিয়া অথবা ব্রংকাইটিস বলে। যদি গায়ের তাপ খুব বেশী থাকে তবে সেটা গেল 'জ্বরের' মধ্যে—'ম্যালোয়ারি' বলেই হয়ত সেটাকে চালিয়ে নেওয়া হল। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে 'জ্বর' বলে যেগুলি চলে তার শতকরা দশটিই এবং "বুকের দোষ" বলে অন্য নামে যেগুলি চলে তার শতকরা পঁচিশটিই যক্ষ্মা। এরই পরিণাম হচ্ছে যে ঠিক খাঁটি অঙ্ক কোথাও মেলেনা, এবং কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে সংবাদ প্রচার করা হয় তাতে আসল অবস্থাকে হয়তো অনেকখানি কমিয়ে বলা থাকে।

ভারতবর্ষে এই ব্যাধিটি ঠিক কোন্ অবস্থায় এখন আছে সেটা বলা বড় শক্ত। বহু-ব্যাপক আকারে এই ব্যাধির চরম সীমায় ওঠার অবস্থাটাকে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশগুলি অতিক্রম করে এসেছে বলে অনেকে বলছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই ব্যাধিটি চরম সীমায় এখনও নাকি ওঠেই নাই, উঠবার সবে নাকি হয়েছে শুরু। ইংল্যাণ্ডে এই ব্যাধির প্রকোপ চরমে উঠেছিল ১৮৩০ সালে। ভারতবাসীর দেহে যক্ষ্মা-সংক্রমণের অবস্থাটা, আফ্রিকাবাসীর দেহে যত অল্প পরিমাণ সংক্রমণ ঘটেছে এবং বিপুল শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র-গুলিতে ও মহানগরীর বুকে অবিরত অবস্থানকারী ইয়োরোপবাসীদের দেহে যত অধিক পরিমাণ সংক্রমণ ঘটেছে, এই দুয়ের মাঝামাঝি বলে অনেকে বলছেন। এই মত কতটা ঠিক বা বেঠিক তা নিয়ে

প্রতিকারের পথ কোথায় ?

ভারতবর্ষে প্রতি বছর টি. বি. তে ৫০০,০০০ লোকের মৃত্যু হচ্ছে এবং প্রতি ৫ জনের ভিতরে একজন আক্রান্ত বলে জানা যাচ্ছে। দিন দিন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকারের উপায় কি ?

টি. বি. রোগের অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে পুষ্টিহীনতা—বিশেষ ক'রে প্রোটিন খাদ্যের অভাব। প্রোটিনের মধ্যে Tryptophan (essential amino acid) এর অভাব টি. বি. রোগীদের ভিতর বিশেষভাবে দেখা যায়। এ অভাব পূরণ করা যায় বিভাজিত (fragmented) প্রোটিনের সহায়তায়। Protein Hydrolysate পরিপূরকের কাজ করে বলে Hydroprotein (Oral) বিশেষ ফলপ্রদ।

শৈশব হতে লৌহজাতীয় খাদ্যের অভাবে একপ্রকার রক্তহীনতা আরম্ভ হয়। শিশুদের সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য দুগ্ধও এ অভাব মেটাতে পারে না। একবার শরীর ভেঙ্গে পড়লে তা ধীরে ধীরে নানারূপ ব্যাধির আকর হয়ে পড়ে। অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় বা প্রসবের পরেও এরূপ অভাব হয়ে পড়ে, তাই মা ও সন্তান উভয়েই রোগাক্রান্ত হয়। কিন্তু সামান্য লৌহ জাতীয় খাদ্য দ্বারা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। Hæmogen এরূপ একটি রক্ত-বর্ধক খাদ্য।

ফুসফুসের ক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে ভিটামিন জাতীয় খাদ্য। ভিটামিন "এ" এজন্য বিশেষ উপযোগী। সুস্বাদু ও মুখরোচক Super Neo-Cod দ্বারা এ অভাব পূরণ করা যায়। ইহাতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভিটামিনও আছে।

প্রোটিন হাইড্রোলিসেট, লৌহ, ভিটামিন প্রভৃতি ব্যবহারে দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি ক'রে ঘরে ঘরে টি. বি.র বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় ক'রে তোলা দরকার।

প্রতিরোধই হচ্ছে প্রতিকারের সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

বি. আই.

তর্ক না করে একথা অনায়াসে বলতে পারা যায় যে একটি ভয়াবহ সমস্যার আকারেই এই ব্যাধি বর্তমানে এদেশে আবির্ভূত হয়েছে।

বাংলার যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির এক সময়কার রিপোর্ট অনুসারে সমস্ত বাংলা দেশে দশ লক্ষ লোক এই ব্যাধিতে ভুগছে এবং মৃত্যু ঘটছে প্রতি বৎসর এক লক্ষ লোকের। শুধু কলকাতা সহরেই এই ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা তিরিশ হাজার, এবং বাৎসরিক মৃত্যু সংখ্যা তিন হাজার। অভিজ্ঞের মতে কলকাতায় অন্য যে কোনও ব্যাধির চেয়ে যক্ষ্মা দ্বারা মৃত্যুর হারই বেশী। প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে যেখানে অন্ততঃ একটি স্বামী, একটি স্ত্রী বা একটি শিশুও এই ব্যাধিতে প্রাণ হারায় নাই!

একই রকমে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশগুলির কথাও বলা চলে। কানপুরের একটি সংবাদে প্রকাশ, একটি-ঘর-বাদে-একটি-ঘরই সেখানে যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত! কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে এই ব্যাধিতে একটি যদি হয় মৃত্যু, সেখানে ৭।৮ জন বা ৯।১০ জন ক'রে ভুগছে। মোটামুটি দেখা গিয়েছে যে ভারতবর্ষে প্রতি বছর পঞ্চাশ লাখের উপর থেকে যাট লাখের উপর লোক এই ব্যাধিতে ভুগছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলিও প্রকৃত খবর নয়, এর ভিতরেও বহু গলতি আছে এবং এসবও নাকি প্রকৃত অবস্থাকে অনেক চেপেই বলা হয়েছে!!

আমাদের দেশে পুরুষদের চাইতে মেয়েদের ভিতরে এই রোগের প্রসার অনেক অধিক, ৫।৬ গুণই বোধ হয় হবে। দেখা গিয়েছে—১০ থেকে ১৫ বছর বয়সে একটি বালকের জায়গায় দুটি বালিকার, ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সে একটি যুবকের জায়গায় তিনটি তরুণীর, এবং ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে একটি পুরুষের জায়গায় দুটি স্ত্রী-

লোকের হয় এই ব্যাধিতে মৃত্যু। মেয়েদের ভিতরে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রবলতর হবার কারণ এই-ই যে তাদের অধিকতর ভাবে স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন করে চলতে হয়। বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্যকে পীড়ন করে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ, অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা, স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এমন ধরনের রান্নাঘরে চব্বিশ ঘণ্টা আটকে থাকা, সকলের শেষে নিকৃষ্ট খাবার খাওয়া বা রোগ-গ্রস্ত স্বামী, শ্বশুর ইত্যাদির পাতে খাওয়া, ব্যাধির প্রকৃতি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান না নিয়ে বাড়ীর রুগ্ন ব্যক্তির সেবার ভার গ্রহণ করা, শরীরে রোগ লুকিয়ে রাখা, শরীরের প্রতি অন্য নানা রকম অবহেলা—কখনও অজ্ঞতায়, কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও অবস্থা-বিপর্যয়ে···মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মূলে এগুলি সবই রয়েছে। পুরুষের চাইতে মেয়েরা এই ব্যাধি দ্বারা বেশী আক্রান্ত নানাভাবে হতে পারেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা যথাসময়ে অথবা কোনও সময়েই না হওয়াতে তাঁদের ভিতরে মৃত্যুর হারও বেশী। বাড়াবাড়ি না হলে পরিবারে খুব কম মেয়েরই চিকিৎসার বন্দোবস্ত আগে থাকতে ভালভাবে হয়—তা যে কোনও ব্যাধিতেই তাঁরা আক্রান্ত হোন না কেন। এই ব্যাধির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নাই।

যক্ষ্মারোগকে বিতাড়িত করবার জন্যে অ্যামেরিকা, ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে যে কি রকম কাজ হচ্ছে তা জেনে সকলে হয়ত চমৎকৃত হবেন। অ্যামেরিকার য়ুনাইটেড্ স্টেটস্-এর জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। দেশের সমস্ত স্বাস্থ্য-সমিতি-গুলির সঙ্গে এবং চিকিৎসকসমাজের সঙ্গে যোগ রেখে পরস্পরের মধ্যে সাহায্য আদান-প্রদান, দেশের বয়স্কদের ভিতরে টি. বি. সংক্রান্ত সব রকম শিক্ষা-প্রচার, শিশুদের স্বাস্থ্যের খবর করা এবং বিশেষভাবে

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলা, টিউবারকুলোসিস্ সংক্রান্ত কাজের জন্যে "ক্রস্‌মাস্ সিল" নামক টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা এবং অন্যান্য নানা উপায়ে অর্থসংগ্রহ, টিউবারকুলোসিস্ সংক্রান্ত নানারকম ফিল্‌ম্, পত্রিকা, বই, বিজ্ঞাপন প্রকাশ, টি. বি.র চিকিৎসা এবং এই ব্যাধির সর্বপ্রকার সমস্যা সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার গবেষণা এবং অনুসন্ধান, সমিতির কাজের জন্যে উপযুক্ত কর্মী তৈরি করা, সমস্ত রকম যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠানগুলির নানা রকম যে সব জিনিসের প্রয়োজন হয়, সেগুলি প্রস্তুত এবং সরবরাহ করা....এগুলিই ছিল সমিতিটির মোটামুটি উদ্দেশ্য। স্থাপিত হবার পর থেকে এই সমিতির কাজ যে কি অদ্ভুতভাবে এগিয়ে চলেছে, নানাদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার দ্বারা একের পর একে যে সব নতুন নতুন পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা হচ্ছে এবং সমিতির কাজ বর্তমানে যে কি বিরাট আকার ধারণ করেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা এই ছোট বইখানিতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এইভাবে কাজ চলবার ফলে ইউনাইটেড্ স্টেটস্ অব্ অ্যামেরিকায় ১৯০০ সালে ১০০,০০০ লোকের ভিতর যেখানে যক্ষ্মা রোগে মরত ২০২ জন, ১৯৪৮ সালে সেখানে উক্ত সংখ্যক লোকের ভিতরে মরেছে মাত্র ৩০ জন।

ইংল্যাণ্ডের জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির কাজও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এই সমিতি এবং এই সমিতির কাজও একই ধরনের প্রায়। সুন্দরভাবে কাজ চলবার ফলে ১৮৯৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনে যক্ষ্মা-ব্যাধিতে মৃত্যুসংখ্যা যেখানে ছিল ৭০, ২৭৯,—১৯৩৭ সালে সেই সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছিল—বুকের যক্ষ্মায় ২৬, ৭৬১তে, এবং অন্যান্য সব রকমের যক্ষ্মায় ৫, ৪৩১-এ। আরও বলা যায়—ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে ১৮৭১ সালে এক লক্ষ লোকের ভিতর যক্ষ্মারোগে যেখানে

মরেছিল ৩৫৪ জন, এবং ঐ সালে এক লক্ষ লোকের ভিতর স্কট্‌ল্যাণ্ডে যেখানে মরেছিল ৩৭৩ জন, সেখানে ১৯৩৭ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে মরে ৭০ জন, এবং স্কটল্যাণ্ডে মরে ৭৪ জন। আয়ার্ল্যাণ্ডেও ঠিক একই ভাবে মৃত্যুর হার কমে গিয়েছে। ওদেশে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্যে যত রকম প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি যে কেবল সংখ্যায়ই প্রচুর তাই নয়, সেগুলির অধিকাংশেরই পরিচালনাও এত সুন্দরভাবে হয়ে থাকে যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগ বহু রকম ব্যবস্থা দ্বারা সুসজ্জিত। এবং রোগীর চিকিৎসাকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করবার জন্যে কোনও রকম চেষ্টারই ত্রুটি নাই। "কোনও আশা নাই" এই কথা বলে একটি রোগীকেও কখনও এদেশে পরিত্যাগ করা হয় না, সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসার বন্দোবস্তই হয়ে থাকে তার। সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে রোগীদের চিকিৎসার এমন সব প্রতিষ্ঠান এখানে আছে, আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রখ্যাতনামা ও অতি-আভিজাত্যপূর্ণ স্যানাটোরিয়ামগুলি যাদের পাশে মোটে দাঁড়াতেই পারে না!

ইটালিতেও যক্ষ্মানিবারণী আন্দোলন বিপুল কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে। যে সব ব্যাধি দ্বারা জাতি এবং সমাজ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের ভিতরে যক্ষ্মাকে ইটালির গভর্নমেণ্ট দিয়েছেন সব চেয়ে উপরে স্থান। ইটালির অর্ধেক লোক যক্ষ্মা-বীমার নিয়মে এসেছে। এই বীমা দ্বারা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিনা খরচায় চিকিৎসিত হবার সুযোগ পান এবং তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর অসুস্থতার সময়ে নিয়মিত সাহায্য পান। লোকটির কাছ থেকে এবং তার মনিবের কাছ থেকে সমান অংশে সামান্য চাঁদা নিয়ে এই বীমার হয় সৃষ্টি। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩—এই পাঁচ বছরে ইটালি যক্ষ্মা-নিবারণী কাজে খরচ করেছিল ছত্রিশ কোটি টাকা। তবুও তো এটা কতো পুরোনো খবর! ১৯০০ সালে ইটালিতে এক

লক্ষ লোকের ভিতর এই রোগে যেখানে মরত ১৮৬ জন, এই সব চেষ্টার ফলে ১৯৩৫ সালে সেখানে মরেছে মাত্র ৮৯ জন!

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও প্রচুর কাজ হয়েছে। এবং তারই ফলে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার এইভাবে কমে গিয়েছে: জার্মানিতে এক লক্ষ লোকের ভিতর ১৯০০ সালে মরে ২২৫ জন, ১৯৩৫ সালে ৭৩ জন; ফ্রান্সে ১৯১৫ সালে ২৪২ জন, ১৯৩৪ সালে ১৫১ জন; ডেনমার্কে ১৮৮৫ সালে ২০৩,—১৯৩৫-এ ৫১; নরওয়েতে ১৯১৫ সালে ২১০,—১৯৩৫-এ ১০৬; সুইডেনে ১৯১৫তে ২০৩,—১৯৩৫-এ ৯৪; সুইটজারল্যাণ্ডেও ১৯০০ সাল থেকে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার নিয়মিতভাবে কমে এসেছে। শুধু পুরুষরাই নয়, মেয়েরাও এসে দলে দলে যোগ দিচ্ছেন যক্ষ্মা-নিবারণী কাজে।

এঁদের যক্ষ্মাসংক্রান্ত কাজের আরেকটি দিক হচ্ছে—অপেক্ষাকৃত সুস্থ যক্ষ্মা রোগীদের জন্যে এমন কিছু ব্যবস্থা করা যাতে নাকি তাঁরা তাঁদের সুস্থতা-টাকে বজায় রাখতে পারেন—মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে বাস করে, উপযুক্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত কাজ করে, এবং সর্বদা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে। সুদীর্ঘকাল অসুস্থতা-ভোগের পরে স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে কখনও সমাজের অবিচারে, কখনও আপন অবস্থা-বিপর্যয়ে, কখনও প্রলোভনে পড়ে—হয়ত প্রত্যেক রোগীরই মন উন্মুখ হয়ে ওঠে বাইরের আনন্দময়, কর্মময় জগতে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে; কিন্তু তাঁর চিকিৎসক বাউল সুরে গাইছেন: "নিঠুর গরজি! তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে···?" রোগীর এই দিককার সমস্যা সমাধানের জন্যে ওঁরা আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন—কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা ভাবছেন। সমস্ত যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ভিতরে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের ঢোকানর চেষ্টা করে, অন্যান্য

নানা বিভাগের জন্যে তাঁদের নানা রকম শিক্ষা দিয়ে, তাঁদের উপযুক্ত কাজ দেবার জন্যে সে সব বিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সুস্থ থেকে জীবিকার্জন করবার ব্যাপারে তাঁদের নানারকম সহায়তা করে—এসব দেশের যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন চিন্তাশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে।

ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজের কাছে প্যাপ্‌ওআর্থ নামক স্থানে যক্ষ্মারোগীদের জন্যে যে অপূর্ব প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে, তার কার্যকলাপে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। রোগী এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার পরে প্রথমে তাঁকে উপযুক্ত কটেজ বা হস্‌টেলে যোগ্য চিকিৎসকের নিয়মিত তত্ত্বাবধানে রেখে প্রতিষ্ঠানটির আপিস, ফ্যাক্টরি, এবং অন্যান্য বহু রকম শিল্প-বিভাগে তাঁকে নানা রকম শিক্ষা দিয়ে, তাঁকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করে অর্থ-উপার্জন এবং ক্রমোন্নতি দ্বারা তাঁর নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে প্রতিপালনের সুযোগ দিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে স্থায়ীভাবে এই উপ-নিবেশে রাখবার ব্যবস্থা করে এবং তাঁকে স্বামী বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিয়ে আনন্দময় পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন যাপনে সহায়তা করে প্যাপ্‌ওআর্থ যে আদর্শ স্থাপন করেছে তা তুলনা-বিহীন। যাঁরা প্যাপ্‌-ওআর্থের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যাঁরা এর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, তাঁদের মত হচ্ছে এই যে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা দ্বারা রোগীকে সুস্থ করে তারপরে যদি তাঁর সেই সুস্থতাটাকে উত্তমরূপে রক্ষা করবার সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত না করা যায় এবং তাঁর অর্থোপার্জন-ক্ষমতাকে ফিরিয়ে এনে যথাসম্ভব তাঁকে একটা স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না দেওয়া যায়, তবে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা এবং তার পিছনে সমস্ত অর্থ-ব্যয় শুধু প্রকাণ্ড একটা ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হবে।

ইংল্যাণ্ডে প্যাপ্‌ওআর্থের আদর্শে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে।

যক্ষ্মারোগে কেবল "জীবাণু-তত্ত্ব" আলোচনা করেই যে চলবে না, এবং রোগীর মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক দিকগুলিকে উপেক্ষা করে যে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন কোনমতেই কৃতকার্য হতে পারে না, এটা প্রতিদিন অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করা হচ্ছে ও দেশে। অসুস্থতার অবস্থায় রোগীকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে নানাভাবে সাহায্য প্রদানের জন্যেও বিশেষ অর্থভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দেশে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন কি অবস্থায় আছে দেখা যেতে পারে। যখন জানতে পাই ফ্রান্সে চার কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের ভিতরে এক সময়ে যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্যে যখন ছিল ৭১,৬৩২টি বেড (১৯৩৪-এর খবর), ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে তিন কোটি সত্তর লক্ষ লোকের ভিতরে যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্যে যখন ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার বেড, সেই জায়গায় ভারতবর্ষে ছত্রিশ কোটি লোকের ভিতরে যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্যে রয়েছে টেনেটুনে মাত্র হাজার আটেক-দশেক বেড—তার ভিতরেও অধিকাংশের ব্যবস্থা নিতান্ত বাজে ছাড়া আর কিছু নয়; যখন জানতে পাই ডেনমার্কে কয়েক বছর আগেই যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্যে যে রকম সুবন্দোবস্ত ছিল, সেই সুবন্দোবস্ত যদি ভারতবর্ষে তখন থাকত তাহলে খুব কম করেও তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বেডের প্রয়োজন হ'ত; যখন জানতে পাই লণ্ডনে যখন ৪৫% হারে যক্ষ্মারোগের মৃত্যু কমে এসেছিল তখন কলকাতায় বেড়ে গিয়েছে ৭০% হারে; যখন অন্যান্য সভ্যদেশের কয়েকটি স্থানে এবং আমাদের দেশের কয়েকটি স্থানে প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে যক্ষ্মারোগে তুলনা-মূলক মৃত্যুর হার ১৯৪৯-৫০ সালের একটি নির্ভরযোগ্য রিপোর্টে এই রকম দেখতে পাই: ডেনমার্ক—৩০, ইউ. এস. এ—৩১,

হল্যাণ্ড—৩৭, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্—৫১, সুইডেন—৫১, সিংহল—৫৭, বেলজিয়াম—৬৪, নরওয়ে—৬৫, স্কট্ল্যাণ্ড—৭২, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড—৭২, ফ্রান্স—৭৪, ইটালি—৮৪, পর্তুগ্যাল—১৫৩, ব্রেজিল—২৪৬ এবং ভারতবর্ষ ২০০—৪০০ ;—তখন মনটা যে সত্যিই দমে যায় তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা অন্যান্য দেশ যে সুফল লাভে সমর্থ হয়েছে আমরাও যে তা হব না তার কোনই মানে নাই। ১৯১৮ সালে রাশিয়ায় পেট্রোগ্রাডে প্রতি এক লক্ষ লোকে যক্ষ্মারোগে মরত ৮০০ জন এবং "একটি বেড"-ও ছিল না তাদের চিকিৎসার জন্যে। অবশেষে যখন বিপুল উদ্যমে রাশিয়া লাগল এই ব্যাধির পিছনে, কি হল জানেন? ১৯৩৬ সালে যক্ষ্মা-ডিস্পেন্সারির সংখ্যা হল ৫০০, যে স্যানাটোরিয়ামগুলি স্থাপিত হল তাতে রোগীদের চিকিৎসার জন্যে বিছানা হল ৫১,০০০। মৃত্যুর হারও দ্রুতবেগে আসতে লাগলো নেমে। ১৫ বছরের ভিতর ৫০% হারে তারা এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা কমিয়ে আনল। মস্কোতে ১৯১৩ সালে এক লক্ষ লোকের ভিতর যেখানে মরেছিল ২৭৬ জন, ১৯৩৬ সালে সেখানে মরল ১৩৮ জন। আমরাও যদি আজ সমস্যাটিকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করে এর নিরাকরণের জন্যে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠি, তবে যক্ষ্মারোগ আমাদের দেশে কতদিন টিকে থাকতে পারবে?

ভারতের ব্রিটিশ আমলের বড়লাট-পত্নী লেডী লিন্‌লিথ্‌গোর চেষ্টায় যে ভারতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে এই : ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে শাখা-সমিতি স্থাপন, সমস্ত বিভাগের স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষ, সমাজসেবী, নিয়োগ-কর্তা, প্রতিষ্ঠান-পরিচালক ইত্যাদিকে যক্ষ্মানিবারণী কাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, বক্তৃতা, ছায়া-চিত্র, পুস্তিকা, প্রদর্শনী ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এই রোগ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের

ভিতর জ্ঞানের বিস্তার, সমাজের প্রত্যেক স্তরে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সঠিক তথ্য-সংগ্রহ, সমস্ত যক্ষ্মা-হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম-গুলিকে নানাভাবে সাহায্য করা, যক্ষ্মা-নিবারণী কাজের জন্যে বিশেষভাবে কতকগুলি চিকিৎসক, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক, নার্স ইত্যাদি গড়ে তোলা, বিভিন্ন স্থানে যক্ষ্মা-ডিস্‌পেন্সারি, স্যানাটোরিয়াম, আফটার-কেয়ার কলোনি, কেয়ার কমিটি—ইত্যাদি স্থাপন, এই ব্যাধি সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা, যক্ষ্মা-নিবারণী কাজে অর্থসংগ্রহ—ইত্যাদি। মোটের উপর অন্যান্য দেশে যে ভাবে এই আন্দোলন কৃতকার্য হয়েছে সেই আদর্শ গ্রহণ করেই আমাদের দেশে কাজ চলবে।

বৃহত্তর ভারতীয় যক্ষ্মা-সমিতির বঙ্গদেশীয় শাখা-সমিতি হচ্ছে "দি বেংগল টিউবারকুলোসিস্ অ্যাসোসিয়েশান" (৮নং লায়ন্স্ রেঞ্জ (Lyons range), কলিকাতা)।

এই সমিতির অধীনে কলকাতায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল (২৪, গোরাচাঁদ রোড, এনটালি), মেডিকেল কলেজ (কলেজ স্ট্রীট), আর. জি. কর. মেডিকেল কলেজ (বেলগেছিয়া,) কিরণশশী সেবায়তন (১০৫—১, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রীট), ইস্‌লামিয়া হাসপাতাল (১, বলাই দত্ত স্ট্রীট), স্যার গুরুদাস ইন্‌স্টিটিউট্ (নারিকেলডাঙ্গা), সারভেন্ট্‌স্ অব্ হিউম্যানিটি সোসাইটি (৩, সুরাবর্দী এভেনিউ)—প্রভৃতি স্থানে যক্ষ্মা ডিস্‌পেন্সারি আছে। এই ক্লিনিকগুলি ছাড়া কলকাতার বাইরে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে এবং দার্জিলিং, কালিম্পং, বজ্‌বজ্, শ্রীরামপুর, বহরমপুর, বর্ধমান, মেদিনীপুর—পশ্চিমবঙ্গের এই সব জায়গাতে এই সমিতির কর্তৃত্বাধিনে যক্ষ্মা-ক্লিনিক র'য়েছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি-গুলির অধীনেও এই রকম যক্ষ্মা-ক্লিনিক আছে।

এই কেন্দ্রগুলিতে সমাগত রোগীদের বুক, থুতু, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করা

হয়, বুকের এক্স-রে ফটো তোলা হয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও অল্প-বিস্তর হয়ে থাকে। কিন্তু কতকগুলি অবস্থায় এসব "আউট্-ডোরে" এ ব্যাধির চিকিৎসা কুলায় না, টানা-হ্যাঁচড়ায় বেশী অসুস্থ রোগীর ক্ষতিও হতে পারে। শরীর খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে যখন সংশয় এসে উপস্থিত হয়, তখন এসব স্থানে গেলে রোগ-নির্ণয় সঠিকভাবে হবে এবং এখানকার ডাক্তারের কাছে ভাল করে জিজ্ঞাসা করে তখনকার কর্তব্য মোটামুটি জেনে আসা চলবে। অন্য কোনও জায়গা থেকে খানিকটা সুস্থ-হয়ে-যাওয়া রোগীও এ. পি. ইঞ্জেক্‌শান ইত্যাদির জন্যে এসব ডিসপেন্‌সারির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত কলিকাতার আরও তিনটি যক্ষ্মা-ক্লিনিক হচ্ছে: টিউবারকুলোসিস্ রিলিফ এসোসিয়েশান (৭৩, ধর্মতলা স্ট্রীট), নিরাময় (পি-২৮, গণেশ এভিনিউ) এবং টিউবারকুলোসিস এইড্ সোসাইটি (আপার চিৎপুর রোড)।

দিল্লী, পাটনা এবং ত্রিভান্দ্রামে তিনটি সম্পূর্ণ নতুন যক্ষ্মা-কেন্দ্র শীগ্‌গীরই খোলা হবে।

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতবর্ষের যক্ষ্মা-নিবাস-গুলিতে বিছানার সংখ্যা এখনও এতই কম, যে, দেশের যক্ষ্মা-পীড়িতদের অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরই চিকিৎসা তাতে হতে পারে। এই অবস্থায়, যাঁরা স্যানাটোরিয়ামে যাবার সুবিধা করতে পারছেন না, বাড়ীতে রেখেই ঠিক স্যানাটোরিয়ামের নিয়মে তাঁদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত অগত্যা করতে হবে। ঘরে থেকে চিকিৎসা দ্বারাও অনেক রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে যদি নাকি সমস্ত বন্দোবস্তগুলি বেশ ভাল রকম হয় এবং অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও সৎপ্রকৃতির চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায়। কলকাতার নির্দিষ্ট কতকগুলি এলাকায় বঙ্গীয় যক্ষ্মানিবারণী

সমিতিও দরিদ্র এবং ক্লিনিকে আসতে অশক্ত রোগীদের বাড়ীতে গিয়ে ইঞ্জেক্‌শান ইত্যাদির ব্যবস্থা সমিতি থেকে ক'রছেন। এই ব্যবস্থার নাম হ'ল "ডোমিসিলিয়ারি ট্রিট্‌মেণ্ট।"

যক্ষ্মা রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য অনেকানেক ব্যবস্থার ভিতর বি-সি-জি টিকা দেওয়ার যে উদ্যম যক্ষ্মানিবারণী কর্তৃপক্ষ শুরু ক'রেছেন, জন-সাধারণের কর্তব্য তার পূর্ণ সুযোগ নেওয়া। এই টিকা নেওয়া ভয়ের কিছু নয়। টিউবারকুলিন টেস্‌ট্‌ "পজিটিভ্‌" হ'লে (অর্থাৎ দেহে আগে থেকে জীবাণু্‌ সংক্রমণ থাকলে) এই টিকা নেওয়া চলে না। কলকাতায় বি-সি-জির কেন্দ্র হচ্ছে "অল্‌ ইন্‌ডিয়া ইন্‌স্‌টিটিউট্‌ অব্‌ হাইজীন অ্যাণ্ড পাব্লিক্‌ হেল্‌থ্‌", ১১০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ।

এবার বিশেষভাবে দেশের ছাত্রসমাজকে আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কোনও ভাইস্‌-চ্যান্সেলার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল-সমিতির কয়েক বছরের রিপোর্ট একথা পুনঃ পুনঃ জানিয়ে এসেছেন এই ব্যাধির বিষ ছাত্রদের ভিতরে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্যকে কি ভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। তা ছাড়া ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্যানাটোরিয়ামের প্রায় প্রত্যেক বছরের বার্ষিক রিপোর্টেই দেখা যায় যে রোগীদের ভিতর ছাত্রদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। অ্যামেরিকায় বহু কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কেবল যে নানাভাবে জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করছে তাই নয়, নিজেদের তত্ত্বাবধানে তারা ভিন্ন সমিতি স্থাপন করেছে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আপনাদের ভিতরে যক্ষ্মানিবারণ-সংক্রান্ত প্রচারকার্য চালাচ্ছে। তাদের এই প্রচেষ্টার ভিতর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এবং অন্যান্য বিশিষ্ট যক্ষ্মা-কর্মিগণের রয়েছে পরিপূর্ণ সমর্থন এবং উৎসাহ। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে লেজাঁতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-

দের জন্তে স্বতন্ত্র স্থানাটোরিয়াম স্থাপিত হয়েছে। সেখানে তারা রোগের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পড়াশোনাও নিয়মিতভাবে চালাতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে। মণ্ট্‌পেলিয়ারের কাছে ফ্রান্সেও এই রকম আরেকটি স্থানাটোরিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্তে স্থাপিত হয়েছে। নানা দেশের সহযোগিতা নিয়ে একটি "আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থানাটো-রিয়াম" স্থাপন করবার ব্যবস্থায় লেজ্যাঁ এই ব্যাপারে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে (যুদ্ধের আগেকার খবর)।

শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে নয়, ভারতবর্ষের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিতরেই এই ব্যাধির সমস্যা একই রকম।

ইনটারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্থানাটোরিয়ামের কল্পনা আপাততঃ দূরে যাক—প্রত্যেক ছাত্রের মাঝে মাঝে অন্ততঃ টিউবারকিউলিন এবং এক্স-রে দ্বারা পরীক্ষা এবং সময় থাকতে তাকে সতর্ক করে দেবার ব্যবস্থাটুকুও যদি না হয় তবে সেটা বড়ই পরিতাপের বিষয় হবে। এ বিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠতে হবে। ছাত্র এবং শিক্ষকেরা অবকাশের সময়ে গ্রামে গিয়ে অজ্ঞ গ্রামবাসীকে এই ব্যাধির বিস্তার এবং প্রতিকার সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলে দেশের যক্ষ্মানিবারণী কাজে প্রচুর সহায়তা করতে পারেন।

আমাদের দেশে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে আমাদের শিক্ষা, মনোবৃত্তি, সামাজিক আবহাওয়া—ইত্যাদির ভিতর প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন। আমাদের দেশে এই আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় যে শুধু জনসাধারণের বিপুল অজ্ঞতা তাই নয়, তার সঙ্গে আছে সেই অজ্ঞতাকে অস্বীকার করবার একটা অন্যায় জেদ। কোনও স্থানে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের কথা হলেই এমন দেখা গিয়েছে—স্থানীয় লোকেরা উঠে পড়ে লাগেন তার বিরুদ্ধে। অনেক ছোটখাট

মউনিসিপ্যালিটির সদস্যেরাও এ বিষয়ে দেখিয়ে থাকেন প্রচুর দায়িত্ব-হীনতা। একটি যক্ষ্মা-হাসপাতালের নামে সাধারণের এত ভয়, অথচ সকলে জানেন না যে, যে দেশে টন্‌সিলাইটিস্‌, ফ্যারিঞ্জাইটিস্‌, ব্রংকাইটিশ হাঁপানি, কালা-জ্বর, ম্যালেরিয়া, সর্দি, মাথাধরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডিস্‌পেপসিয়া —ইত্যাদি নামে সহস্র সহস্র লোক প্রকৃতপক্ষে যক্ষ্মাব্যাধিতে ভুগে যেখানে সেখানে গয়ের নিক্ষেপ ক'রে, খাওয়া, শোয়া, ওঠা, বসা, চলাফেরা—এ সবের ভিতর দিয়ে অহরহ সুস্থ লোকেদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাদের সর্বনাশ ডেকে এনে (—নিজেরা ত মরছেই) —সমাজে অবাধভাবে বিচরণ করে, সে দেশে একটি থিয়েটার বা সিনেমা হল, স্কুল, কলেজ, আপিস, জনসভা, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, ট্রাম, বাস, ট্রেনের কামরা প্রভৃতি যে কোনও জায়গা থেকে এই সব হাসপাতাল অনেক সময় কতো নিরাপদ! যাঁরা যক্ষ্মা-হাসপাতালের নাম শুনলে শিউরে ওঠেন তাঁরা জানেন না হাসপাতালের অসংখ্য সুস্থ কর্মচারী হাসপাতালে কি সহজভাবে বিচরণ করছেন এবং অনেকে সপরিবারে হাসপাতালের সীমার ভিতরেই বাস করছেন! পৃথিবীর বহু সভ্যদেশে শত শত যক্ষ্মানিবাস স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু কোনও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুপরিচালিত হাসপাতাল—যেখানে রোগীদের থুতু বা অন্যান্য নিঃস্রাব অতি সাবধানতার সঙ্গে নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হয়—জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিন্দুমাত্র বিপজ্জনক হয়েছে, বহু বছরের ইতিহাসে একথা কদাপি জানা যায় নাই।

অনেক সময় দেখা গিয়েছে রোগীর আত্মীয়-স্বজন রোগীকে হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামে দেখতে এসে নাকে কাপড় দিয়ে বহু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রোগীকে হাত বাড়িয়ে এক গ্লাস জল দিতেও তাঁরা নারাজ হয়েছেন। হৃদয়বান যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞের পক্ষে এই দৃশ্য দেখে বিচলিত

হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অবিশ্যি অতিরিক্ত ভীতু এবং খুঁতখুঁতে নার্স বা চিকিৎসকের সংখ্যাও যে নিতান্ত কম তা' নয়। বাস্তবিক নিজের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন ক'রেও রোগীর মনে ব্যথা না দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশতে পারবার 'আর্ট' আয়ত্ত করা স্থূলবুদ্ধির কাজ নয়!

এদেশের জনসাধারণ আরেকটি কথা শিখে রেখেছেন—এ ব্যাধি একেবারে দুরারোগ্য এবং এ ব্যাধির কোনও চিকিৎসাও নাই। এই অদ্ভুত ধারণার জন্যে যক্ষ্মা-নিবারণী কাজে অর্থসংগ্রহও এদেশে কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব মিথ্যা কথা দিবারাত্রি কানে শুনে শুনে এদেশের রোগীরা নিজেদের উপর ও চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস হারায়, হতাশায় মনকে পূর্ণ করে তুলে নিশ্চেষ্টভাবে থেকে সত্যি সত্যিই অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ হয়ত তাদের অধিকাংশেরই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সমাজে মূল্যবান জীবন যাপন করবার ষোল আনা না হলেও পনের আনা সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল!

এই ব্যাধির নিবারণকল্পে যে কতো রকম উপায় অবলম্বন করবার দরকার তার অন্ত নাই। যে কোনও পরিবারে একটি যক্ষ্মারোগী দেখা দিলে পরিবারের লোকেদের কর্তব্য হবে প্রথমেই রোগীর সুব্যবস্থা করা এবং তারপরে প্রত্যেক শিশুর এবং নিজেদের দেহ উপযুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করানো। এই ব্যাধির নিবারণ ব্যাপারে কর্পোরেশান, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির কর্তৃপক্ষের কর্তব্যের সীমা নাই। শহরে, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থানগুলিতে ঘর অথবা বস্তি-নির্মাণ বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন, দূষিত এবং সংক্রামিত খাদ্যদ্রব্যাদির বিক্রয় কঠোরভাবে বন্ধ করা, অধিক পরিমাণে পার্ক, ব্যায়ামশালা, ক্রীড়াক্ষেত্র ইত্যাদি নির্মাণ, রাস্তার ধুলা এবং বিষাক্ত ধোঁয়ার উৎপাতের প্রতিবিধান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বোর্ডিং-হাউস ইত্যাদির উপর কড়া নজর রাখা

এবং এগুলির সমস্ত ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, সংবাদ পাওয়া মাত্র যক্ষ্মারোগীর ব্যবহৃত কক্ষকে উত্তমরূপে শোধন—ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। যে কোনও চিকিৎসক, যে কোনও গৃহস্থ, অথবা যে কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের তাঁদের জানা যক্ষ্মারোগীর সংবাদ স্থানীয় স্বাস্থ্য-তত্ত্বাবধায়কের কাছে দেওয়া, যাঁদের থুতুতে যক্ষ্মা-জীবাণু পাওয়া গিয়েছে—স্বাস্থ্য-বিভাগের পরীক্ষায় তাঁদের থুতু পর পর কয়েকবার যক্ষ্মা জীবাণু-মুক্ত না দেখা অবধি তাঁদের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা, বুকে যাঁদের ব্যাধি সক্রিয় অবস্থায় আছে তাঁদের সঙ্গে কেউ যাতে না শোয় তার ব্যবস্থা, সক্রিয় রোগগ্রস্ত শিক্ষক বা বালককে স্কুলে কাজ করতে বা পড়তে না দেওয়া, সক্রিয় রোগগ্রস্ত লোককে মুদী দোকান, খাবারের দোকান ইত্যাদি চালাতে না দেওয়া, যে কোনও প্রকাশ্য স্থানে (রাস্তা, আপিস, স্কুল, রেস্টুরেণ্ট, গাড়ি ইত্যাদিতে) যে কোনও লোকের গয়ের নিক্ষেপ আইন করে বন্ধ করে দেওয়া, রোগীকে স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করা, বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য-বীমার সৃষ্টি, গ্রামে বাস করে আসছেন এমন সব লোক যখন শহরে আসবেন তখন বিশেষজ্ঞের মতানুযায়ী তাঁদের যক্ষ্মা-প্রতিষেধক টিকা দেবার ব্যবস্থা করা বা অন্যভাবে তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, যাঁরা চিকিৎসার পরে এই রোগ থেকে বেশ ভাল হয়ে গিয়েছেন তাঁদের স্বাস্থ্যের সর্ব রকম তদারক এবং উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করে তাঁদের সংসারী হতে সাহায্য করা—এ সবই যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলনের অন্তর্গত। সমাজ এবং নিয়োগ-কর্তাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে সুস্থ টি. বি. রোগীকে সর্বদা দেখতে হবে এবং তাঁর প্রতি অবিচার না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। সিনেমা, স্কুল, কলেজ, হোটেল, আপিস, ফ্যাক্টরি, গির্জা, মন্দির, মসজিদ, আশ্রম,

পাব্লিক হল ইত্যাদির মালিক এবং কর্তৃপক্ষকে দেখতে হবে যে এগুলি আলো-বাতাস-হীন, বদ্ধ স্থান না হয়। আলো-বাতাস-হীন রুদ্ধ গৃহ বা কক্ষাদি যক্ষ্মা-জীবাণু দ্বারা একেবারে পূর্ণ থাকতে পারে। এগুলিতে প্রচুর আলো-হাওয়া যাতে আসে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি প্রত্যেকের দিতে হবে নজর। খোলা আলো-বাতাসযুক্ত ঘরে থাকা, যেখানে-সেখানে থুতু না ফেলা (যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বাইরে বেরুনর সময়ে পকেট-স্পিটুন রাখা কর্তব্য), খোলা জায়গায় ব্যায়াম, খেলাধূলো, সহরের দূষিত আবহাওয়া থেকে গ্রামে গিয়ে সপ্তাহান্তে বেড়িয়ে আসা, অন্য কোনও ব্যাধি দ্বারা স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, নোংরা চা ও খাবারের দোকান ইত্যাদি এড়িয়ে চলা, বাসস্থানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ঘর ভাড়া নেবার সময়ে খুব সতর্ক হয়ে নেওয়া—ভাল করে ওষুধ দ্বারা বিশোধিত করে অবশেষে ঘসে ধুয়ে এবং পুনরায় চুনকাম করে ভাড়া করা ঘর ব্যবহার করা, জীবাণুপূর্ণ কফ-যুক্ত অসতর্ক যক্ষ্মারোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না আসা, যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে নিজের ব্যাধিকে গোপন না করা, রোগের লক্ষণকে অগ্রাহ্য না করা, ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন, শিক্ষার উন্নতি, সর্বপ্রকার স্বাস্থ্য-সমিতিকে সাহায্য এবং উৎসাহ দান, সকলের জন্যে উপযুক্ত কাজ এবং মজুরির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা, দরিদ্রদের জন্যে সামান্য অথবা বিনা খরচায় রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা যক্ষ্মানিবারণী কাজের দ্রুত উন্নতি-সাধনের দায়িত্ব সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েরই।

যে সব রোগী স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে ভর্তির দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবার পরে বেডের জন্যে বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন, স্যানাটোরিয়াম

চিকিৎসার মোটামুটি নিয়ম এবং টাইম-টেবল্ সম্বলিত ছোট পুস্তিকা তৈরি ক'রে যদি স্যানাটোরিয়াম কর্তৃপক্ষ এই সব রোগীকে ভর্তির জন্যে মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই একটি কপি পাঠিয়ে দেন তবে রোগীর যথেষ্ট উপকার হ'তে পারে এবং অসুখ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনাও অনেক ক'মে যেতে পারে। এমন অজস্র রোগী আছেন, স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে কি নিয়মে চিকিৎসা হয় অথবা কি ধরনের জীবন রোগীকে যাপন করতে হয় সে সম্বন্ধে কোনই ধারণা নাই। কাজেই এই রকম পুস্তিকা রোগীর পক্ষে প্রথম অবস্থায় অতীব সাহায্যজনক হ'তে পারে এবং স্যানাটোরিয়াম কর্তৃপক্ষের এই সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব তাঁর মনে যথেষ্ট সাহস এবং আশা এনে দিতে পারে।

যে পরিমাণে যক্ষ্মা আজ দেশকে ছেয়ে ফেলেছে তাতে বিশেষজ্ঞের মতে কয়েক বছর আগেই শুধু বাংলা দেশেই ৪০০ ডিস্পেন্সারি, ১০,০০০ স্যানাটোরিয়াম-বেড, ২০,০০০ আফটার-কেয়ার কলোনি-বেড, ৫,০০০ প্রিভেণ্টোরিয়াম-বেড এবং বুকের যক্ষ্মা ছাড়া গ্ল্যাণ্ড্, অস্থি ইত্যাদির যক্ষ্মার জন্যে ১০,০০০ বেড্ থাকা উচিত ছিল!

ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের মতে অতি সাধারণভাবে যক্ষ্মা নিবারণী কাজ চালাতে হ'লেও ভারতবর্ষে আজ খুব কম পক্ষে যক্ষ্মারোগীদের জন্যে পাঁচলাখ বেড্, চার হাজার ক্লিনিক, পনের হাজার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, পঞ্চাশ হাজার নার্স এবং পঞ্চাশ হাজার স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের প্রয়োজন—যেখানে আছে হাজার দশেক বেড্, শতখানেকের কিছু বেশী ক্লিনিক, শ' দুয়েক শিক্ষাপ্রাপ্ত-চিকিৎসক, আর অতি সামান্য কয়েকটি স্বাস্থ্য পরিদর্শক!

আজকে হিমালয়ের অতি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলি পর্যন্ত যক্ষ্মা দ্বারা যথেষ্ট উৎপীড়িত হয়ে উঠেছে; কাজেই যক্ষ্মানিবাস স্থাপন পাহাড়ে হবে কি

সমতল ভূমিতে হবে, নদীর ধারে হবে কি মাঠের মাঝখানে হবে এরই তর্কে কালহরণ না করে যে কোনও সুবিধাজনক স্থানই করতে হবে মনোনীত। আরও একটি কথা এই যে অধিকসংখ্যক দরিদ্রেরা যাতে বিনা ব্যয়ে অথবা সামান্য ব্যয়ে স্যানাটোরিয়ামে থেকে চিকিৎসা লাভ করতে পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে—কারণ অবস্থাগতিকে দরিদ্রেরাই এই ব্যাধি-বিস্তারের পথকে ।বশেষরূপে প্রশস্ত করে, নিজেদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে। দেশের অধিকাংশ লোকের আর্থিক অবস্থা এমন ভীষণ শোচনীয় যে, এই ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসা চালানো খুবই অল্প লোকের পক্ষে সম্ভব। এমন সংখ্যাতীত রোগী রয়েছে—ডিস্‌পেন্সারিতে আসবার জন্যে রিক্সা-ভাড়াটি দেবার পর্যন্ত যাদের সামর্থ্য নাই!

যক্ষ্মাকে দমন করতে হলে আজ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল সংস্কার এবং উন্নতির তীব্র প্রয়োজন। কিন্তু বিত্তশালীদের ভিতরেও আজ এই ব্যাধি আগুনের মতনই পড়েছে ছড়িয়ে। প্রত্যেকের দেহেই বহু রকম সূত্র থেকে সংক্রমণ ঘটতে পারে, এবং স্বাস্থ্যহানিকর যে কোনও রকম অভ্যাস দ্বারাই দেহের প্রতিরোধ-শক্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

যক্ষ্মানিবারণী পরিকল্পনার ভিতরে আংশিকরূপে সুস্থ যক্ষ্মারোগীদের জন্যে "আফটার কেয়ার কলোনি" স্থাপনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। মাদ্রাজের আরোগ্যভরম্ স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ স্যানাটোরিয়ামের কাছেই "পানিপুরম্" নামক স্থানে জন কয়েক রোগী নিয়ে ছোট আকারে এই রকম একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। রোগীদের জন্যে সেখানে ছাপাখানার কাজ, তাঁতের কাজ, দরজীর কাজ, বাগিচার কাজ, মুরগির চাষ, গো-পালন, ব্যাগ তৈয়ারি, কাগজের মণ্ড তৈয়ারি—ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে। উপনিবেশের রোগীরা স্যানা-

টোরিয়ামে একটি দোকান খুলেছেন। প্যাপ্‌ওআর্থের মত সুবৃহৎ, বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কাছে এটা কিছুই নয়, তবুও এটা একটা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এবং আরম্ভ। তবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রতি যে আরও অনেক ভালোভাবে আমাদের দেশে নজর দেওয়া হচ্ছে না এইটাই বিশেষ দুঃখের বিষয়।

আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে শিশুর অধিকতর যত্ন বিশেষরূপে প্রয়োজন। যদিও শৈশবে সামান্য সংক্রমণ বয়স্ক হবার অবস্থায় দেহকে কিছুটা যক্ষ্মা-প্রতিরোধ-শক্তি-সম্পন্ন করে, তথাপি শিশুকে যক্ষ্মাজীবাণুর সংস্পর্শে আসতে দেবার বিপদ অসীম যক্ষ্মা-ব্যাধিতে শিশুদের ভিতরে মৃত্যুর হার কম নয় এবং ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মা তাদের ভিতর অপেক্ষাকৃত কম হলেও, গ্ল্যাণ্ড্‌ ইত্যাদির যক্ষ্মায় তাদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে উঠেছে। (দেহের যে কোনও স্থানই আক্রান্ত হোক না কেন, বিশ্রাম, মুক্ত বায়ু, পুষ্টিকর আহার, উপযুক্ত চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজন সব ক্ষেত্রেই এক রকম। ফুস্‌ফুসকে বিশ্রাম দেবার ব্যাপারে এখানে একটি নতুন সংবাদ দিচ্ছি। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব্‌ ফিজিসিয়ান্‌স্‌ অ্যাণ্ড্‌ সার্জন্‌স্‌-এর অন্যতম অধ্যাপক ডাঃ অ্যাল্‌ভান ব্যারাচ্‌ একটি লৌহ-ফুস্‌ফুস প্রস্তুত করেছেন, যে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে নিশ্বাস নিয়ে ফুস্‌ফুসকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া যায়। অনেক যক্ষ্মারোগীর ক্ষেত্রে নাকি এই যন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়েছে।)

তারপরে, শিশুর দেহে যে যক্ষ্মা-বীজ রোপিত হল, শৈশব অতিক্রম করে গেলেও বয়স্ক অবস্থায় তা যে সহসা কখন ধ্বংসের করাল মূর্তি পরিগ্রহ করবে, তা বলা যায় না। কাজেই শিশুর প্রতি রাখতে হবে নজর। সক্রিয় ব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতা বা অপর কারুর থেকে শিশুকে রাখতে হবে দূরে, তার ঠোঁটে চুমু খাওয়া বন্ধ করতে হবে, ব্যাধিগ্রস্ত মাতার

স্তন্য পান সে করতে পারবে না, বছরে একবার করে বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে—বিশেষ করে সে যদি দুর্বল-দেহ হয়; তার নিয়মিত সময়ে খাওয়া, পরিচ্ছন্নতা, পোষাক, নিয়মিত ঘুম, পেটের অবস্থা, দাঁত, টন্‌সিল্ ইত্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, হাম বা অন্য যে কোনও অসুখ করলেই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সে একটু বড় হলে খোলা আলো-বাতাসে তাকে খেলা-ধুলো করতে উৎসাহ দেওয়া, তার মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবার কদভ্যাস থাকলে সেটাকে সংশোধন করে দেওয়া, ইত্যাদির প্রয়োজন। শিশুকে শেখাতে হবে: ঘরের মেজেয় থুতু ফেলা, থুতু দিয়ে শ্লেট মোছা, মুখের ভিতর আঙুল দেওয়া, নাক খোঁটা, হাতে, জামার হাতায়, গায়ের চাদরে বা ধুতির খুঁটে নাক মোছা, মুখ থেকে আঙুল দিয়ে থুতু নিয়ে বই-এর পাতা ওল্টানো, মুখে পেন্সিল দেওয়া, আহার এবং পানীয় ছাড়া টাকা-পয়সা বা পিন মুখে দেওয়া, কারুর খাওয়া ফল, চিবানো পান, বিড়ি, সিগারেট, বা অন্য কোনও খাওয়া-জিনিসের শেষ মুখে দেওয়া, বাঁশি, অপরের হুঁকো—বা অপরে মুখে দিয়েছে এমন যে কোনও জিনিস মুখে দেওয়া, কোনও ফল না ধুয়ে খাওয়া, কারুর মুখের উপর হাঁচা বা কাশা, মুখ, হাত, নখ, অপরিষ্কার রাখা বা হাত-মুখ ভাল করে না ধুয়ে ভাত খেতে বসা, অপরিষ্কার জামা-কাপড় পরে থাকা—এগুলি বড় খারাপ। কোনও কারণে যদি তার শরীর খারাপ লাগে, শরীরের কোনও জায়গা কেটে যায় বা অপরে কোথাও কোনও রকম আঘাত তাকে করে—সে যাতে তা জানাতে দ্বিধাবোধ না করে, ভোর বেলা উঠে এবং রাত্রে শুতে যাবার আগে সে যাতে ভাল করে দাঁত মেজে মুখ ধোয়—তা দেখতে হবে। শিশুদের সম্বন্ধে শিক্ষকদের দায়িত্বও প্রচুর। আবার শিক্ষকদের কথা বলতে গিয়েই এসে পড়ে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের দায়িত্ব।

আমাদের দেশে নির্দিষ্ট পাঠ্য-বিষয় এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির ভিতর এমন ভীষণ কতকগুলি গলতি আছে যা তরুণদের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ একটি প্রতিকূল ক্রিয়া করেছে, একথা যোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগকে অবহিত হতে হবে।

যদিও আমাদের দেশের চিকিৎসকসমাজ যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে পূর্বের চেয়ে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠেছেন, তবুও উপযুক্ত যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞের সংখ্যা এখনও নিতান্ত অল্প তা আগেই বলেছি। যক্ষ্মানিবারণী সমিতির স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়াতে হবে এবং প্রীতি, বিশ্বাস, নির্ভরতা ও সরলতার সঙ্গে এঁদের কাজে যক্ষ্মারোগীদের সহযোগিতা করতে হবে। যক্ষ্মা-রোগীরা এঁদের কাছে নিজেদের সুখ-দুঃখ, অসুবিধা, অভিযোগ জানাবেন, এবং এঁরা চেষ্টা করবেন বন্ধুভাবে তার যথাসম্ভব প্রতিকার করতে। যাঁরা এই ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়েছেন তাঁরাও নেবেন অজ্ঞ রোগী এবং জন-সাধারণের ভিতরে এই ব্যাধিসংক্রান্ত জ্ঞানের আলো বিতরণের ভার।

কোনও যক্ষ্মানিবাসে নিজের নামে একটি 'কটেজ' দান করে, নিজের নামে কোথাও একটি 'ওয়ার্ড' তৈরি করে, নিজের নামে একটি 'বেডের' খরচা দিয়ে, অর্থসাহায্য করে, বস্ত্রাদি, পুস্তক, আসবাবপত্র, ইত্যাদি দান করে, যক্ষ্মানিবারণী সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে নিজের বন্ধুবান্ধব, নিজের পরিচিত সঙ্ঘ-সমিতির উপরে প্রভাব বিস্তার করে সকলে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারেন। যক্ষ্মানিবারণী সমিতির অর্থসংগ্রহের সব রকম প্রচেষ্টাকে সকলের সার্থক করে তুলতে হবে।

এদেশে যক্ষ্মাব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধটা করতে উঠে পড়ে যদি না লাগা যায়, তবে আমাদের আলস্য, অযোগ্যতা এবং অক্ষমতার সুযোগে প্রকৃতির প্রতিশোধ-রূপে লক্ষ লক্ষ লোক যে শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তাই নয়, এর পরে এ ব্যাধির বিস্তারকে রোধ করা হাজার গুণ শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। আমরা

রোগটা যখন টি. বি.—

আরেকটি জিনিস দেখতে পাব যে আমাদের এই ব্যাধিকে দূর করবার চেষ্টায় আরও অনেক খারাপ ব্যাধি আপনা থেকেই দূর হয়ে যাচ্ছে এবং একটি জাতি হিসাবে আমরা নানাভাবে উন্নত হয়ে উঠছি। অদৃষ্টের দোহাই, নিশ্চেষ্ট হা-হুতাশ, আত্মতুষ্টির বুজ্‌রুকি এবং দেশের "নেপাল বাবা"-দের দলকে ভারী করা চলবেনা আজকে আর। সকলের বুঝতে হবে—স্বাস্থ্যহীন হবার ভিতরে আর আনন্দ নাই, স্বাস্থ্যহীনতা নিয়ে যারা কবিত্ব করে সেই বিকৃত-মনোভাবগ্রস্তেরা কোনমতেই আর প্রশ্রয় পাবার যোগ্য নয়। শুধু অবহেলা দ্বারা জাতি হিসাবে আমরা এই ব্যাধিতে ধ্বংস হব অথবা পঙ্গু হয়ে থাকব, এ লজ্জা আমাদের দূর করতেই হবে। পুরাতন ভ্রান্ত সংস্কারকে বর্জন করে নতুন সত্য করব আমরা গ্রহণ, সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে চালাব আমরা আমাদের নির্মম অভিযান। আজকে দেশের প্রত্যেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আর রাজনীতিজ্ঞকে জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে হতে হবে অবহিত। যা নাকি একজন মানুষের জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়—সহস্র আকাঙ্খা, সহস্র আশা, সহস্র শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে যখন একটি তরুণ আপনাকে করবে প্রকাশ, করবে প্রতিষ্ঠিত, সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে যক্ষ্মার মত ব্যাধির এক নিদারুণ অভিশাপ গভীর বেদনায় তাকে মাথায় যাতে তুলে না নিতে হয় তার জন্যে প্রত্যেক সমাজ এবং দেশহিতৈষীকে হতে হবে অগ্রসর।

অনেক অনিশ্চয়তা, অনেক সংগ্রামের পরে যে পুরুষ অথবা যে নারী যক্ষ্মাকে পরাভূত ক'রে রোগমুক্ত জীবন নিয়ে বহু আশায় এসে দাঁড়ালো স্বপ্ন-রঙীন কর্ম-জগতের মুখোমুখী, তাকে সেখানে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব নিতে হবে সবারই একযোগে; আর, সেই ভাবেই না ভ'রে উঠবে সব হৃদয়, সব মন, সব সংসার—যে হৃদয়, যে মন, যে সংসার থেকে এক দিন সে হারিয়ে গিয়েছিল!